দ্বাদশ নারী

বা

আর্য্য-মহিলা।

বীরনারী তারাবাই।

প্রাচীনকালে আধুনিক গুজরাটের অন্তর্গত আনহালবারা-পত্তন চৌলুক্যবংশীয় প্রবল প্রতাপশালী নৃপতিগণের রাজধানী ছিল। শূরতান রাও ঐ চৌলুক্যবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে যখন যবনরাজের প্রবল প্রতাপ পরিবর্দ্ধনশীল, যবনোপদ্রবে ভারত যখন শক্তিহীন-প্রায়, তখনও আনহালবারাপত্তন চৌলুক্যবংশীয়ের রাজধানী—তখনও আনহালবারা হিন্দু রাজধানী—তখনও সে তাহার পূর্ব্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু জগতে সমভাবে কাহারও চিরদিন অতিবাহিত হয় না। কালে দুরন্ত নরহন্তা আলাউদ্দি-নের অসীম বিক্রমে হিন্দুরাজধানী হিন্দুরাজা-ভ্রষ্ট হইল। আলার অপূর্ব্ব বীরত্বে আনহালবারাপত্তন যবনের দাসীত্বে নিযুক্ত হইল,—পত্তনের পূর্ব্ব-গৌরব অতল জলধিগর্ভে নিহিত হইল। চৌলুক্যবংশীয়দের সৈন্যবল, অর্থবল কিছুই নাই। তাঁহারা স্বরাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহারা যবন কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দেশত্যাগী হইলেন—মধ্যভারতে তক্সীলা নামক স্থানে উপনিবিষ্ট হইলেন।

কিন্তু কালের লীলা চমৎকার! কালতরঙ্গে কাহারও অভ্যুত্থান এবং কাহারও অধঃপতন সংসাধিত হইতেছে। তক্ষশীলায় আবার তাঁহাদের অদৃষ্ট-দেবী সুপ্রসন্না। তক্ষশীলা বীরভূমি, রাজপুতনার প্রাচীন নগরী—অধুনা তোডাতঙ্ক নামে অভিহিতা। বীরভূমিতে ধীরে ধীরে বীরের বীরত্ব প্রকাশ পাইল। তথায় ধীরে ধীরে চৌলুক্যবংশীয় বীরগণ কর্তৃক এক নূতন রাজ্যের অভ্যুদয় হইল। তক্ষশীলা চৌলুক্যবংশীয় বীরগণের শাসনদণ্ডে শাসিত হইতে লাগিল। তাঁহারা রাজ্যচ্যুত হইয়া নূতন রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

ভারতে যবন! যবন ভারতের একচ্ছত্রী রাজা! ভারত যবনের কর-কবলিত! ভারতের সকল স্থানে যবন! যবন ভিন্ন ভারতে কথা নাই। "যবনে দেশ গ্রাস করিল" শয়নে, স্বপনে ইহা ভিন্ন ভারতবাসী আর কিছুই দেখিতেছে না। দেশ মধ্যে এ হেন বিপ্লব উপস্থিত। চৌলুক্যবংশীয়েরা আর কত কাল তোডাতঙ্কে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন? কত কাল আর তাঁহারা তোডাতঙ্কের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন? শনি আবার তাঁহাদের রন্ধ্রগত। প্রায় সার্দ্ধৈক শতাব্দী হইতে চৌলুক্যগণ তো তোডাতঙ্ক শাসন করিতেছেন! কাল আর কত কাল তাঁহাদের স্বাধীনভাবে রাজ্য-শাসন করিতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? কালের কঠিন প্রাণ ভারতে আর হিন্দুরাজা দেখিতে পারিল না। কাল যবনের অঙ্কশায়ী। তিনি আর কোন্ প্রাণে তোডাতঙ্কে হিন্দুরাজা দেখিবেন?

তোডাতঙ্কে চৌলুক্যবংশীয়েরা হীনবল হইয়া পড়িলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহাদের বংশ প্রায় লোপ

পাইবার উপক্রম হইল। বংশে কেহই নাই,—কেবল এক মাত্র শূরতান বর্ত্তমান। যবনসিংহ বদন ব্যাদান করিয়া তোডাতঙ্ক গ্রাসে সমুদ্যত। সিংহগ্রাস হইতে শূরতান কেমন করিয়া—কোন্ মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র-প্রভাবে—পিতৃরাজ্য রক্ষা করিবেন? একাকী অসংখ্য যবন-সেনাসহ রণ করা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? শূরতান তোডাতঙ্ক রক্ষার্থে অনেক চেষ্টা করিলেন,—অনেক বার রণস্থলে বীরের ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরিশেষে শূরতান পাঠান-সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। লিল্লা নামক জনৈক দুরন্ত পাঠান তোডাতঙ্ক অধিকার করিল।—শূরতানের পৈতৃক ধন যবনের করগত হইল! শূরতান তোডাতঙ্কের রাজা ছিলেন, যবন কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া পথের ভিখারী হইলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পিতৃপুরুষগণের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাঁহারও তাহাই হইল।

রাজ্যচ্যুতির কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শূরতান বিধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি তারাবাই নাম্নী এক পরম লাবণ্যবতী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যচ্যুতিকালে তারাবাই ভিন্ন তাঁহার আর কেহই ছিল না। সুশীলা কন্যা তারার জীবনের জন্যই তিনি যবনবশে প্রাণত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যবিভব সকলই হারাইলেন। পূর্ব্ব-গৌরব স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইলেন। তথাপি তাঁহার হৃদয়ের রাজ্য-লাভ-আশা একেবারে তিরোহিত হইল না। এক দিন তিনি আবার পৈতৃক-রাজ্য লাভ করিবেন, তাঁহার হৃদয়ে এই আশা সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। তারাই তাঁহার একমাত্র আশা। তিনি স্থির

করিয়াছিলেন, তারা হইতেই তাঁহার পিতৃ-রাজ্য উদ্ধার হইবে। শূরতান বীর; তাঁহার হৃদয় বীরত্বে পরিপূর্ণ। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রাজপুত-বীর, যবন-গ্রাস হইতে তোড়াতঙ্ক উদ্ধার করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহাকে তাঁহার প্রাণস্বরূপা লাবণ্যবতী তারারত্ন—রাজ্য-বিনিময়ে উপহার প্রদান করিবেন। বীর-হৃদয়ের বীর বাক্য! অবশ্য এ বাক্য ভবিষ্যদ্বাণী হইবে। বীরের অব্যর্থ সন্ধান কখন ব্যর্থ হইবে না। শূরতান কালে তারারত্ন হইতেই রাজ্যরত্ন প্রাপ্ত হইবেন।

লাবণ্যবতী তারার অপূর্ব্ব লাবণ্যজ্যোতিঃ ক্রমে সমগ্র রাজস্থানে প্রকাশ পাইল। তারার রূপরাশি দর্শনে রাজস্থানের রাজপুত-হৃদয় বিমোহিত হইল।—"কেমন করিয়া শূরতানের আশার আশা,—হৃদয়ের ধন তারা-রত্ন লাভ করিব"—এই চিন্তা সমগ্র রাজপুত জাতির হৃদয়ে উদয় হইল। কিন্তু শূরতান কঠিন প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ।—প্রাণসমা প্রিয়তমা কন্যা তারার পরিণয়-কার্য্য এক দিকে, আর স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা অন্য দিকে। ত্রেতাযুগে আর্য্য রাম জনকরাজার রাজসভায় সুদৃঢ় হরধনু ভঙ্গ করিয়া লাবণ্যবতী সীতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বাপর-যুগে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অলক্ষ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া সুন্দরী দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিযুগে তদপেক্ষা মহৎ কার্য্য—অমূল্য স্বাধীনতা-বিনিময়ে তারারত্ন লাভ করিতে কে সক্ষম হইবে? অনেক বীরত্বাভিমানী রাজপুত শূরতানের কঠিন প্রতিজ্ঞা,—স্বাধীনতা-বিনিময়ে তারাদান শ্রবণে তারারত্ন-প্রাপ্তি আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সকলের আশা-কোরক অকালে কালকীটে কর্ত্তন করিল।

উচ্চ বংশের উচ্চ আশা। রাজকুমার জয়মল্ল কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তারার মোহিনী মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়কে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তারালাভ আশয়ে মুগ্ধ হইয়া তিনি মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিলেন। পুরুষপুঙ্গব রাণা রায়মল্লের তৃতীয় পুত্র হইয়াও কাপুরুষত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি বীর নহেন—বীরের বীরত্ব প্রদর্শন কবিতে পারিলেন না। স্বীয় মহৎ কুলে কলঙ্ক-কালিমা অঙ্কিত কবিয়া, নশ্বর জগতে সামান্য নশ্বর সুখের আশায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। কৌশলে হৃদয়ের আশা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা পাইলেন। দুরন্ত যবন-রণে পরাজিত হইয়াও, তিনি তারা-লাভে ব্যস্ত হইলেন।

বীর রাজপুত বীরত্বের পরিচয়প্রার্থী। তাহারা কৌশলে ভুলিবার নহে;—অর্থের মোহ তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। জয়মল্ল মিবারেশ্বরের পুত্র বটে; তাঁহার অর্থের অপ্রতুল নাই; মহৎ কুলোদ্ভব বলিয়া তাঁহার মান্যের অভাব নাই; মনে করিলে তিনি শূরতানকে সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে পারেন; স্বীকার করি, শূরতানকে তারা-বিনিময়ে পিতৃরাজ্যের অর্দ্ধেক প্রদানেও তিনি অসম্মত নহেন। কিন্তু শূরতান বীর-কুলোদ্ভব বীর। তিনি তুচ্ছ অর্থের ভিখারী নহেন। তিনি স্বর্গীয় স্বাধীনতা-সূর্য্যের সুবিমল জ্যোতিঃ ভোগ করিতে অভিলাষী। তিনি জয়মল্লের তুচ্ছ প্রলোভনে ভুলিলেন না। নীচহৃদয় জয়মল্লকে সর্ব্বসম্মুখে অবমানিত করিলেন। আর বলিলেন, "রাজপুত কাপুরুষের প্রলোভনে ভুলিতে চাহে না। যদি বীর হও, তবে বীরত্বের পরিচয় দানে অভিলষিত রত্ন লাভ করিতে

সচেষ্টিত হও। নীচতা প্রকাশ রাজপুতের পক্ষে লজ্জাজনক কার্য্য বোধ করা উচিত।”

কিন্তু হতভাগ্য জয়মল্ল শূরতানের কথা শুনিলেন না। মত্ত যুবক গর্ব্বভরে তাঁহার প্রতি বিদ্রূপোক্তি করিলেন। দম্ভ সহকারে তারা-হরণে শক্তি দেখাইতে যাইলেন। জয়মল্লের জঘন্য লালসা বীর শূরতানের অসহ্য হইল। এরূপ কলঙ্কী কাপুরুষ হইতে পূজ্য রাজপুত-কুলকে আর কলঙ্কিত করা তাঁহার অভিপ্রেত হইল না। তিনি কাপুরুষত্বের কারণ, আর্য্যগণের মহৎকুলে কলঙ্ক-কালিমা অঙ্কনের কারণ স্বহস্তস্থিত শাণিত তরবারি আঘাতে বীরের ন্যায় রাণা-পুত্রকে বধ করিলেন। আর অন্য দিকে পিতা বীর রায়মল্লের কথাই বা বলিব কি? অচিরে এ শোক-সংবাদ—শূরতান কর্ত্তৃক জয়মল্লের নিধন-বার্ত্তা, রাণা রায়মল্ল সমীপে উপনীত হইল। কিন্তু রায়মল্লও বীর, তাঁহার হৃদয়ও বীরত্বে পরিপূর্ণ। তিনি ভীরু বা কাপুরুষ নহেন যে, এরূপ কলঙ্কী পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ব্যথিত হইবেন? “যে পুত্র পিতৃপুরুষের পবিত্র কুলের কলঙ্ক, সে পুত্র অবশ্য বধ্য” বরং এই বলিয়া বীর-হৃদয় রায়মল্ল পুত্রশোক সম্বরণ করিলেন। আর মহৎ-হৃদয়ের কারণ, দেবহৃদয় রায়মল্ল, স্বীয় দেবহৃদয়ের বিশেষ পরিচয় দানে, অসহায় শূরতান রাওয়ের আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মিবার রাজ্যের অন্তর্গত সোলানকি তটস্থ বেদনোর প্রদেশ শূরতানের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

মহৎ জীবনের মহৎ কাহিনী এক মনে অধ্যয়ন করিলে, আপনার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সম্যক্ তুলনা করিলে, হৃদয়ে

মহৎ ভাবের উদয় হয়।—হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হয়। হৃদয় বীরত্বোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হয়। এই স্বতঃসিদ্ধ মহাবাক্য বীর শূরতানের বীর-হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে স্পষ্টরূপে বিরাজ করিতে-ছিল। তাই দেবত্বে পরিপূর্ণ দেবহৃদয় শূরতান মধ্যে মধ্যে আর্য্যগণের আর্য্যকীর্ত্তি,—পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের কথা, তারার নিকট বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেন। তাই শূরতান আপনাদের তাৎকালিক দুরবস্থা এবং পূর্ব্বপুরুষগণের লুপ্ত গৌরবকাহিনী তারা-সম্মুখে সম্যক্ তুলনা করিতেন। তারাও সেই সমস্ত আর্য্যগণের আর্য্যকীর্ত্তি, পিতৃগণের গৌরব-গরিমা অবহিত চিত্তে, স্থির মনে সম্যক্ শ্রবণ করিতেন। আর মনে মনে চিন্তা করিতেন, "অদৃষ্টদেবী আর কি সুপ্রসন্না হই-বেন না? কখন কি তোডাতঙ্কের গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইব না? আজীবনই কি এইরূপে—সকলের অদৃশ্যভাবে যবনভয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব? কালেও কি স্বাধীনভাবে তোডাতঙ্কে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারিব না?"

তারার হৃদয় মধ্যে চিন্তাবহ্নি প্রজ্বলিত হইল। এ বহ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। বরং বহ্নি ধীরে ধীরে তারার হৃদয় মধ্যে প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ভাগ্য-গগন তমসাচ্ছন্ন, গৌরব-গরিমা বিলুপ্ত-প্রায়, অধঃপতন অলঙ্ঘনীয় দেখিয়া, তারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বয়োবৃদ্ধি সহ তাঁহার হৃদয় সুপ্রশস্ত আকার ধারণ করিল। অবলা হিন্দু-রমণীর ন্যায় গৃহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে তাঁহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। রমণী-আদর্শোচিত বেশভূষায় তাঁহার তৃপ্তি

বোধ হইল না। তিনি বীরোচিত বেশে বিভূষিতা হইলেন। কঠিন লৌহবর্ম্মে কোমলাঙ্গ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া, তীব্র-জব-বিশিষ্ট ঘোটকে আরোহণ করিয়া পিতা বীর শূরতানের নিকট সমর-কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বেগবিশিষ্ট অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে বাণ-বিক্ষেপ, বীরের ন্যায় সম্মুখ-সমরে অস্ত্রযুদ্ধ প্রভৃতি বীর-কার্য্য সমুদয় একে একে আগ্রহ সহকারে শিক্ষা করিলেন। অল্প দিনে, সুমহৎ অধ্যবসায়গুণে বীর-কার্য্যে এত দূর সুশিক্ষা লাভ করিলেন যে, বলিতে কি! সুকুমারী কুমারী, কুমারী কালেই পিতৃসহ তোডাতঙ্ক উদ্ধারার্থে যবন-বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। বেদনোর অবস্থিতি কালে শূরতান যে কয়েক বার তোডাতঙ্ক উদ্ধারার্থে যবন-রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রত্যেক বারই বালিকা তারা তৎসহ সমরাঙ্গণে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শনে জগৎ চমকিত করিয়াছিলেন। অমিত-বিক্রম-শালী যবনসৈন্যকে স্তম্ভিত ও সশঙ্কিত করিয়া রাজস্থানে বীরনারী মধ্যে গণ্যা হইয়াছিলেন।

ক্রমে বালিকা তারা যৌবনে পদার্পণ করিলেন। প্রস্ফুটিত সুবর্ণ-চম্পকের ন্যায় সেই মধুর লাবণ্য-জ্যোতির বিকাশ পাইল। তাঁহার জীবন-তরী যৌবন-প্রবাহের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে মগ্ন হইবার উপক্রম হইল। শূরতান আজ বিপদ্‌গ্রস্ত। তিনি উভয় সঙ্কটে আপতিত। এখন বীরের বীর-বাক্য লঙ্ঘন হইবে? না সতীর সতীত্ব নষ্ট হইবে? শূরতানের উচ্চ আশা পূর্ণ হইবে? না সকলেই দুরাশা-নীরে নিমগ্ন হইবে? তবে কি সত্য সত্যই শূরতানের কঠিন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে না? তারাও কি তবে উপযুক্ত পতি প্রাপ্ত হইবেন না? সকল আশা, সকল

ভরসা কি অকালে লয় প্রাপ্ত হইবে? সকলই কি আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে? কখনই না। দেব-হৃদয়ের দেব-বাক্য কখনও লঙ্ঘন হইবার নহে।

পৃথ্বীরাজ রাণা রায়মল্লের মধ্যম পুত্র। কাপুরুষ জয়মল্লের অগ্রজ এবং মহাবীর সংগ্রামসিংহের অনুজ। এত দিন পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া রাজস্থানের অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রদেশ মারবার রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এতদিন পরে তিনি পিতার প্রিয় হইলেন। জয়মল্লের নিধনসময়ে তিনি শত্রু-অপহৃত পৈতৃক গদবার রাজ্য উদ্ধার করিয়া তাহা রায়মল্লকে প্রদান করেন। তজ্জন্য এবং কনিষ্ঠ পুত্রের শোক প্রযুক্ত শোক সম্বরণার্থ পিতা কর্ত্তৃক ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া, পৃথ্বীরাজ রাজ্য মিবারে প্রত্যাগমন করিলেন। কনিষ্ঠের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে পরিতাপিত হইলেন। ছার জীবন বিসর্জ্জন কিন্তু নিহত ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে দৃঢ়ব্রত হইলেন। লাবণ্যময়ী তারার পাণি-গ্রহণ করিয়া স্বীয় নামের মহিমা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমিত-বিক্রমে যবন-রণে জয়ী হইয়া তারা-লাভ জন্য প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। বীর সাজে সজ্জিত হইয়া বেদনোর অভিমুখে সুরতান-ভবনে গমন করিলেন। আশার আশা মিটাইতে আশা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

এত কালে সকলের আশা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। সুরতানের কঠিন পণ—তোডাতঙ্কের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তি, বীর-পুঙ্গব পৃথ্বীরাজের প্রতিজ্ঞা—সুন্দরী তারার পাণিগ্রহণ, আর বীরনারী তারারও পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ-লালসা, সকলই

একসঙ্গে, একাধারে পূর্ণ হইবার সুযোগ হইল। অধীনতা-পাশে আবদ্ধ স্বাধীনতা-প্রয়াসী শূরতান এত দিন ভাবিতে-ছিলেন, "কেমন করিয়া যবনাপহৃত তোডাতঙ্কের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হইবে? কেমন করিয়া আবার তোডাতঙ্কে রাজদণ্ড পরিচালনা করিব?" আজ তাঁহার সেই ভাবনা নিবৃত্তি হইবার সমূহ সুযোগ সমুপস্থিত। বীরত্বের কারণ, দেবত্বের কারণ, মহত্বের কারণ এত দিন তারা যাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, সেই আশার আশা, হৃদয়ের হৃদয় পৃথ্বীরাজ আজ তারার মুখ-শশীর সুস্নিগ্ধ মনোহর মূর্ত্তি দেখিতে বেদ-নোরে উপস্থিত। তারার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইল। তারা এখন মনের সামগ্রী পাইয়া, পিতৃসম্মুখে মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। দেবহৃদয় শূরতানও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়া, বলিলেন, "আমি তোমাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলাম, আমার সকল আশা ভরসা তোমাদের উপর নির্ভর করিলাম। যদি পবিত্র আর্য্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, তবে এই কুলের মান্য রক্ষা করিতে ভুলিবে না। প্রাণপণে কার্য্যোদ্ধার করিবে।" তারা এবং পৃথ্বীরাজ উভয়ে শূরতান সম্মুখে প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই বীর-বাক্যের অনুসরণ করিলেন।

মুসলমানগণের বার্ষিক উৎসব সমাগত। পূজ্য গোঁয়ারা পূজায় মুসলমানের দল নিযুক্ত। স্মরণীয় বীরদ্বয়ের মৃত্যুৎসবে উন্মত্ত। বীর-জীবন বীরত্বের পূজা করিতে ব্যস্ত। সুমধুর হরিগুণ গানের পরিবর্ত্তে তোডাতঙ্ক "এমাম হোসেন" শব্দে প্রতিধ্বনিত। যবনগণ একত্রে মিলিয়া তাহার রক্ষিতগণ

ধনি-মধ্যম-দীন সকলে একত্রে মিলিয়া, বীর-পূজায় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, অস্ত্র-ক্রীড়া করিতেছে। যবনের কোলাহলে তোডাতঙ্ক স্তম্ভিত!— গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপভারে তোডাতঙ্ক ভারাক্রান্ত। তোডাতঙ্কবাসী হিন্দু যবনের অত্যাচারে, প্রবল পীড়নে প্রপীড়িত। বল প্রদর্শনে যবনগণ সুপবিত্র সনাতন হিন্দু ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। সিংহের ন্যায় আস্ফালন করিয়া হিন্দুদিগকে পাপ যবন ধর্মে দীক্ষিত করিতেছে। সুনীল গগনমার্গে হিন্দুগণের কাতরোক্তি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পরম পিতা সমীপে হিন্দুগণের ক্রন্দন-ধ্বনি এবং যবনের অত্যাচার-কাহিনী উপস্থিত হইতেছে। হিন্দুদিগকে এ বিপদ হইতে কে উদ্ধার করিবে? ঈশ্বর কি তাহাদিগের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিবেন না? তাহাদের বিপদের উপর সমূহ বিপদ উপস্থিত। তাহারা কি তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে না? অবশ্য পারিবে। অচিরে তাহাদের দুঃখ-নিশি প্রভাত হইবে। ঈশ্বরের কৃপাগুণে অচিরে তাহাদের অত্যাচার-স্রোত বন্ধ হইবে।

সুরতানের নিকট বিদায় লইয়া, বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজ সহধর্মিণী তারাবাই এবং প্রাণসম প্রিয়তম মিত্র সেনগড়ের জনৈক সামন্ত সহ, তোডাতঙ্কের প্রান্তভাগে, যবনের অদৃশ্যভাবে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পঞ্চশত অশ্বারোহী বীর রাজপুত-সৈন্যও তৎসহ তোডাতঙ্ক আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন। পৃথ্বীরাজের সহযোগী রাজপুত সৈন্য যবনসহ তুলনায় কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না; অথবা তুলনায় অনন্তকায় বারিধি মাঝারে সামান্য বারি বিন্দু,—সুদূর-বিস্তৃত, প্রচণ্ডকায় উত্তপ্ত সাহারা মরু সন্নিকটে এক বিন্দু বালুকা-কণা, অথবা অভ্রভেদী তুষার-মণ্ডিত ভূধরশ্রেষ্ঠ হিমাচল সম্মুখে সামান্য উপলখণ্ডবৎ। এ হেন অল্প-সংখ্যক হিন্দু-সৈন্য অসংখ্য যবনসহ কেমনে—কোন্ মহামন্ত্র-প্রভাবে রণ করিতে সক্ষম হইবে? যে বিভীষণ সমরে শুদ্ধ-তানের কঠোর প্রতিজ্ঞা পূরণ, স্বদেশের গৌরবের ধন স্বাধীনতা সংরক্ষণ, উপযুক্ত বীরবরকে বীরাঙ্গনার পতিত্বে বরণ, বলিতে কি! এক কথায় ধন, মান, জীবন সকলই নির্ভর করিতেছে। তাহাতে জয়ী হইতে পারিলে, জয়মাল্য ধারণ করিতে পারিলে, তোডাতঙ্কের লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে, সকলের আশা পূর্ণ হইবে; অনন্ত কালের জন্য অনন্ত জগতে অনন্ত কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে;—দেবাদি-বাঞ্ছিত অপ্সরা-পরিবৃত হইয়া, সুরম্য স্বর্গপুরে সুখে বাস করিতে পারিবে, সে হেন ভীষণতম সংগ্রামে এ হেন অল্পসংখ্যক সৈন্যের জয়লাভ কেমনে সম্ভবিতে পারে?

প্রচণ্ড শীতের পর জগজ্জীবন আদিত্যদেব গগনমার্গে বিরাজমান;—ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে পদ-বিক্ষেপে স্বর্গের অত্যুচ্চ শিখরে সমারূঢ়। প্রচণ্ড শীতের কঠোর দংশনের কঠিন যাতনা নিবারণের জন্য সমুপস্থিত। আনন্দে যবনগণ তাজিয়া সহ তোডাতঙ্কের প্রধান রাজপথ সমূহে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। "কাফের বধ্য" মহম্মদের এই মহম্মদীয় ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রভাবে, অসংখ্য হিন্দুমুণ্ড ভূমিশায়ী করিয়া রক্তের স্রোতে তোডাতঙ্ক প্লাবিত করিতেছে। হিন্দুগণের ক্রন্দন-ধ্বনি আর যবনের আনন্দধ্বনিতে তোডাতঙ্ক ধ্বনিত হইতেছে।

বীরের তো কথাই নাই; এরূপ অত্যাচার দেখিয়া, কোন্ অল্প ভীরু বা কাপুরুষ ব্যক্তি, রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করিয়া, প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে সচেষ্টিত না হয়? তারা জন্মাবধি দুঃখের ক্রোড়ে পালিতা বটে; দুঃখসহ তাঁহার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় স্বাধীনতার বিমল সুখের আধার—তাহা দেবত্ব, মহত্ত্ব, বীরত্ব সকলেরই উৎস। অসহ্য তাঁহার সহ্য হয় না—অন্যায় দেখিতে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম। হিন্দুপ্রতি যবনের কঠোর অত্যাচার দেখিয়া তবে তিনি কেমন করিয়া স্থির থাকিবেন? তাঁহার হৃদয় রণোন্মাদে মত্ত হইল। পতিপ্রাণা সতী পতিকে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। আর বলিলেন, "যবন-অত্যাচারে তোডাতঙ্ক কাঁপিতেছে। আর না, সময় উপস্থিত! উঠুন! আরাধ্য-দেবীর আরাধনায় ব্যাপৃত হউন, আসুন, দেবব্রতে ব্রতী হই, আর বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য।"

বীরাঙ্গনার বীরবাক্যে বীর-হৃদয় মাতিয়া উঠিল। কাল-বিলম্ব অবৈধ বোধে, পৃথ্বীরাজ সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ প্রথমে স্বীয় জীবনতোষিণী তারাকে আশ্বাস-বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া শিবির মধ্যে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তারা তাহা শুনিলেন না। তিনি চির-সমার্জ্জিত আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অগত্যা পৃথ্বীরাজ তারার বাক্যে সম্মত হইলেন; তারাকেও রণসাজে সজ্জিত হইতে অনুমতি দান করিলেন। বীরা তারা সেই সুকুমারী নারী-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব তেজোময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন—যোষোন্মত্তা বাঘিনীর ন্যায় যবনের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইলেন। তিনি কঠিন লৌহ-বর্ম্মে কোমলাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া, বিপুল বলশালী প্রচণ্ড-কায়

উপস্থিত হইলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল। "আর রক্ষা নাই" বলিয়া, যবন-সৈন্য রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। বীরনারী মুহূর্ত্ত মধ্যে করিমুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। স্বামিসহ যবন-সৈন্যের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। "মলাম, মলাম" শব্দে অগণ্য যবনসৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। বীরনারীর অপূর্ব্ব বীরত্বে যবন পরাজিত হইল। বীরনারীর বীরত্ব-কাহিনী জগতে ব্যাপ্ত হইল। কবিকুলের অমৃতময়ী লেখনী তৎসমস্ত গাথাকারে সংগ্রথিত করিয়া দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে,কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

তোডাতঙ্কের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার হইল। আজ বীর সুরতানের বীর-বাক্য পূর্ণ—তিনি পৈতৃক রাজসিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা দ্বারা সুবিমল স্বাধীনতা-সুখ ভোগে সক্ষম হইলেন। সকল অন্তরের বিষাদরাশি অপসৃত হইল। সুদৃঢ় অধ্যবসায় গুণে যবন-রাহুর গ্রাস হইতে স্বাধীনতা-সূর্য্য পুনরুদ্ধার হইল। অতঃপর সুরতান নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজ স্ত্রী তারাবাই সহ স্বভবন কমলমীরে প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পৃথ্বীরাজ এইরূপে বীরাঙ্গনা পত্নীসহ যবন রণে জয়ী হইয়া, তোডাতঙ্কের স্বাধীনতা সমুদ্ধার করেন। যাহা হউক, সুপবিত্র রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তারা এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারেন নাই। কিন্তু আজ তাঁহার সুখ-লাভ-আশা মিটিল; সতী পতিসোহাগিনী হইয়া কিছু দিনের জন্য নবজীবন স্বামিসহ সুখে অতি-

বাহিত করিতে সক্ষম হইলেন। দুঃখ-অমাবস্যার ঘোর তামসী নিশার দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া, এত দিনের পর সুখ-শশীর সুবিমল স্বর্গীয় আলোক প্রাপ্ত হইলেন।

জগতের নিয়ম, মহৎ জীবন মহত্ত্বের কারণ, কালের কুটিল নেত্রের তীব্র দৃষ্টিতে অকালে লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তারা এবং পৃথ্বীরাজ আর কত দিন জগতীতলে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবেন? তাঁহাদের দীর্ঘ-জীবন আশা দুরাশা মাত্র। বামন হইয়া সুদূরস্থিত সুনীল গগনবিহারী চন্দ্রকে প্রাপ্ত হওয়া, পঙ্গু হইয়া অভ্রভেদী হিমাচলচূড় লঙ্ঘন-আশা, বধিরের তান-লয়-বিশিষ্ট সুমধুর সঙ্গীত-শ্রবণ-বাঞ্ছা, অন্ধের সুরঞ্জিত সুরম্য চিত্র-পট দর্শন-আশা যেরূপ দুরাশা মাত্র, কালের করাল কবল হইতে বীরের দীর্ঘজীবন-লাভ আশাও তদ্রূপ। অধিক দিন তারা ও পৃথ্বীরাজকে মর্ত্যজীবন ভোগ করিতে হইল না। সহসা জীবন-নদীতে যৌবন-প্রবাহের পূর্ণ-প্রবাহে ভাটা পড়িল। জীবনমঞ্জরী অকালে কালকীটে কর্ত্তন করিল। অঙ্কুরে বৃক্ষ ভগ্ন হইল। জগতের আশা ভরসা ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া আবার সহসা নিভিয়া গেল! পৃথ্বীরাজের ত্রয়োবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমে—যৌবন-প্রবাহের পূর্ণ প্রবাহে, তাঁহার প্রিয়তমা ভগ্নী, স্বামী প্রভূরায়ের প্রপীড়নে পীড়িত হইয়া মনোদুঃখ নিবারণার্থ স্বীয় ভ্রাতার নিকট কাল-পত্র লিখিলেন। সেই বিষময় পত্রোদগত বিষই তাঁহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। পত্রে লিখিত ছিল, "যদি প্রাণ রক্ষা কর, তো রক্ষা হয়। পতির অত্যাচার অসহ্য—অকথ্য! দুবিশ্রান্ত মাদক এবং অহিফেন সেবনোন্মত্ত স্বামী সর্ব্বদা আমাকে পীড়ন করিতেছেন। যদি ভ্রাতা হও—ভগ্নী বলিয়া

এক বিন্দুও স্নেহ থাকে, তবে প্রাণে বাঁচাও।" এ পত্র পাঠে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি আশ্রিতের উদ্ধার না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? পৃথ্বীরাজ ভগ্নীর বিষাদময়ী লিপি প্রাপ্তে স্বভবন হইতে প্রভুরায়-ভবনে গমন করিলেন। প্রভুরায়কে যথোচিত অবমানিত করিয়া ক্রোধ সহকারে বলিলেন, "যদি প্রাণের আশা থাকে, তবে আমার সম্মুখে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। পত্নীর পাদুকাদ্বয় ক্ষণকালের জন্য মস্তকে ধারণ কর।" প্রভুরায় কি করিবেন? অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য তাহাতেই সম্মত হইলেন। স্ত্রীর পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া পৃথ্বীরাজের সম্মুখে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন; কিন্তু সর্ব্বদা অপমানের প্রতিশোধ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পঞ্চদিবস কাল কলে কৌশলে আত্মীয়তা প্রদর্শনে পৃথ্বীরাজকে স্বভবনে রাখিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিলেন।

মদিরা বিষ। মদিরা গরল। কৌশলে প্রভুরায় অবমাননাকারী সেই পৃথ্বীরাজকে গরল পান করাইলেন—সুধাভ্রমে বিষ পানে মত্ত করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে বিদায় দিলেন।

বিস্তৃত প্রাঙ্গণমাঝে,—ভারতীয় ভাস্করগণের শিল্পবিদ্যার পরিচায়ক মাতাদেবীর দেবমন্দির সম্মুখে, তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিল—দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। সামন্তগণ-সম্মুখে তিনি একবার জন্মের মতন প্রাণ-সম প্রিয়তমা সেই তারার মুখ-কমল দর্শনে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বিষের বিষম দংশন তাঁহার আর সহ্য হইল না—মর্ত্ত্যে তারার সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। তারার আগমনের পূর্ব্বেই দেহ-পিঞ্জর হইতে, দেবীমন্দির সম্মুখে, মাতাদেবীর

দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে, তাঁহার প্রাণ-পাখী পিঞ্জর ফেলিয়া পলায়ন করিল।

ক্রমে পতিপ্রাণা সতী তারা দেবীমন্দিরে স্বামিসন্নিধানে আগমন করিলেন। পৃথ্বীরাজকে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত দেখিয়া, সতীর কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ভৃত্যগণকে চিতা সজ্জিত করিতে অনুমতি করিলেন। চিতা সজ্জিত হইল। পতিপ্রাণা সতী পতি-শবালিঙ্গনে শায়িত হইলেন। বিভীষণ চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বীরনারী মহামন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া, সতীত্বের অনন্ত আদর্শ—বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া, জাতীয় জীবনের পূর্ণবিস্তারে সক্ষম হইয়া, প্রজ্বলিত চিতানলে ভস্মীভূত হইলেন। চিতা-নিঃসৃত ধূমরাশি অনন্ত আকাশে সমুত্থিত হইয়া, দেবীর দেবীত্ব কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ঐ দেখ! তাঁহাদের অনন্ত কীর্ত্তিচিহ্ন আজিও রাজস্থানে বর্ত্তমান! স্মারক মন্দির জগতের নয়নদর্পণে প্রতিফলিত। ঐ দেখ! মাতাদেবীর মন্দিরসম্মুখে, পার্ব্বত্য উপত্যকা মধ্যস্থিত রমণীয় প্রদেশে বীরকেশরী পৃথ্বীরাজ ও তৎসহধর্ম্মিণী বীরাঙ্গনা তারাবাইয়ের চিতাভস্ম-সংরক্ষিত স্মারক-মন্দির।

দেখ! ভারত-সন্তান চক্ষু মেলিয়া দেখ! পর-পদ-দলিত, নির্ব্বীর্য্য, নিস্তেজ, নিশ্চেষ্ট ভারত-সন্তান একবার চক্ষু খুলিয়া অবলা হিন্দু-ললনার কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখ! হৃদয়কপাট উদ্ঘাটন করিয়া, হিন্দু রমণীর অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী একবার হৃদয়াগারে স্থান দাও! অধিক দিনের কথা নয়—সেই দিনের কথা, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে চিরপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরের হস্তি-

নার রাজ-সিংহাসন দুরন্ত পাঠান নৃপতিগণের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলে,—লোদীবংশের ভারতশাসনের শেষ অবস্থায় হিন্দু-রমণীগণ স্বদেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য এইরূপে প্রাণ-পণে তূণীর আরাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম স্বদেশের জন্য সমরাঙ্গণে বীরের ন্যায় আত্ম-ত্যাগ; বাক্য—যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহ শার্দ্দূলের ন্যায় ভয়াবহ গর্জ্জন-ধ্বনি, নয়ন-যুগলের সার্থক দর্শন—প্রচণ্ড সমরানলে শত্রুর অধঃপতন, শিক্ষা, অস্ত্র পরিচালনা যাঁরা সম্মুখ সংগ্রাম। আর আজ তাঁহাদের সন্তানগণের কি দুরবস্থা! তাহাদেরও সেইরূপ হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, দেহ সকলই আছে, কিন্তু সে সকলের কার্য্য নাই! তজ্জন্যই ঐ দেখ! বঙ্গের উজ্জ্বল রবি অক্ষয় অক্ষর খুলিয়া বলিতেছেন, "নাম আছে, কিন্তু পদার্থ নাই। অঙ্গার আছে, তাহাতে অগ্নি নাই। দেহ আছে, তাহাতে জীবন নাই। সাকারবাদীর অশ্বত্থমূলবিদ্ধ, কবাটশূন্য, জরাজীর্ণ দেবমন্দির বিদ্যমান আছে, দেববিগ্রহ বিদ্যমান নাই।"

জবহর বাই।

অন্তর্ব্বিপ্লবই অধঃপতনের মূল। এই অন্তর্ব্বিপ্লবে বীরস্থান রাজপুতনা ধ্বংস হইয়াছে—মিবাররাজ্য উৎসন্ন গিয়াছে। কুক্ষণে রাণা বিক্রমজিৎ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ মধ্যে সেই মহাপ্রলয়ঙ্কর অন্তর্ব্বিপ্লব প্রবাহিত হইল।—কুক্ষণে রাণা সর্দ্দারগণকে তুচ্ছ জ্ঞানে, নিকৃষ্ট মল্ল এবং পদাতিকগণকে অযথা সম্ভ্রমসূচক অধিকার দান করিয়া তাহাদের অনুরাগী হইলেন। ইহার বিষময় ফল অচিরে রাণাকে ভোগ করিতে হইল। অপাত্রে রাণার অনুরাগ সর্দ্দারগণের চক্ষুঃশূল হইল। সর্দ্দারগণ রাণার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, রাজ্য মধ্যে শান্তি সংস্থাপনে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সর্দ্দারগণ মিবারের প্রকৃত মিত্র ছিলেন, আজ রাণার কুব্যবহারে শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইলেন। এত দিন সর্দ্দারগণ রাণার আদেশ-পালনে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা রাণার আদেশ অমান্য করিতে আরম্ভ করিলেন। রাণা সর্দ্দারগণকে কোন বিষয়ে কোন আদেশ করিলে, সর্দ্দারগণ তারস্বরে একবাক্যে গর্ব্বের সহিত বলিতেন, "আমরা এরূপ অপাত্রে সৌহার্দ্দ-সংস্থাপনকারী রাজার অধীনস্থ ভৃত্য নহি।"

মিবাররাজ বিক্রমজিৎ এবং তাঁহার সর্দ্দারগণমধ্যে যে বহ্নি প্রজ্বলিত হইল, এ বহ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। বৃক্ষের সঙ্ঘর্ষণে অরণ্য মধ্যে যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়, সেই দাবানলই অরণ্য সমূলে উৎসন্ন করে। মিবারেও তাহাই হইল। বিক্রমজিৎ আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন,

আর তিনি কেমন করিয়া—কোন্ মহামন্ত্র-প্রভাবে আত্মরক্ষা করিবেন? মিবারে পার্ব্বত্যগণ নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করিল। দস্যুগণের সমূহ উপদ্রব-স্রোত প্রবাহিত হইল। পরস্বাপহরণ প্রভৃতি যত কিছু অনিষ্ট দেশমধ্যে সঙ্ঘটিতে পারে, সকলই এক সঙ্গে মিবারে প্রবেশ করিল। মিবার অরাজক!

এদিকে ধীরে ধীরে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য দিন দিন স্বসীমা বিস্তার করিতেছে। সুবিখ্যাত বাহাদুর সাহ গুর্জ্জর দেশের রাজা। এতদিন তিনি স্বীয় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন। রাণা বিক্রম-জিতের পিতৃপুরুষ বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজ, বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ মজঃফর সাহাকে চিতোরের কারাগারে, সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দী করেন। বাহাদুর এত দিন পিতৃপুরুষের সেই শোচনীয় বন্দিত্ব সম্রাটকুলের সেই গভীর কলঙ্ক-কাহিনী হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অন্তর্নিহিত রাখিয়া, কোন্ সুযোগে—কোন্ উপায় অবলম্বনে, অন্তরের ক্ষোভ—বন্দিত্বের প্রতিহিংসা নিবৃত্তি করিবেন, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে রাণা ও তাঁহার সর্দ্দারগণের মধ্যে অন্তর্ব্বিপ্লব উপস্থিত। বাহাদুরেরও প্রতিহিংসা নিবৃত্তির সমূহ সুযোগ উপস্থিত। বাহাদুর সাদরে সে মাহেন্দ্রযোগ আলিঙ্গন করিলেন। অসংখ্য বিজয়িনী যবনসেনা জিঘাংসা ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া প্রচণ্ডবেগে রাণা বিক্রমজিৎকে আক্রমণ করিল। রাণা তখন লৈচা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বীরভূমি লৈচা বুন্দিপ্রদেশের অন্তর্গত। জয়োল্লাসী দুরন্ত যবনসেনা লৈচাক্ষেত্রে রাণাকে আক্রমণ করিল। লৈচাক্ষেত্রে হিন্দু-যবনে ঘোরতর সমর-

স্রোত প্রবাহিত হইল। সাগরসম অসংখ্য যবন বিক্রমকে সহসা পরাভূত করিতে অক্ষম হইল; কিন্তু সামান্য কয়েকটি পদাতিক সৈন্য কত ক্ষণ তাঁহার সাহায্য করিবে? তাহারা জলবুদ্বুদের ন্যায় শীঘ্রই সমরার্ণবে বিলীন হইল। বিক্রমজিৎ ক্রমে হীনবল হইলেন। সর্দারগণ পূর্ব্বেই তাঁহাকে সঙ্কটে পরিত্যাগ করিয়া, কনকনগরী চিতোর রাজপুরী রক্ষার্থে চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন।

এ দিকে চিতোরে আবার মহাবিপ্লব উপস্থিত। গুপ্তভাবে বাহাদুর সাহ লাব্রি খাঁ নামক অনৈক ইউরোপীয় গোলন্দাজ দ্বারা চিতোর ভূমিসাৎ করিবার জন্য এক গুপ্ত ফাঁদ পাতিয়াছেন। চিতোর দুর্গের নিম্নে ভূগর্ভে একটি সুবৃহৎ সুরঙ্গ খনন করাইয়া তাহা বারুদ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ঘোরতর যুদ্ধসময়েসেই রন্ধ্র-পথে অগ্নি সংযোগ দ্বারা চিতোরের উৎসাদন করিবেন, এই তাঁহার বাসনা। ক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। অগ্নিসংযোগে দেখিতে দেখিতে দুর্গের এক প্রকাণ্ড প্রাকার ভগ্নহইল! তৎসহ হরবংশীয় বুন্দিরাজ পঞ্চশত রাজপুত বীর সমভিব্যাহারে কালের করাল কবলে পতিত হইলেন। চিতোর রক্ষার্থে আসিয়া নিঃশব্দে বুন্দীরাজ জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। রন্ধ্র পথে ঘোর যুদ্ধ সমারব্ধ হইল। এক এক করিয়া রাজপুত মুণ্ড ভূমিশায়ী হইতে লাগিল। রন্ধ্র পথ বীরশূন্য হইল! যবন-সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল! আজ আর চিতোরের রক্ষা হয় না! এমন সময়ে দুর্দ্দশার চরমকালে এক হিন্দুনারী ছার জীবনের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া, কোমলাঙ্গ কঠিন লৌহ-বর্ম্মে আবৃত করিয়া স্বদেশ রক্ষারূপ মহামন্ত্রের সাধনে অগ্রসর হইলেন।

আর যবনের নিস্তার নাই। স্বয়ং মহাশক্তি আজ তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। আজ তাহাদের রক্ষা করে কার সাধ্য? তাহাদের ভাগ্য-গগন আবার ক্ষণকালের জন্য তিমিরাচ্ছন্ন হইল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে রন্ধ্র পথে, কত শত রাজপুত বীর অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন, বীরনারী অচল, অটলভাবে ভল্লসহ সেই রন্ধ্র পথে সদর্পে দণ্ডায়মানা—মহাশক্তি অসংখ্য শত্রুমুণ্ডে বিভূষিতা হইতে সমুদ্যতা—মুণ্ডে মুণ্ডমালা গাঁথিয়া কণ্ঠমালারূপে কণ্ঠদেশে পরিধান করিতে সমুৎসুকা। মহাশক্তির মহাশক্তি হইতে যবনকে আর কে রক্ষা করিবে? রণচণ্ডীসহ রণে জয়লাভ করিয়া, কে আর যবনকে বাঁচাইবে? রন্ধ্র পথে দণ্ডায়মান প্রচণ্ড যবন-সৈন্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমরার্ণবে বিলীন হইতে লাগিল।—বাহাদুরের প্রধান যোদ্ধৃবর্গ মেষের ন্যায় সিংহীগ্রাসে আপতিত হইলেন। "সাবধান যবন-সৈন্য! সাবধান!" আরাবে রণক্ষেত্র আলোড়িত হইতে লাগিল! মুমূর্ষাবস্থাপন্ন যবন-সৈন্য "প্রাণ যায়" "প্রাণ যায়" রবে মর্ম্মভেদী ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কেহ বা যন্ত্রণার কঠোর পীড়নে "এ পাপ প্রাণে আর কাজ নাই" এই ভাবিয়া করস্থিত শাণিত অসিচালনে, স্বতনু দ্বিখণ্ড করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল। রন্ধ্র দ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া, যবন-সৈন্য জড়পিণ্ডবৎ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। যবন শিবিরে মহা-শোকধ্বনি সমুত্থিত হইল, বীরনারীর অপূর্ব্ব বীরত্বে বাহাদুর বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইলেন। চিতোর-জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। রণে ভঙ্গ দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "এখন প্রাণে প্রাণে পলাইতে পারিলে হয়।" বাহাদুর ভীরুর

ন্যায়—কাপুরুষের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিতে সমুদ্যত হইলেন। কিন্তু সুচতুর লাত্রি খাঁ তাঁহাকে ফিরাইলেন। বলিলেন, "ভয় নাই।" "ভয় নাই!" লাত্রি খাঁর সাহস-বাক্যে বাহাদুর ফিরিলেন। বীরনারীর বিরুদ্ধে বিষম অগ্ন্যস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রমণী বধে ভীষণ গর্জ্জনে ভয়াবহ কামান ছুটিল।

চিতোরের অদৃষ্ট ভাঙ্গিল। মহাশক্তির অব্যর্থ সন্ধান ব্যর্থ হইল। চিতোরের চরম কাল উপস্থিত হইল। নৃশংস বাহাদুরের প্রতিজিঘাংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইল। সুখের চিতোর দুঃখের কারাগার হইল। ভীষণ প্রতিজিঘাংসা চিতোরপুরী দগ্ধ শ্মশানে পরিণত করিল। বীরনারী জগৎকে আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া "স্বদেশ-রক্ষার্থে আত্মত্যাগ এই রূপেই করিতে হয়" এই কথা বলিতে বলিতে ইহ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বীরনারীর জলন্ত বীর্য্যবহ্নি অনন্ত কালের জন্য নির্ব্বাণ হইল। রন্ধ্রদ্বার রক্ষকশূন্য হইল। যবনসেনা তীব্র-বেগে তন্মুহূর্ত্তে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। দুর্গমধ্যে হিন্দু-যবনের প্রচণ্ড সমর-বহ্নি প্রজ্বলিত হইল। দেখিতে দেখিতে কাল-সমরে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র রাজপুত-বীর জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। কিছু কালের জন্য চিতোর শত্রুর পদানত হইল।

এ বীর-রমণী কে? রাঠোরকুলোদ্ভবা শীশোদীয়-রাজমহিষী জবহর বাই—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর নারীশ্রেষ্ঠ জবহর বাই। জবহর বাই, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শৈশব সময়ে—যবন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কালে বীরভূমি মিবারের সুপবিত্র রাঠোর-কুলে জন্মপরিগ্রহ করেন। মহৎ কার্য্যের মহৎ আদর্শে, মহৎ জীবনের মহৎ আখ্যায়িকা অধ্যয়নে হৃদয় মহত্বে পরিপূর্ণ হয়।

বীর-নারীরও তাহাই হইয়াছিল। পূর্ব্বে রাজস্থানে বীরের অপূর্ব্ব বীরত্ব—জলন্ত আত্মত্যাগ গাথারূপে গায়ক কর্ত্তৃক গীত হইত। জবহর সেই সকল গাথা শৈশবে শ্রবণ করিতেন, আর সমরক্ষেত্রে বীরের বীরত্ব দেখিতে উত্তেজিত হইতেন। এমন কি! সত্য সত্যই জবহর এক দিন লুক্কায়িত ভাবে হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। স্বচক্ষে রণস্থলের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন,"এই তো প্রকৃত কার্য্য! এইরূপ জীবন বিসর্জ্জনই তো মানুষের কার্য্য!" ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই মহাবাক্য তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইল। জবহর বাই বিবাহিতা হইলেন। সুপবিত্র শীশোদীয় কুলে তাঁহার পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইল। কুলের গৌরব-রক্ষার্থে তিনি এই মহাব্রত অবলম্বন করিলেন।

বীরনারী বীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বীরকুলে পরিণীতা হইয়াছিলেন। অন্তিমেও বীরের ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। মহিষী জবহর বাই স্বদেশ রক্ষার্থে—মিবারের সমুজ্জল স্বাধীনতা রক্ষার্থে, যে মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে চিরদিনের তরে স্বর্ণাক্ষরে তাহা প্রতিফলিত রহিবে। জবহর বাই অবলা রমণী হইয়া স্বীয় মহৎ হৃদয়ের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আজ ভারতবাসীর নিকট অলীক গল্প বলিয়া প্রতীয়মান। ভারতের এমনই দুর্দ্দশা হইয়াছে—নহিলে ভারতের পুরুষ ও রমণীর এমন দুর্গতি হইবে কেন?

পান্না।

পান্না মানবজীবনের আরাধ্য রত্ন—খনি মধ্যে লুক্কায়িত মণি। সে মণির মূল্য আছে, কিন্তু এ পান্নার তুচ্ছ মূল্য নাই—এ পান্না অমূল্য। মূল্যবান পান্নার আছে কি? আর এ পান্নার নাই কি? যদি স্বার্থত্যাগ—যাহা জগতের নিকট মহৎ বলিয়া পরিগণিত, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, এ পান্নায় তাহা আছে। ধর্ম্ম, যাহা জীবনের অবলম্বন, মনুষ্যের অস্তিত্ব তাহাও এ পান্নায় বর্ত্তমান। প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা, যাহা এ জগতে কেহ কখনও দেখাইয়াছে কি না সন্দেহ, এ পান্না জগতের সম্মুখে তাহাও দেখাইয়াছে।

পান্না সেই বরণীয় মিবারের কোন অজ্ঞাত রাজপুত বংশোদ্ভবা। কিন্তু কর্ম্মফলে আজ সে প্রসিদ্ধ শীশোদীয় বংশের গৃহধাত্রী। কাল-সমরে পিতা সংগ্রাম সিংহ উদয় সিংহকে অনাথ করিয়া গিয়াছেন। পুত্র মায়া ত্যাগ করিয়া, স্বদেশের জন্য গৌরবের ডালি সঙ্গে লইয়া, স্বর্গে স্বর্গীয় পিতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ষড়বর্ষীয় শিশু অসহায় উদয় সিংহ, কাল ভুজঙ্গ-পরিবৃত পুরীতে আজ সেই সামান্যা পান্নার আশ্রিত।—মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র দাসীর আশ্রিত! পান্না আহার প্রদান করিলে শিশু খাইতে পায়—শয্যা পাতিয়া দিলে, শিশু নিদ্রা যাইতে পায়। রাজকুমারের আজ এইরূপ অবস্থা! রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য সকল থাকিতেও তাঁহার আজ এই দুর্দ্দশা!! এ প্রশ্ন উঠিতে পারে, "কেন

তাঁহার এরূপ অবস্থা?—মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র কেন আজ দাসীর আশ্রিত?" তাহার উত্তর নাই। কেবল এক মাত্র উত্তর—চক্রীর চক্রে পড়িয়া আজ তাঁহার এই দুর্দ্দশা।

চক্রীই বা কে? আর চক্রই বা কি? চক্রী সেই বনবীর; আর চক্র তাহার কালকূটভরা অন্তর। সংগ্রাম সিংহ বনবীরের কালকূটভরা অন্তর চিনিতে পারেন নাই। তিনি শুদ্ধ বনবীরের মুখের কথায় ভুলিয়াছিলেন—তাহার মোহিনী শক্তির গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মানব যদি, ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা জানিতে পারিত, তাহা হইলে এ জগতে কি কোন অনিষ্টকর কার্য্য হইত? মহারাণা যদি জানিতে পারিতেন, যে বনবীর তাঁহার মিত্র নয়—শত্রু; স্বার্থসিদ্ধি তাহার মূলমন্ত্র, তাহা হইলে বনবীর কি কখনও সংগ্রাম সিংহের দক্ষিণ হস্ত হইতে পারিত? নীচকুলোদ্ভবা দাসীপুত্র হইয়া, কি মহারাণা মিবারেশ্বরের মন্ত্রিত্বে বরণীয় হইত? মহারাণা তাহার অন্তর চিনিতে পারেন নাই, তাই সে আজ উচ্চপদবীতে সমারূঢ়। মহারাণার অবর্ত্তমানে, উদয় সিংহের অপ্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা রক্ষা হেতু, মিবার রাজাসনে সমাসীন। তাই বলিতেছি, চক্রীর চক্রে পড়িয়া, উদয় সিংহের আজ এই দুরবস্থা! লোভ ষড়্রিপুর তৃতীয় স্থানীয়। বনবীর সেই লোভের কুহকিনী মায়ায় মুগ্ধ। কালে উদয় মিবারাকাশে উদয় হইলে, তাহাকে এই শিশুর অধীনে থাকিতে হইবে, এই তাহার আশঙ্কা। তাহার বংশ মিবারের শাসনকর্ত্তা না হইয়া, সংগ্রামের বংশ মিবার শাসন করিবে, এ কি সহ্য হয়? তাই কৌশলে শিশুর নিধনসাধন তাহার এক মাত্র আরাধ্য

ব্রত। ব্রতের অনুষ্ঠান চলিতেছে; শীঘ্রই উদ্‌যাপন হইবে। সেই ব্রতানুষ্ঠানই উদয় সিংহের দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ।

আজ বনবীরের ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর। ধরণী নিস্তব্ধপ্রায়। মানব নিদ্রামোহে অচেতন। কাহারও সাড়া সংজ্ঞা নাই। এমন সময় চিতোর-রাজপুরীর বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার, সশঙ্কচিত্তে, শশব্যস্তে, দ্রুতপদবিক্ষেপে, পান্না সমীপে উপস্থিত হইল। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে পান্না দুইটি শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। মানব সমাগমে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল। ক্ষৌরকারকে দেখিয়া পান্না সহসা চমকিয়া উঠিল। ভীতিব্যঞ্জক বদন দেখিয়া, পান্না ক্ষৌরকারকে জিজ্ঞাসা করিল; "কি হইয়াছে? এত বিমর্ষ কেন?" উত্তরে ক্ষৌরকার পান্নার কানে কানে কি বলিল। যাহা বলিল, তাহা সহজ কথা নহে—তাহা সর্ব্বনাশের কথা। শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হয—হৃদয়ের মর্ম্মস্থল কাঁপিয়া উঠে। পান্না স্থিরচিত্তে, নিবিষ্টমনে তাহা শুনিল। মর্ম্মভেদী কথা তাহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল না। তাহার বদন ভীতিব্যঞ্জক কালিমার পরিবর্ত্তে, ক্রোধ-উদ্দীপক রক্তিমবরণ ধারণ করিল। দুঃসহ দুঃখ-সহযোগী নৈরাশ্যের পরিবর্ত্তে, তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পান্না জানিত, অত্যাচার অত্যাচারীর অবনতি, আর অত্যাচারিতের উন্নতির মূল।—সে জানিত, অযথা অত্যাচারই অধঃপতনের লক্ষণ। সে জানিত, কুরুরাজ দুরাচারী দুর্য্যোধন, ধর্ম্মভীরু দেবহৃদয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়াই—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী" এইরূপ অহঙ্কারসূচক বাক্যে, ধর্ম্মবীরকে অবমানিত

করিয়াই, পরিশেষে, অকালে কালসাগরে বিলীন হইয়াছে। তাই তাহার হৃদয়ে ভীতি-সঞ্চার হইল না। তাই তাহার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইল না।

বনবীর কালান্তক যম! সেই নৃশংসের ব্রত উদ্যাপন! শুনিয়াছি, কাপালিকেরা নৃমুণ্ডমালিনী তারা সম্মুখে জীবন্ত নরদেহ খণ্ড খণ্ড করিত—নরশোণিত জ্বলন্ত পাবকে নিক্ষেপ করিয়া হোম করিত। শুনিয়াছি, অসভ্য সাঁওতাল, ভীল, কুকি প্রভৃতি দুরন্ত পার্ব্বতীয়গণ, আরাধ্যা দেবী সম্মুখে নরবলি—নৃশংস নরবলি প্রদান করিত। কিন্তু এ তো সেরূপ নহে। তাহারাও তো এত নৃশংস নহে। তাহারা তো কখন প্রতিপালকের, যাহার অন্নে জীবিত, যাহার কারণ তাহাদের জীবন বর্ত্তমান, যে আহার প্রদান করিলে খাইতে পায়, না করিলে অনাহারে মরিতে হয়, তাহার প্রতি তো কখনও নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করে নাই! কিন্তু বনবীর আজ তাহাই করিতে সমুদ্যত। বনবীর যাঁহার অন্নে, শুদ্ধ বনবীর কেন? তাহার পিতা পিতামহগণ পর্য্যন্তও যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছেন—যাঁহার কৃপাগুণে বনবীর সেই দেবাদিবাঞ্ছিত মিবার-রাজাসনে এক দিনের জন্যও উপবেশন করিতে পাইয়াছে, আজ তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত! তাঁহার প্রাণের পুত্তলিকা অতল জলধিজলে ডুবাইয়া দিতে দৃঢ়ব্রত!

পান্নাসহ ক্ষৌরকারের গুপ্ত কথাও আর কিছু নহে। গভীর নিশীথে, সুতীক্ষ্ণ শাণিত ছুরিকা হস্তে বনবীর সুপবিত্র বাপ্পার বংশ ধ্বংস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। বংশধর উদয়কে জন্মের মত অন্তগামী করিতে আসিয়াছে। পান্নাকে এই মর্ম্মভেদী

সংবাদ-দানই ক্ষৌরকারের গুপ্ত কথা। ক্ষৌরকার প্রদত্ত সর্ব্ব-নাশের কথা পান্না তো শুনিল। কিন্তু পান্না আর তাহার কি করিবে? সামান্য দাসী হইয়া, রাজপুত্রের অমূল্য জীবন-রত্ন কাল-দস্যু-হস্ত হইতে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? বনবীর মিবারের বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তা—রাজা। আর পান্না সেই রাজবাটীর দাসী বা ধাত্রী। যাহার আজ্ঞায় শত শত লোকের মুণ্ডপাত হইতে পারে, মিবাররাজ সেই বনবীর আজ উদয়সিংহের শত্রু—ভীমবেশে তাঁহার বধার্থী। সামান্যা পান্না কেমন করিয়া, তাহার প্রতি-যোগিতা অবলম্বন করিবে? তাহার কাল-হস্ত হইতে কেমন করিয়া, উদয়কে মুক্ত করিবে? তবে কি হইবে? বিশ্বাসঘাত-কের হস্তে কি দেববংশ লোপ পাইবে? সংগ্রাম মিত্রজ্ঞানে, যাহাকে স্বীয় মন্ত্রিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, অন্তিমকালে শিশুর পালনের ভার যাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, কিছু দিনের জন্যও সমুজ্জ্বল মিবারের সেই রাজসিংহাসন যাহাকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন,—তাহারই হস্তে কি আজ বংশ ধ্বংস হইবে? মিবারের রাজবংশ লোপ পাইবে? এতই কি জগৎ পাপ-ভারাক্রান্ত যে, জগতে ধর্ম্মের অবমাননা হইবে? আর অধর্ম্মীর জয় হইবে?

পান্না মহাবিপদে পড়িল। অনাথ বালক উদয় সিংহ তাহার আশ্রিত। আর বনবীর সেই আশ্রিতের নিধনার্থী। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য এমন কি জীবন বিনিময়েও আশ্রিত জনে আশ্রয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিপদে আশ্রিতের জীবন সংরক্ষণ মহত্ত্বের লক্ষণ। চিরকাল হইতেই রাজপুতজাতি তাহা

জানিত। আর পান্না-জীবনেরও তাহাই মহাব্রত। সুতরাং পান্না আর কেমন করিয়া—প্রাণ থাকিতে, আশ্রিত অনাথ বালক উদয় সিংহকে বনবীরের কাল হস্তে ন্যস্ত করিবে? কোমল কুসুম কোন্ প্রাণে জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ করিবে? আর বিলম্ব নাই! বনবীর এখনই আসিবে! বাপ্পার সুপবিত্র বংশ এখনই ধ্বংস হইবে! বাপ্পার বংশে যে আর কেহই নাই—উদয় সিংহই যে একমাত্র বংশধর। বনবীরের অত্যাচারে কি বীরবংশ লোপ পাইবে? ইতিহাসে সুবিখ্যাত বরণীয় শীশোদীয় বংশ কি সামান্য বারিবিন্দুর ন্যায় কাল-সাগরে মিশিয়া যাইবে? পান্না দেখিল, উদয়কে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই—কেবল একমাত্র উপায় বর্ত্তমান, সে কুসুম-বিনিময়ে কুসুম রক্ষা। যাহা জীবনের অবলম্বন, অসময়ে অন্ধের যষ্টি, যত্নের একমাত্র পুত্তলিকা, তাহারই বিনিময়ে উদয়কে রক্ষা করা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। আর তাহাই কি সহজে হইতে পারে? তাহাতেই কি অনায়াসে, নিরুদ্বেগে কার্য্য সকল হইবে? তাহাও নহে। তবে এখন কি কর্ত্তব্য? পান্নার একমাত্র আদরের সন্তান, সে জীবন মূল্যবান? না বাপ্পা-বংশোদ্ভব উদয়ের জীবন মূল্যবান? উদার পাঠক পাঠিকার মত ভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু পান্না দেখিল, উদয়ের জীবনই সমধিক মূল্যবান। দাসীপুত্র জীবিত থাকিলে, তাহাকে যাবজ্জীবন প্রভুর ক্রীত-ভৃত্য হইয়া থাকিতে হইবে,—একমুষ্টি অন্নের তরে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। আর উদয় মিবারাকাশে উদয় হইবে, রাজপুত্র রাজোপাধি গ্রহণ করিবে। কত অনাথ দীন দুঃখী তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইবে। একের জীবন

ধরণীকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত করিবে—জগতে অশান্তির বীজ বপন করিবে। আর অন্যের জীবন ধরণীর দুঃখ দূর করিবে—এই অশান্তিময় জগৎ শান্তি-নিকেতনে পরিণত করিবে। দাসী-পুত্র জীবিত থাকিলে জগতে অধর্ম্মেরই জয় হইবে,—বনবীরই মিবারের অধিপতি হইবে। আর উদয়ের জীবন, যাহা রক্ষা হইলে বনবীরের দর্পচূর্ণ হইবে, সে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত পাইবে—ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মেরই জয় হইবে। আরও উদয় বিনষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা পড়িবে, দাসীর ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না—তাহাকে প্রভু নিধন-পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে। জগতে কেহ আর কখনও দাস দাসীর প্রতি বিশ্বাস সংস্থাপন করিবে না। "পান্না পাপিনী, পান্না ডাকিনী" বলিয়া, জগৎ গালি দিবে। আর যদি পুত্র বিনিময়ে উদয়ের জীবন রক্ষা হয়, তবে জগতে কীর্ত্তি থাকিবে। জগতে চিরদিন প্রভুভক্তির উদাহরণে পান্নার নাম গ্রথিত করিবে, পান্নার জীবন সার্থক হইবে। সুতরাং পান্না দেখিল, পুত্রজীবন অপেক্ষা উদয়ের জীবনই সমধিক মূল্যবান।

কিন্তু কিরূপে সে জীবন রক্ষা হইবে? পাপাচারীর পাপ হস্ত হইতে কেমন করিয়াই বা এ কার্য্য সম্পন্ন হইবে? দুইটি শিশুই যে ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। পাপাচরী আসিলে হয় দুইটিকেই বধ করিবে, নয় উদয়কেই নষ্ট করিবে। তবে এখন উপায় কি? উপায়, উদয়কে স্থানান্তরিত করিয়া তৎস্থানে পান্না-পুত্রকে স্থাপন করা। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া হয়? বনবীর যে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে! অন্যান্য পুরীতে অনুসন্ধান করিতেছে! এখনই আসিয়া রাজ-

পুত্রকে বিনাশ করিবে! তবে কি হইবে? এ গভীর নিশীথে কে উদয়কে স্থানান্তরিত করিবে? পান্না এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। পান্না যদি স্বয়ং উদয়কে স্থানান্তরিত করিতে যায়, তবে এখনই মহাবিভ্রাট ঘটিবে। বনবীর এখনই গৃহে প্রবেশ করিয়া, পান্নাকে না দেখিতে পাইলে মনে কত সন্দেহ করিবে—পান্না পুত্রকে চিনিয়া ফেলিবে। তবে উপায় কি? প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে পান্না উপায় স্থির করিল। সেই সংবাদদাতা ক্ষৌরকারই উপায় হইল। বিশ্বস্ত ক্ষৌরকারহস্তে পান্না একটি চাঙ্গারী প্রদান করিল। চাঙ্গারী মধ্যে নিদ্রিত উদয়কে শয়ন করাইয়া, উপরিভাগ ভোজনাবশিষ্ট আহারায় কদলিপত্র দ্বারা আবৃত করিল। ভোজনাবশিষ্ট দূরে নিক্ষেপ করিবার ভান করিয়া. উদয়-হস্তে সেই ক্ষৌরকার পান্নার মন্ত্রণাক্রমে বিদায় হইল।—উদয়ের অস্ত না হইয়া, উদয় পুনরুদয়ের পথ পাইল।

এদিকে পান্না সেই নিদ্রিত, স্নেহের একমাত্র পুত্তলিকে উদয়ের পরিবর্ত্তে শয়ন করাইয়া রাখিল। কর্ত্তব্যের মাহাত্ম্য পান্নার অনুভূত ছিল। সে কর্ত্তব্যের কারণ সকলই করিতে পারিত। তাই আজ কর্ত্তব্যরক্ষার্থে সে পুত্রমুণ্ড প্রদান করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। সে ঐশ্বর্য্য চিনিত না। ভ্রমেও তুচ্ছ সুখাভিলাষ করিত না। জীবনের অসারত্ব সে উপলব্ধি করিয়াছিল! সে কেবল হৃদয়ের মহত্ত্ব চিনিয়াছিল। প্রকৃত হৃদয়বান কাহাকে বলে, তাহা জানিয়াছিল। তাই আজ পুত্র বিনিময়ে প্রভুপুত্রের জীবন রক্ষার্থে কৃতসঙ্কল্পা। জগৎ একবার নয়ন মেলিয়া দেখ! পান্না-হৃদয়ের মহত্ত্ব একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ! দেখ! পান্না আজ সত্যের কারণ, মহত্ত্বের কারণ, দেবত্বের কারণ, কি

করিতে সমুদ্যত। দেখ! পান্নার আত্মা কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিয়াছে! দেখ! আত্মত্যাগিতার জলন্ত দৃষ্টান্ত! দেখ! উদারতার পরাকাষ্ঠা! দেখ! মহজ্জীবনের মহত্ব!

ক্ষৌরকার গমন করিবার অব্যবহিত পরেই পান্নার গৃহমধ্যে বনবীর প্রবেশ করিল। শাণিত ছুরিকা হস্তে সেই তেজোময় ভীমমূর্ত্তি পান্নার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। পান্নাকে দুরন্ত জিজ্ঞাসা করিল;—"উদয় সিংহ কোথায়?"পান্না কি বলিয়া উত্তর দিবে? এ বিপদে কি বাক্য বহির্গত হয়? কেমন করিয়া প্রাণের পুত্তলি কাল-ভুজঙ্গের মুখে দিবে? পান্না ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিল। আবার সে পাপিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল;—"উদয় কোথায়? বল, নতুবা তোরও রক্ষা নাই।" পান্না কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত! কর্ত্তব্যপরায়ণ বিভীষণ, সেই রাম-তরণীর বিভীষণ সমরে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, একমাত্র পুত্র তরণীর নিধনোপায় রামকে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন। পান্না তাহা জানিত। মহজ্জীবনের মহদ্দৃষ্টান্ত পান্নার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। পান্না বনবীরকে পুত্র দেখাইয়া দিল। আপনার একমাত্র হৃদয়ের ধন সেই শিশুর প্রতি অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিল।

বনবীর পিশাচ! হৃদয়ে তাহার দয়া মমতা কিছুই নাই। সে নিঃশঙ্কে, নির্ব্বিঘ্নে পৈশাচিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। পান্না সম্মুখে, তাহার প্রাণের পুত্রকে নৃশংসের ন্যায় বধ করিল। শুনিয়াছি, পুরাকালের গভীর নিশাকালে, অশ্বথামা পঞ্চ-পাণ্ডবকে বিনাশ করিতে গিয়া, বিধাতার চক্রে পড়িয়া, ভ্রমক্রমে বংশের অবলম্বন পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন। বলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে! বনবীরও তাহাই করিল

উদয় সিংহ ভ্রমে দাসীপুত্রের সংহার সংসাধন করিল। পান্নাও গাম্ভীর্য্য সহকারে তাহা নিরীক্ষণ করিল। সামান্য অবলা রমণীর ন্যায় তাহার মন বিচলিত হইল না। তাহার অন্তরের বিষাদ বাহিরে প্রকাশ পাইল না। অবিচলিত চিত্তে, স্থির মনে, বনবীরের পৈশাচিক কার্য্য দর্শন করিল। বনবীরের বন্যজন্তুর ন্যায় কার্য্য তাহার হৃদয়-পটে যে অঙ্কনে অঙ্কিত হইল, সে অঙ্কন শীঘ্র নষ্ট হইবার নহে। এক সঙ্গে, বনবীরের সঙ্গেও সে অঙ্কন ঘুচিবে কি না, সে বিষয়েও বিষম সন্দেহ!

পিশাচ বনবীর পৈশাচিক কার্য্য সমাপন করিয়া, হৃষ্টমনে পান্নার গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিল। আশার লহরী প্রতি লহরে তাহার হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। "আর কি? কার্য্য যে সিদ্ধ হইয়াছে।" এই ভাবিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইল। কিন্তু সে একবারও ভাবিল না যে, যম তাহার নিকটবর্ত্তী। তাহার শত্রু এখনও বিনষ্ট হয় নাই।—পান্নার অপূর্ব্ব বীরত্বে শত্রু এখনও জীবিত। সর্ব্বদা প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থের উপায় অন্বেষণে রত। সে একবারও ভাবিল না যে, ঈশ্বরের রাজ্যে অধর্ম্মের পরাজয়, আর ধর্ম্মেরই জয় হইয়া থাকে।

বনবীরের প্রত্যাগমনের পরই পান্নাও গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ক্ষৌরকারের অনুসরণে, পূর্ব্ব কথিত নদী-সৈকতে অনাথ উদয়ের জীবন রক্ষার কারণ, তদভিমুখে গমন করিল। ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নতরীর মগ্ন আরোহীকে বাঁচাইবার উপায় অবলম্বনে ব্যস্ত হইল। নির্দ্দিষ্ট নদী-সৈকতে, নিদ্রিত-উদয়-ক্রোড়ে সেই ক্ষৌরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বর্ত্তমানে উদয়ের জীবন রক্ষারূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হইল। অনেক

অনুসন্ধানে, অনেকের নিকট স্তুতি মিনতি করিয়াও বালকের রক্ষোপযোগী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল না। রাজপুতনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা বনবীরের ভয়ে, উদয়কে রক্ষা করিলেন না। পান্না বড় বিপদে পড়িল। উদয়ের জীবন এত বিপদের পরও আর রক্ষা হইল না, ভাবিয়া ভীত হইল; কিন্তু কিছুতেই নিরাশ হইল না। সে জানিত, সুদৃঢ় অধ্যবসায়ে সকলই হয়। সুতরাং স্থান অন্বেষণে বিরতও হইল না। পরে দেখিতে দেখিতে, সুমহৎ অধ্যবসায়ের গুণে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইল। বিখ্যাত জৈনধর্ম্মাবলম্বী জমীদার আশা সার আলয়ে উদয়ের আবাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। পান্নাও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, রাজবাটীতে উপস্থিত হইল। রাজবাটীর রাজ-পরিবারবর্গের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন শুনিয়াও পান্না মনের কথা প্রকাশ করিল না;—অন্তরের কথা অন্তরেই রাখিল। উদয় বিনষ্ট হইয়াছে, সকলে তাহাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিল।

পরে পান্নার অপূর্ব্ব কৌশলে যাহা হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। পাঠক! পাঠিকে! তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। মানবী পান্না যেরূপ দেবীত্ব প্রদর্শন করিল, আত্মত্যাগিতার যেরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইল, স্বীয় সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তির যেরূপ পরিচয় দিল, যদি জগৎ কখন ইহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে, তবে এ পাপ-শ্মশান-ভূমি স্বর্গে পরিণত হইবে। যখন দেখিব, ভারতের সকলেই ঐরূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছে, উদযাপন সময়ে প্রভুর জন্য—পরের জন্য, ছার জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারিবে; যখন দেখিব, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কাহাকে বলে, ভারত তাহা বুঝিয়াছে; কর্ত্তব্যের কারণ যখন দেখিব,

ভারত স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিয়াছে ; আমার, "আমিত্বের" অসারত্ব ভারত যখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছে, তখনই জানিব, ভারত স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গের নন্দনকানন ভারতের নিকট তুচ্ছ! যে দেশে আপনার প্রাণের ভ্রাতার সহিত মিলন থাকে না ; যে দেশে জানে, ভাই হইলেই বিভিন্ন হইতে হয়, সে দেশে যখন পান্নার গুপ্তমন্ত্র শিখিবে, পান্না-হৃদয়ের মহত্ব যখন অনুভব করিতে পারিবে, তখনই বুঝিব, এ ভারত আর সে ভারত নাই! নরকের নারকীয় কীট-পরিপূরিত ভারত এখন সুরম্য স্বর্গ! স্বর্গের ন্যায় ভারতে নন্দনকাননের সুগন্ধি পারিজাত আছে। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ভারতের নিকট তুচ্ছ! এ দিন কি হইবে? না সকলই স্বপ্ন! প্রতিধ্বনি কহিতেছে, "অবশ্য হইবে। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে এ দিন হওয়া অসম্ভব নহে।"

মহারাণী অহল্যা বাই।

মধ্যভারতের পার্ব্বত্য-প্রদেশে হুলকার রাজ্য অবস্থিত। মহীশূর ও মালবদেশের উত্তরাংশও এই হুলকার রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট। ইন্দোর এ রাজ্যের রাজধানী। ইন্দোরের লোকসংখ্যা ১৫,০০০ পঞ্চদশ সহস্র। ইন্দোর রম্যস্থান। প্রকৃতি দেবী সতত সমভাবে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ছয় ঋতুতেই ইন্দোরে অবস্থিতি করিতেছেন। ইন্দোরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। অস্বাস্থ্যকর সামুদ্রিক বাত্যা ইন্দোরে প্রবেশ করিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ বিন্ধ্যগিরি তাহার প্রতিবন্ধক। ঐ পর্ব্বত নগরের দক্ষিণ প্রান্তে উন্নতশিরে সতত দণ্ডায়মান। স্রোতস্বিনী নর্ম্মদার মধ্যপ্রবাহ এই রাজ্যের মধ্য-প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত। হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরী এই রাজ্যের উত্তর প্রান্তে গোয়ালিয়র প্রদেশে অবস্থিত। ভারতের নব যুগে মহম্মদের বংশধরগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইলে, যখন ইংরাজ ভারতের শাসনকর্ত্তা; সুচতুর ক্লাইব, দুরন্ত হেষ্টিংস্, উন্নতমনা কর্ণওয়ালিস্ ও সর্ জন্ সোর প্রভৃতি যখন ভারতশাসক; তখনও—ভারতের সেই মহাবিপ্লবকালেও এই ইন্দোর আপনার মহাপ্রাণতা এবং গৌরব-গরিমার পরিচয় দিয়াছিল। ধীরে ধীরে আপনার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, মহানুভবতা, অত্যুচ্চ উদারতার আদর্শ জগৎকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। এখন তাহার কিছু না থাকিতে পারে, কঠিন প্রস্তর-চাপনে এখন তাহার সে উচ্চহৃদয় সমভূম, বা নিম্নভূমও হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমানের কথা ত্যাগ করিয়া, এখন তাহার যাহা হইয়াছে, সে কথার আলোচনা না করিয়া,

যদি তাহার পূর্ব্বগৌরব স্মৃতিপথে আনয়ন করি,—অধিক দিন পূর্ব্বেরও নয়—এই ইংরাজরাজের ভারত-শাসন-কালের গৌরব স্মরণ করি, বীরের বীরত্ব কাহিনী ত্যাগ করিয়া, পুরুষের পৌরুষের কথা না বলিয়া, সামান্ত অবলা রমণীর বিষয় আলোচনা করি, তাহাতেও কত মহত্ত্ব, কত দেবত্ব ও কত বীরত্বের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মহারাষ্ট্র-কুলতিলক শিবজীর বংশই ইন্দোরের শাসনকর্ত্তা। বীরত্বে যাঁহার সম্রাটশ্রেষ্ঠ আরঙ্গজীবও ভীত হইয়াছিলেন, দেবত্বে যাঁহার স্বাধীন মহারাষ্ট্রদলও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল—তাঁহাকে দলের নেতা করিয়া দল বাঁধিয়াছিল; ইন্দোর বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া সেই বংশীয়দের শাসনাধীন ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ (১১৭২ সাল) পর্য্যন্ত হুলকার রাজ্যে মলহর রাও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরলোক গমনকালে মলহর রাওএর পৌত্র মালিরাও তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মলহর রাওএর পৌত্র কেন সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন? ইহার উত্তর এই যে, কণ্ডী রাও নামে মলহর রাওএর একটি পুত্র ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কণ্ডী রাও জগতের নিকট অপরিচিত থাকিয়া, মলহর রাওএর জীবিতাবস্থাতেই পার্ব্বত্য জাঠ জাতির যুদ্ধে নিহত হন। সুতরাং পিতার অবর্ত্তমানে পুত্র মালি রাও রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অহল্যা বাই সেই কণ্ডী রাওএর বনিতা এবং মালি রাওএর গর্ভধারিণী জননী।

কিন্তু মালি রাওকে অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে হইল না। কয়েক মাস মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া মালিরাও পরলোক গমন করিলেন। মালি রাওএর উত্তরাধিকারী কেহই

রহিল না। অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মাতৃমনে ব্যথা দিয়া, মাতৃসম্মুখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বংশে কেহই নাই, কেবল একমাত্র অহল্যা বাই বর্ত্তমান। কণ্ঠাগতপ্রাণা, পুত্রশোক-প্রাপ্তা পতিবিয়োগ-বিধুরা, জীবন্তে মৃতপ্রায় অহল্যা বাই। এক দিকে নবজীবনে, সোৎসাহে ইংরাজ-অধিকার ভারতে পরিবর্দ্ধন-শীল প্রায়, আর অন্য দিকে দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতকুল বদন ব্যাদান করিয়া, মহারাষ্ট্র-গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে সমুদ্যত। এ হেন বিপ্লবকালে একাকিনী অসহায়া হিন্দুরমণী অহল্যা বাই রাজাসনের উত্তরাধিকারিণী হইলেন।

মলহর রাওএর মৃত্যুর অল্প দিন পরেই তদীয় সিংহাসনে পুত্রবধূ অহল্যা বাই অধিরোহণ করিলেন। এখন ইন্দোর তাঁহার শাসনাধীন। তিনি এখন ইন্দোরের পাটরাণী। অবলা রমণী এখন ইন্দোরের শাসনকর্ত্রী। এখন রমণীর হস্তে রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সংরক্ষিত হইবে? না রাজ্য ভীষণ অরাজকে পরিণত হইবে? মহারাষ্ট্র-বীরগণ কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে রাজ্যের সুশাসন রক্ষা করিয়াছিলেন, সে রাজ্য এখন অবলা রমণীর হস্তে পড়িয়া গৌরব-ভ্রষ্ট হইবে? না সতেজে, সদম্ভে মস্তক উত্তোলন করিবে? ভবিষ্যদ্গর্ভে কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে? শত্রুকুল তো রমণীর হস্তে ইন্দোরের শাসনভার ন্যস্ত দেখিয়া ঘোর রোলে, সাহসভরে ইন্দোরে আগমন করিয়াছে। এখন কি হইবে?

রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই অহল্যা বাইকে একটি বিপদে পতিত হইতে হইল। গঙ্গাধর যশবন্ত নামে এক ব্যক্তি মলহর রাওএর কুল-পুরোহিত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় পুরোহিতবর্গের

প্রধানতঃ রাজকার্য্যের উপর প্রাধান্য ছিল। রাজা প্রায়ই কুল-পুরোহিতের মত ভিন্ন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিতেন না। সৎ কার্য্যই হউক, আর অসৎ কার্য্যই হউক, রাজাকে সর্ব্বদা পুরোহিতের মত লইয়া চলিতে হইত। অহল্যা বাই কিন্তু অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলেন না। যাঁহার হৃদয় স্বাধীনতাময়, তিনি আর কেমন করিয়া সকল কার্য্যেই অন্যের মুখাপেক্ষী হইবেন? সুতরাং অহল্যা বাই, পুরোহিতের সহিত মন্ত্রণার মিলন না হইলেও সৎ কার্য্য বুঝিয়া তাহা করিতে নিবস্ত থাকিতেন না। পুরোহিত গঙ্গাধর চির-কাল সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন। ইন্দোরের মহাপরাক্রমশালী নৃপতিবর্গও তাঁহার মত না লইয়া কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ অহল্যা বাই তাঁহার মত লইতেছেন না। এ অপমান গঙ্গাধরের প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি অহল্যা বাইএর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। অহল্যা বাইকে রাজ্যভ্রষ্টা করিয়া কষ্ট দেওয়া তাঁহার লক্ষ্য হইল। তিনি অহল্যা বাইএর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাধরের ষড়যন্ত্র ক্রমে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি আরও দুই চারি জন মহারাষ্ট্রীয়কে আপনার সহায় লইলেন। তাঁহার সহায়ের মধ্যে মহারাষ্ট্রাধিপতি মধু রাওএর পিতৃব্য রাঘব দাদাই প্রধান। রাঘব দাদার সহিত গঙ্গাধরের বাল্য-কাল হইতেই সৌহার্দ্য ছিল। আর জনশ্রুতি আছে যে, গঙ্গাধর রাঘব দাদাকে কিছু উৎকোচও প্রদান করিয়াছিলেন। ... গঙ্গাধর এবং রাঘব দাদা অহল্যা বাইএর প্রতি-

যোগিতা অবলম্বন করিলেন। এবং অহল্যা বাইকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, "আপনি স্ত্রীলোক, রাজ্য-শাসনে আপনার কোন অধিকার নাই। আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বারা রাজ্য শাসন করুন। মলহর রাওএর পবিত্র বংশে জল-গণ্ডূষ দান করিবার কেহই জীবিত নাই। অতএব আপনি পোষ্যপুত্র দ্বারা অনন্ত নরক হইতে বংশ রক্ষা করিতে যত্নবতী হউন। যদি আমাদের কথা আপনি অগ্রাহ্য করেন, তবে আমরা আপনার রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ তাহা অধিকার করিয়া লইব।"

অহল্যা বাই পত্র পড়িলেন। পত্র পাঠে তাঁহার হৃদয় কিছু চিন্তিত হইল, কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না। তিনি সামান্য কথায় ভীত হইবেন কেন? যিনি বীর্য্যের আধার, যাঁহার হৃদয় সাহসপূর্ণ, তিনি কি কখনও ভীত হন? অহল্যা বাই পত্রের উত্তর দিলেন। তিনি সগর্ব্বে, সদম্ভে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনারা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিবেন যে, অহল্যা বাই সেই বরণীয় মহারাষ্ট্র-কুল-দুহিতা। যে বংশ কখনও বিপক্ষের নিকট কোন কার্য্যেই পশ্চাদপসৃত হয় নাই, সে বংশের অহল্যা বাই যে, আপনাদের ভয়ে ভীতা হইবে না ইহা স্থিরনিশ্চয়। বিগ্রহেই হউক আর যাহাতেই হউক, অহল্যা বাই কিছুতেই পশ্চাদ্পদ নহে। কিন্তু আপনাদের অভিলাষ পুরুষত্বের পরিচায়ক নহে; নারীর প্রতিযোগিতা অবলম্বন পুরুষের পক্ষে ঘৃণার কার্য্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।" এই কথা বলিয়া পাঠাইবার পূর্ব্বেই অহল্যা বাই যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিয়া রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি পদাতি এবং অশ্বারোহী

সৈন্ত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করিয়াও রাখিয়াছিলেন। বলিতে কি! অবশেষে স্বয়ংও যুদ্ধার্থী হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

অহল্যার বাক্যে গঙ্গাধর এবং রাঘব দাদা স্তম্ভিত হইলেন। সামান্যা রমণীর মুখে এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কথা শুনিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, সামান্যা নারী অহল্যা তাঁহাদের কথায় ভয় পাইবেন—ভীত হইয়া তাঁহাদের শরণ লইবেন। কিন্তু এখন তাঁহাদেব সে ভ্রম দূর হইল। তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত ফল ফলিল। অহল্যার বাক্যে আনন্দের পরিবর্তে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন।

রাঘব দাদা মহারাষ্ট্রাধিপতির পিতৃব্য। অবলা অহল্যা তাঁহার অপমান করিলেন। গঙ্গাধর সে অপমান তত গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া অহল্যার স্মরণ লইলেন। কিন্তু রাঘব সে অপমানের কথা ভুলিতে পারিলেন না। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তখনই যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। মাধুরাও তাঁহার বাসনায় বাধা দিলেন।

রাঘব যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন বটে; কিন্তু অহল্যার কথা ভুলিলেন না। সে অপমান-বাক্য তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে সম্বদ্ধ রহিল। কখন না কখন তিনি অহল্যাকে অপমানের শোধ দিবেন, এই তাঁহার মনোভাব হইল। কি ভয়ঙ্কর কথা! অবলা অহল্যার আবার প্রতিবাদিতা কেন? অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এক স্থানে, আর তাহাতে অন্য স্থান দগ্ধ হয় কেন? বিবাদ অহল্যা এবং গঙ্গাধরে; কিন্তু মধ্যে থাকিয়া

রাঘব দাদার সহিত শত্রুতা সংঘটিত হইল কেন? এই তো জাতীয় অধঃপতনের লক্ষণ! এই রূপেই তো জাতীয় উৎসাদনের সংঘটন হইয়া থাকে! কিন্তু যাহা হইবার তাহা হউক, আকাশ ভাঙ্গিয়া মস্তকে পড়ুক, ইন্দোরের কিছুতেই ভয় নাই। শাসনকর্ত্রী এ রমণী সামান্যা নহেন—হৃদয় সুপ্রশস্ত, মন ইহঁার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাজ্যশাসনে মহাবাধা—বিঘ্নই থাকুক, আর কালবেশে কাল রাজ্যের দ্বারদেশে দণ্ডায়মানই হউক, তাঁহার সুপ্রশস্ত চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হইবে না।

একমাত্র রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণ অহল্যার এখন উদ্দেশ্য হইল। বুদ্ধিমতীর বুদ্ধি অল্প ছিল না। আপনার হস্তে রাজ্য-শাসনের সমস্ত ভার অর্পিত থাকিলে, স্বয়ং সকল কার্য্য সমাধা করা কিছু কষ্টকর হইবে বলিয়া, তাঁহার বোধ জন্মিল। আচার্য্যের অনুমতি লইয়া তুকাজি হোলকার নামক জনৈক বিখ্যাত যোদ্ধাকে আপনার অধীনে নিযুক্ত করিলেন। তুকাজির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তবে তাঁহাকে আপনার প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিবার কারণ কি? কারণ, আর কিছুই নহে। অহল্যা বাই গুণের গৌরব জানিতেন। বীরত্বের পূজা করিতেন। তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আত্মীয়তার পক্ষপাতী থাকিলে, তিনি কখনই এই সুমহৎ রাজকার্য্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের তুকাজিকে নিযুক্ত করিতেন না। তিনি কার্য্যকারিতায়, বুদ্ধিমত্তায় এবং বিদ্যাবত্তায় তুকাজিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছিলেন। তাই আত্মীয় সম্প্রদায়কে সেই আকাঙ্ক্ষিত সৈন্যাধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন নাই। বীরত্বে শ্রেষ্ঠ, শৌর্য্যে সুমহৎ সেই তুকাজি ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক হই-

লেও, তিনি তাঁহাকে রাজ্যের দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ রাখিয়াছিলেন।

অহল্যাবাই বিনীত শত্রুর প্রতিও দয়া করিতেন। তাঁহার নিধনার্থী গঙ্গাধর যখন শরণাগত হইলেন, তখন অহল্যা বাই তাঁহাকে আর ত্যাগ করিতে পারিলেন না। যিনি শত্রুতাবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, রাজ্য কাড়িয়া লইয়া যিনি অহল্যাকে কাঙ্গালিনী করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাধরকেও অহল্যা বিনীত দেখিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রাপ্য যোগ্য মান্য দান করিয়া স্বীয় মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিলেন। ধন্যা অহল্যা বাই! ঈশ্বর তোমার ন্যায় হৃদয় জগৎকে দান করুন, এই আমাদের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

অহল্যা বাই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় এবং সত্যপরায়ণতায় আদর্শ ছিলেন। অত্যাচারীর অত্যাচার তাঁহার সহ্য হইত না। অন্যায় করিয়া, সত্যের ভান করিয়া অসত্যের ক্রীড়ায় তিনি রুষ্ট হইতেন। তাঁহার হৃদয় অত্যাচারীর নিদারুণ অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে সর্ব্বদা সচেষ্টিত ছিল। তাই তিনি বিপুল বলশালী রাজপুতগণের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। যখন লুপ্ত রাজপুত-গৌরব পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধনশীল-প্রায়, ভীমসিংহের অধীনে রাজপুতকুল পুনরায় সতেজে, সদর্পে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছে, আপনাদের ভ্রষ্ট রাজ্যসমূহ যখন পুনরুদ্ধারের জন্য তাহারা দলবলসহ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তখনও সেই ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দেও, তাহাদের নিদারুণ গ্রাস হইতে ইন্দোর রাজধানীর অধীনস্থ স্থলকার জনপদ সমূহ রক্ষা করিতে রমণী অহল্যা বাই বদ্ধপরিকর

হন। সৈন্যদল দ্বারা সমরাঙ্গনে তাহাদের পরাজয় করিয়া আপনার বিজয়-পতাকা গগনে উড্ডীয়মান করেন।

বহুকাল পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রগণ প্রবল পরাক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া যখন সমগ্র রাজপুত জাতির অবমাননা করিয়াছিল, সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াও রাজ্যলোভে তাৎকালিক দুর্ব্বল রাজপুতকুলের হস্ত হইতে তাহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিল, এখন রাজপুতকুল দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া সেই সকল ভ্রষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্টিত হইলেন। তাঁহারা চর্দ্দু নামক স্থানে দলবদ্ধ হইলেন। মহারাষ্ট্র-গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য—পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদান জন্য, বিজয়-ভেরী বাজাইতে বাজাইতে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। অনেক রাজার অনেক রাজ্য রাজপুতগণের করগত হইল। কিন্তু তখনও রাজপুতকুল সুস্থির রহিল না। অবলা অহল্যা বাই হুলকারের শাসনকর্ত্রী। তিনি আর কেমন করিয়া অসীম পরাক্রমশালী, বীর সৈন্যসহ দলবদ্ধ রাজপুতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবেন? এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দুরন্ত রাজপুতকুল অন্যায়রূপে অকারণে অহল্যা বাইএর শাসনাধীন হুলকার রাজ্যসমূহও কৌশলে করগত করিবার চেষ্টা পাইলেন। অনেক রাজ্য বিনা বীরত্ব প্রদর্শনে তাঁহাদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছে, তবে আর সামান্য রমণী-রাজ্য রাজপুতরাজের অধীন হইবে না কেন? সমগ্র রাজপুত-সৈন্যের মনে এইরূপ অহঙ্কারের সূচনা হইল। তাঁহারা তাই সাহঙ্কারে রাজমহিষীর রাজ্য নিমবৈহারা আক্রমণ করিলেন। এইরূপ অহঙ্কারই অনর্থের মূল। এই অহঙ্কারে লঙ্কেশ্বর রাবণের স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী শেষে বন্য বানরের হস্তে উৎসন্ন-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর এই অহঙ্কারেই দুর্দ্দান্ত যবনকুল সমূলে নির্ম্মূল প্রায়। যাহাদের ভয়ে বসুন্ধরা কাঁপিত, জীব জন্তু সর্ব্বদা সশঙ্কিত ছিল, তাহারা এখন হীনবীর্য্য—শত্রু-পদ-দলিত।

রাজপুতকুল অনর্থের মূল অহঙ্কারের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। অহঙ্কারসহ রাজ্ঞীর বাক্যের অবমাননা করিয়া, নিমবৈ-হারা হস্তগত করিলেন। কিন্তু এ অবমাননা কে সহিতে পারে? একে অন্যায়রূপে অকারণে রাজ্যের উৎসাদন, তাহাতে আবার অবমাননা। এ অবমাননা ভীরু কাপুরুষ সহ্য করিতে পারে করুক, ঘৃণ্য পর-পদ-দলিত জাতির এ অবমাননা অঙ্গের আভরণ হয় হউক; কিন্তু অহল্যা বাই সেই মহারাষ্ট্র-কুল-সম্ভূতা। যে কুল ইতিহাসে সুবিখ্যাত, জগতের নিকট চিরপরিচিত, দেবত্বের কারণ দেবের নিকটও পূজ্য,বীরত্ব, মহত্ত্ব, যে কুলের কুল-গৌরব, অহল্যা বাই সেই মহারাষ্ট্র-কুলের আদর্শ নারী। সে হেন অহল্যা বাই কি এ অপমান সহিতে পারেন? সত্য বটে, অহল্যা বাই ধার্ম্মিকা—ধর্ম্মনিষ্ঠা। অনর্থক জীবহত্যা মহাপাপ বলিয়া তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত আছে; কিন্তু সে অঙ্কন অন্য সময়ের আশ্রিত অধীন জনের প্রতি। তাহা বীরের নিকট নহে। যুদ্ধক্ষেত্রে শাণিত অসিচালনে বীরের রক্তপাতও বীরধর্ম্ম। ধর্ম্মনিষ্ঠ রাম, দেবনামে আখ্যাত কেন? এক দিকে যেমন মাধুর্য্যময় কোমলতা তাঁহার হৃদয়ের গৌরব রক্ষা করিয়াছিল, অন্য দিকে সেইরূপই তিনি ভীমবেশে রণস্থলের জীবনাশেও তাঁহার উন্নত প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন। সময়গুণে প্রকৃতির বিভিন্নতাও ধর্ম্ম। সুতরাং এ স্থলে অহল্যা বাই রণস্থলে বীরের জীবননাশ অধর্ম্ম

শিবমানা নামক কোন মহারাষ্ট্র-বীর নগর রক্ষা করিতে-ছিলেন। অহল্যা বাই তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ তুলাজি সিন্ধিয়া এবং শ্রীভাই নামক দুই জন মহারাষ্ট্র-বীরকে শিবনানার সাহায্যার্থে দুরন্ত রাজপুত-গণের প্রচণ্ড আক্রমণের প্রতিরোধ জন্য, নিমবৈহারা প্রেরণ করিলেন। রাজপুত এবং মহারাষ্ট্রীয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ সমা-রব্ধ হইল। যুদ্ধে রাজপুতকুল পরাজিত হইলেন; আর বীর-নারী অহল্যা বাই জয়ী হইলেন। রাজপুতকুল নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মহারাষ্ট্র রাজ্য পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্র-রাজ্যভুক্ত হইল।

যাঁহার রাজ্য শাসনের তুলনা জগতের কোন রাজার সহিত হয় না, অহল্যাবাই সেই আর্য্য রামের পদানুসরণে রাজ্য শাসনে ব্যাপৃত ছিলেন। "শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন" এই ধর্ম্মনীতিকে ভিত্তি স্বরূপ রাখিয়া অহল্যা রাণী রাজ্যশাসন করিতেন। নিরপরাধী বিনীতের প্রতি অহল্যা বাই যেমন দয়া প্রদর্শন করিতেন, তদ্রূপই দুর্ব্বিনীত পাষণ্ডগণ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা দন্ডিত হইত। যাহাতে গৃহবিচ্ছেদ না হয়, অহল্যা বাই সর্ব্বদা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন। পাছে কার্য্যাকার্য্য লইয়া কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় যে যেমন কর্ম্মের উপযোগী, অহল্যা রাণী তাহাকে সেইরূপ কার্য্য প্রদান করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। আর সেই সকল লোকের সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান স্বয়ং লইতেন। কাহারও উপর কোন কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া অহল্যা বাই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কোন কার্য্যের ভার কাহারও উপর প্রদান

করিয়া অহল্যা মধ্যে মধ্যে তাহার তত্ত্ব লইতেন। অহল্যা বাই প্রায় সকল রাজার সহিতই সৌহৃদ্যতা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল নৃপতিই অহল্যা বাইকে মান্য করিতেন। এবং কেহই অহল্যার অনিষ্ট দেখিতে পারিতেন না। অহল্যার বিচারপ্রণালীও বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রায়ই সকল দোষ গুণের বিচার স্বয়ং করিতেন। কাহারও উপর বিচার-ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার কষ্টকর বোধ হইত। তবে নিতান্ত সামান্য কার্য্যের বিচারভার কখনও কখনও কার্য্যাধিক্য হেতু উপরিতন রাজকর্ম্মচারিগণের উপরও প্রদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিয়ম ছিল যে, বাদী কিম্বা প্রতিবাদী সে বিচারে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, আপনি স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। পাছে বিচারে কোনরূপ পক্ষপাত হয়, এই আশঙ্কায়, তাঁহার বিচারপদ্ধতি সমধিক বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য, তিনি সম্যক্ চেষ্টিত ছিলেন।

রাজ্য পরিদর্শন, রাজস্ব আদায় এবং প্রজাবর্গের দুঃখ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্যও অহল্যা বাই সুন্দর সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য তুকাজি প্রভৃতি উপরিতন কার্য্যকারিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। প্রজাবর্গের কষ্ট নিবারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সুখ দান করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল।

অহল্যা বাই সৎশিক্ষার জন্য কাহারও নিকট অবনতি স্বীকার করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রবল পরাক্রম-

অহল্যা বাই সৎ শিক্ষার জন্য সকলের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতেন। বৈদেশিক নৃপতিগণের রাজ্য-শাসন-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া তন্মধ্যে যাহা মহৎ ও ফলপ্রদ, অহল্যা রাণী তাহাই গ্রহণ করিতেন। রাজন্যবর্গের রাজনীতি সংগ্রহ করিবার জন্য অহল্যা বাই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজ-ভবনে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ প্রতিনিধিগণের উপর তদ্দেশীয় অন্যান্য রাজকীয় কর্ম্মের ভারও অর্পিত ছিল। অহল্যা রাণী যে যে স্থানে আপন প্রতিনিধি রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, পুনা, হয়দরাবাদ, নাগপুর এবং শ্রীরঙ্গপত্তন প্রভৃতিই প্রধান। এতদ্ভিন্ন শুল্ক আদায়, আধিপত্য বিস্তার প্রভৃতির জন্যও ভারতবর্ষের নানাস্থানে অহল্যা বাইএর প্রতিনিধি প্রেরিত হইত।

লোভ ষড়রিপুর এক অঙ্গ। লোভের বশবর্ত্তী নহে, জগতে এরূপ লোক অতি বিরল। কিন্তু সে অহল্যা-চরিত্রে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। অহল্যা বাই জানিতেন, লোভের মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী। অন্যের কথা কি! পুত্রও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, জন্মদাতা পালনকর্ত্তা পিতাকেও বধ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অহল্যা বাই স্মরণ রাখিয়াছিলেন যে, রাজ্যলোভে দুরন্ত আওরঙ্গজেব স্বপিতা শাহজাঁহাকে রাজকারাগারে বন্দী রাখিয়া নিহত করিয়াছিলেন। তুচ্ছ অর্থলোভে দুরন্ত মোগলগণ ভ্রাতৃনিধন পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাই অতীতের স্মৃতি স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণা, ধর্ম্মনিষ্ঠা অহল্যা বাই লোভের লীলা বুঝিয়াছিলেন। তাই লোভ মহাপাপজনক জানিয়া তিনি লোভের মোহ হইতে

আপনাকে দূরে রাখিয়াছিলেন। এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ অহল্যা-চরিত্রে পরিদৃশ্যমান আছে। অহল্যা-রাজ্যে "বসিয়া" নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে সরকাম দাস নামে এক ধনবান বণিকের বাস ছিল। ১১৯৮ সালে ঐ বণিকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বণিক নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু অতুল অর্থের সম্ভোগকর্ত্তা না থাকায় উক্ত বণিকের বনিতা একটি পালকপুত্র গ্রহণ করেন। পালকপুত্র-গ্রহণকালে অহল্যার রাজস্ব-সংগ্রাহকগণ ঐ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিকের অর্থে তাঁহাদের লোভ পড়িল। অহল্যার সম্পত্তি বৃদ্ধি জন্য তাঁহারা বণিক-বনিতাকে পালকপুত্র গ্রহণে বাধা দিলেন। অহল্যা এই সময়ে মহীশূর প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি বণিক-বনিতার প্রতি কর-সংগ্রাহকগণের অত্যাচারের কথা শুনিয়া কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন। লোভী কর-সংগ্রাহকগণকে জানাইলেন, "লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও প্রতি অত্যাচার করণ মহাপাপ। অহল্যা-রাজ্যে এরূপ পাপের প্রশ্রয়-প্রদান কখনও হইবে না; আপনারা ঐ বণিকজায়ার অভিলষিত কার্য্যে আর বাধা দিবেন না। তাহা হইলে আমার অমান্য করা হয়। আমি এরূপ অর্থের ভিখারী নহি যে, কোন অবলার প্রতি বলপ্রদর্শন করিয়া অর্থ-লাভ করিব।" অহল্যাবাক্যে করসংগ্রাহকগণের জ্ঞান জন্মিল। তাঁহারা উক্ত বণিক-বনিতাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণে আর কোন বাধা দিলেন না। বণিক-বনিতা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

অহল্যা বাইএর চরিত্রে উদারতার আবাস ছিল। তাঁহার

সকল কার্য্যেই উদারতা প্রকাশ পাইত। কাহাকেও কোন পরামর্শ প্রদান করিতে হইলে অহল্যা বাই তাহাতে উদার-ভাবাপন্ন উত্তর প্রদান করিতেন। কথিত আছে, করগ্রামে দুই সহোদর বাস করিত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম তন্নেদাস এবং কনিষ্ঠের নাম বারণদাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুই ভ্রাতাই এককালে লোকান্তরিত হয়। তন্নেদাস কিম্বা বারণদাস উভয়েরই পুত্রাদি জন্মে নাই। তাহাদের দুই জনের কেবল-মাত্র দুইটি বিধবা পত্নী বর্ত্তমান ছিল। পত্নীদ্বয় তাহাদের সমুদায় সম্পত্তি অহল্যা রাণীকে প্রদান করিয়া তীর্থবাসী হইতে বাসনা করে। কিন্তু, অহল্যা বাই তাহাদের সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন না। স্বীয় উদারতার পরিচয় দানে অহল্যা বাই তাহা-দিগকে বলিলেন, "আমার অর্থের অনাটন নাই। তোমরা এ অর্থে অতিথিশালা সংস্থাপন কিম্বা জলশূন্য গ্রামে জলাশয় খনন করিয়া সাধারণের উপকারে ব্যয়িত করিও।" পরে উক্ত বিধবাদ্বয় তাহাই করিল। অহল্যা বাইএর পরামর্শানুযায়ী দরিদ্রের জন্য জলাশয় খনন এবং অন্নাদিদানে সেই সকল অর্থ ব্যয়িত হইল।

অন্যের জীবনের প্রতি অহল্যা বাইএর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পর্য্যন্তও অহল্যার দয়ার পাত্র ছিল। জীবের জীবন বিনাশ অহল্যা দেখিতে পারিতেন না। বিশেষ অপরাধী নহিলে অহল্যা বাইএর রাজ্যে দোষীর জীবন-দণ্ড হইত না। জলকষ্টে জীবের জীবন বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায়, অন্নকষ্টে দরিদ্রের অনাহার-মৃত্যুর ভয়ে, প্রচণ্ড পার্ব্বতীয় নীহারে জন্তুদের নীহারীকৃত হইবার প্রতিবন্ধক-

তায় অহল্যা বাই রাজ্যমধ্যে জলাশয়-খনন, অন্নছত্র ও অনাথে শীতবস্ত্র দানের নিয়ম করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি প্রাণিগণের পালন জন্যও অহল্যা বাই অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ধর্ম্মভীরু বৌদ্ধগণই "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" বলিয়া জানিতেন। শুনিয়াছি, তাঁহারাই ক্ষুদ্র প্রাণী কীট-পতঙ্গের আহারার্থে শারীরিক রক্ত দানেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর অহল্যা বাইও পশু-পক্ষি-কীট্যাদির আহারদানে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পশু-পক্ষীর জীবিকার জন্য স্বতন্ত্র ক্ষেত্র সমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষিক্ষেত্রের অন্তরে "পশুপক্ষীর চারণ-ক্ষেত্র" নামে প্রায়ই প্রতি গ্রামে অহল্যা রাণী জমী ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতে "চারণ-ক্ষেত্রের" অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চারণক্ষেত্রের অভাবে দুগ্ধাদির অভাব হয়, আহারাভাবে মৃতপ্রায় গোগণের দ্বারাও কৃষিকার্য্যের সম্যক্ সুবিধা হয় না।

মহারাষ্ট্রীয়দেশে দস্যুবৃত্তির সমধিক প্রাধান্য ছিল। যাহার কারণ সমগ্র ভারত কাঁপিত—বঙ্গদেশ যাহার আশঙ্কায় সর্ব্বদা ত্রস্ত এবং ভীত ছিল; সুন্দরী বঙ্গাঙ্গনাগণের সুন্দর বরণ যাহাদের সমরে কালীর অঙ্কনে অঙ্কিত রাখিতে হইত; সেই দুরন্ত বর্গীগণ এই মহারাষ্ট্রদেশ-সম্ভূত। সুতরাং অহল্যা বাইএর রাজ্যে আর দস্যুভয় হইবে না কেন? নারী শাসনকর্ত্রী দেখিয়া পার্ব্বতীয় দস্যুগণ অহল্যা-রাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিল। অলক্ষ্যে রাজ্যমধ্যে দস্যুবৃত্তি সংসাধিত হইতে লাগিল। যাঁহার প্রতাপে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যগিরি হইতে মালবদেশ পর্য্যন্ত কাঁপিত, যাঁহার রাজ্য-শাসনের সুশৃঙ্খলার অনুকরণ বিভিন্ন জনপদের রাজন্যবর্গ

কর্ত্তৃক গৃহীত হইত, 'যিনি' বাহুবলে অদ্বিতীয়া, বীরত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যমধ্যে দস্যুবৃত্তি কি ভয়ঙ্কর কথা! দস্যুবৃত্তির নিবৃত্তিপক্ষে অচিরে অহল্যার লক্ষ্য হইল। তিনি গ্রামে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তাহার সমস্ত কার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। শান্তিরক্ষকগণের কার্য্যে অমনোযোগিতা দেখিলে তিনি তাহাদের যথেষ্ট শাস্তি প্রদানের বিধান করিতেন; সুতরাং সুনিয়মের গুণে অচিরে অহল্যা রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল। বিপ্লবময় রাজ্য দেখিতে দেখিতে প্রশান্ত আকার ধারণ করিল।

অহল্যা বাই চাটুকারিতার বশীবর্ত্তী ছিলেন না—অন্যায় প্রশংসা করিলে, তিনি তাহাতে প্রশ্রয় দিতেন না। জগতের কয়জন লোক প্রশংসার ভিখারী নহেন? পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিলে প্রায় সকল চরিত্রেই প্রশংসার সম্যক্ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। কিন্তু অহল্যা-চরিত্র প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত। সে চরিত্র স্তাবক বাক্যে তুষ্ট হইত না—প্রশংসা তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিমুখ করিতে পারিত না। কথিত আছে, এক ব্যক্তি অহল্যাচরিত্রের অযথা প্রশংসার বর্ণনে একখানি পুস্তক রচনা করেন। অহল্যা ঐ পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাহাতে আপনার অযথা গৌরব-গরিমার সমাবেশ দেখিয়া বড় ক্ষুব্ধ হন। এবং উক্ত গ্রন্থকারকে কিছু সুশিক্ষা দান জন্য বলেন যে, "গ্রন্থকারের হৃদয় স্বাধীনতাময় হওয়া কর্ত্তব্য। অনর্থক প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে।" তদনন্তর ঐ পুস্তকখানি জলে নিক্ষেপ করিয়া অহল্যা আপনার নিঃস্বার্থপরতা ও মহৎ-হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করেন।

অহল্যাকে অনেকগুলি কঠোর শোক প্রাপ্ত হইতে হয়। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রাণপতির বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা; তৎপরে বর্ষমধ্যে শ্বশুর মলহর রাওএর মৃত্যু ও অন্ধের যষ্টিস্বরূপ পুত্র মালি রাওএর শোক, অহল্যাকে বড়ই ব্যথা দেয়। অহল্যা-জীবন বিড়ম্বনাময় করিয়া তুলে। কিন্তু তখন অহল্যা বাইএর একটি কন্যা বর্ত্তমান ছিল। অহল্যা কেবলমাত্র সেই কন্যার মুখ-কমল দর্শন করিয়া কঠোর কর্ত্তব্যের সেবায় সকল শোক ভুলিয়াছিলেন। তাঁহার সকল যন্ত্রণা কন্যার স্নেহে অবসান প্রাপ্ত হইয়াছিল। অহল্যার কন্যার নাম মুক্তা। যশবন্ত রাও নামক এক ব্যক্তির সহিত মুক্তা পরিণীতা হন। অহল্যা বাই যশবন্তকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। পুত্র মালি রাওএর মৃত্যুর পর জামাতা এবং কন্যা পাইয়া অহল্যা বাই সম্ভবতঃ সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহার সে সুখলতাও ছিন্ন হইল। অহল্যার অন্তিম জীবন কালের কঠোর পীড়নে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় যশবন্তের মৃত্যু হইলে, মুক্তা স্বামিসহ জলন্ত চিতায় সহমৃতা হইলেন। অহল্যার অবলম্বন-যষ্টি ভগ্ন হইয়া গেল। এই শেষ শোক পাইবার অল্পদিন পরেই অহল্যার মৃত্যু হয়। সুতরাং মৃত্যুর কারণ, গভীর শোকের কঠোর দংশন ভিন্ন আর কিছু নহে।

সুপবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্মে অহল্যা বাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তিনি দেবদেবীর পূজায় সতত মনোযোগী ছিলেন। অহল্যা বাই কয়েক দণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া হরির মধুর নাম জপ করিতেন। পরে

বেলা হইলে তিনি হিন্দুবিধানক্রমে আহ্নিকাদিতে নিযুক্ত হইতেন। অহল্যা বাই রাজ্যমধ্যে বিস্তর দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল তীর্থ-স্থানেই অহল্যা রাণীর নির্ম্মিত দেবমন্দির অধুনাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গয়াধামে "বিষ্ণুপদ" নামে অহল্যা বাই যে প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা অদ্যাবধি অহল্যা-জীবনের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। ঐ মন্দিরের কারুকার্য্য অতীব প্রশংসনীয়; তাহা ভারতীয় ভাস্করগণের গৌরবের সামগ্রী। ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া সত্যের সুন্দর মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিবেন, অহল্যার এই মনোভাব ছিল। তাই তিনি ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করিতেন—হিন্দুর হিন্দুত্ব সংরক্ষণে সুমহৎ চেষ্টা পাইতেন। তাই তিনি ইন্দোর নগরে কত দেবালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। হিন্দুজীবনের আরাধ্য বিগ্রহমূর্ত্তি দ্বারা ইন্দোরনগরী পরিশোভিত করিয়াছিলেন।

অহল্যা বাই বিদ্যাবতী ছিলেন। সুমহৎ রাজকার্য্যের পরিচালনার পর অবসরক্রমে তিনি স্বকীয় অধ্যবসায়ে লেখা পড়া শিক্ষা করিতেন। অহল্যা বাইএর, সমগ্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মজ্ঞান, রাজনৈতিক পুস্তক পাঠে রাজনীতিতে সমূহ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল। সমস্ত রাজকীয় হিসাবপত্রাদি তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

অহল্যা বাইএর পরিধেয় পরিচ্ছদ রাজপরিচ্ছদের ন্যায় চাকচিক্যশালী ছিল না। তিনি সামান্য ও স্বল্প মূল্যের বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন। পরিধেয় বস্ত্রের চাকচিক্যতা সংরক্ষণ জন্য কোন রাজকর্ম্মচারী কোন কথা উত্থাপন করিলে অহল্যা

রাণী বলিতেন, "আমার গরিব ভাই ভগ্নীগণ অনশনে মরিবে, বস্ত্র বিনা বৃক্ষ-ত্বক্ বা মৃগ-চর্ম্ম পরিধান করিবে, আর আমি কিনা বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইব? একি হইতে পারে? ঈশ্বর আমার হস্তে ধন দিয়াছেন, আমি যদি তাহা আমার ভাইভগ্নীদিগকে না দিয়া স্বয়ং অপব্যয় করি, তাহা হইলে পিতা আমায় কি বলিবেন? তাহা হইলে আমার স্থান যে নরকেও হইবে না।" কি নিঃস্বার্থপরতা! ভ্রমান্ধ মানব একবার অহল্যার মনুষ্যত্ব দেখ! ধনিন্! ধনের ব্যবহার শিক্ষা কর।

কঠিন শোকের কঠোর যন্ত্রণায় অহল্যা বাই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে (১২০২ সালে) দিব্যধামে গমন করেন। রাজ্যশাসনে, ধর্ম্মার্জনে, দানধ্যানে, বিদ্যানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিয়া, তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে স্বর্গীয় পিতার নিকট গমন করেন। অহল্যা বাইএর মৃত্যুতে হুলকার রাজ্য কাঁদিয়াছে—আজিও কাঁদিতেছে! পালনকর্ত্রী, জননী বিহনে শোকধ্বনি করিতেছে!

অহল্যা বাই অতি সৌন্দর্য্যশালিনী কিম্বা অতি কুৎসিতা রমণী ছিলেন না। তিনি মধ্যমাকৃতির নারী মধ্যে গণ্যা। দৈহিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অহল্যার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অধিক ছিল। যে সৌন্দর্য্যে সীতা, যে সৌন্দর্য্যে সাবিত্রী, অহল্যাও সেই সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা ছিলেন। নারীর যে সৌন্দর্য্য আবশ্যক, মনুষ্যের যে সৌন্দর্য্যে মনুষ্যত্ব, অহল্যাতে তদপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্য ছিল। পার্থিব নয়নের ন্যায় তাঁহার নয়ন অদৃশ্য দর্শন করিতে পারিত না, পার্থিব কর্ণের ন্যায় তাঁহার শ্রবণ গীতবাদ্যে পরিতুষ্ট হইত না, সুখাদ্যে তাঁহার রসনার তৃপ্তিসাধন হইত না, বা তাঁহার ত্বক পাপকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিত না।

তাঁহার মুখজ্যোতি স্বর্গীয় দীপ্তি বিকাশ করিত, নয়নযুগলে দৈব ভাতির প্রকাশ পাইত। ঈশ্বরের পবিত্র নামে অহল্যার কর্ণের তৃপ্তি, হরিগুণ গানে তাঁহার রসনার সার্থকতা, এবং দীনে দানে তাঁহার হস্তের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল।

অহল্যা জানিতেন, দিনের কার্য্য দিনেই সমাপন করিতে হয়। দিন গত হইলে আর পাওয়া যাইবে না। অহল্যা এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন। তাই তাঁহার দিনে অবসর ছিল না। কেবল কার্য্য—কার্য্য লইয়াই অহল্যা সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন। কেবল পরিশ্রম—পরিশ্রম করিয়াই তিনি কাল অনলসে কাটাইতেন।

সুকঠিন পরিশ্রমই উন্নতির মূল, মহত্বের লক্ষণ। এই দারিদ্র-দুঃখ-পরিপূর্ণ জগতে যদি কেহ কখনও মহৎ হইবার বাসনা করেন, আপনার পতিত জীবনের উন্নতিসাধনে সচেষ্টিত হন, তবে আন্তরিক যত্নসহ পরিশ্রম করুন। অহল্যা বাই এই পরিশ্রমের গুণেই আপনার প্রকৃতি উন্নত করিয়াছিলেন। নিবিড় জঙ্গল-পরিপূর্ণ, হিংস্র-জন্তু-পরিবেষ্টিত সেই পতিত ইন্দোর নগরীকে সুরম্য স্বর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। আকুল প্রজাকুলের পথকষ্ট, জলকষ্ট, অন্নকষ্ট দূর করিয়া দিয়া, নগরী সৌন্দর্য্যের আবাস-ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর বলিব কি! তিনি আপনি জগতের নিকট দেবীনামে আখ্যাত হইয়াছেন। ঐ দেখ, মালবপ্রদেশবাসীরা এখনও তাঁহাকে দেবী বলিয়া উপাসনা করিতেছে! রাজ্যশাসনের সুশৃঙ্খলা রক্ষা হেতু রামচন্দ্র দেব—সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠিরও দেব।

অহল্যা বাই ত্রিংশ বর্ষকাল সুন্দররূপে সুশৃঙ্খলাসহ রাজ্য-শাসন করিয়া ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে কাল-কবলে নিপতিত হন। মৃত্যুর পর হুলকার রাজ্য তুকাজির বংশের শাসনাধীন হয়। অহল্যা বাই আজ জগতে নাই! তিনি আজ স্বর্গে স্বর্গীয় পিতার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছেন! দীন দুঃখীর পালনকর্ত্রী, অসহায়ের সহায়, শান্তির নিকেতন, সেই অহল্যা বাইকে আজি আর আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কেবল তাঁহার বিনির্ম্মিত সেই সুদূরবিস্তৃত রাজপথ, সেই সুরম্য অট্টালিকা-অভ্যন্তরীণ বিগ্রহ মূর্ত্তি, দুরন্ত মরুভূমি মধ্যে সুপ্রশান্ত সুখসেব্য জল-পরিপূর্ণ সেই জলাশয় আজিও জগতের সম্মুখে তাঁহার মহজ্জীবনের পরিচয় দিতেছে। মহতের পূজা যদি কেহ করিতে বাসনা কর, মহতের মহৎ দৃষ্টান্ত লইতে যদি কাহারও আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে জগৎ একবার নয়ন মেলিয়া অহল্যা বাইএর প্রতি তাকাও। দেবভাববিশিষ্ট মনুষ্যত্ব তাঁহাতে আছে। দর্শনে সে জীবনে তোমাদের বাসনা জন্মিবে। তোমরা বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্টিত হইবে। কালে সে জীবন লাভ, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না—তোমরা সে জীবন লাভ করিতে পারিবে। তাই বলি, জগৎ! একবার স্থির-নেত্রে অহল্যার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

দুর্গাবতী।

আজ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। বীরবর আকবর দিল্লীর রাজ-সিংহাসনে সমাসীন। দিন দিন মোগল-শাসন ভারতে বদ্ধমূল। ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্রমে ক্ষুদ্রতম রাজ্যে যবন সম্রাটের দৃষ্টি পড়িতেছে। যবন-প্রতাপে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারি দিক বিকম্পমান। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র নগরী এখনও স্বাধীন, সে স্বগৌরবে যবন প্রতি বক্র দৃষ্টি করিয়া আপন মনে হাসিতেছে। সে হাসি পরিহাসব্যঞ্জক। তাহা যেন কখনও যবন সম্রাটকে বলিতেছে, "আপনার এই ক্ষমতা? সামান্যা রমণীও আপনার সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বাধীন! ধিক্ আপনার শৌর্য্যে!" আবার তাহা যেন কখনও ভারত সন্তানকে বলিতেছে "ছি! তোমরা তো বড় কাপুরুষ! অবলা রমণী এখনও আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া রহিয়াছে, আর তোমরা কি না কাপুরুষের ন্যায় যবন-চরণ অর্চ্চন করিতেছ? ধিক্ তোমাদের জীবনে!"

এ হাসি কাহার? এ দুর্দ্দিনে এ হাসি কে হাসিতেছে? কেন—গড়মণ্ডল। গড়মণ্ডল কোথায়? ঐ যে প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য মধ্য-ভারতে দৃশ্যমান। মনোরম প্রমোদ-কানন, সুরম্য অট্টালিকা, সুদূর বিস্তৃত সুগভীর দীর্ঘিকা ঐ যে তাহার অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে। ঐ যে প্রয়াগের (এলাহাবাদের) এক

শত ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে স্বাধীন নগরী স্বাধীনভাবে হাসিতেছে; আনন্দে স্রোতস্বিনী বীরাঙ্গনার জয়ধ্বনি করিতেছে। পাখীমুখে সদা "ধন্যা দুর্গাবতী" এই গীতি গীত হইতেছে। তরু লতা সকলেই সজীব, সকলেরই বদন হাসি ভরা; গড়মণ্ডল যেন দেখাইতেছে, যে রাজ্য স্বাধীন, তাহার সকলই স্বাধীনতা-ব্যঞ্জক।

গড়মণ্ডল রাজ্যের দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক তিন শত মাইল এবং বিস্তার প্রায় এক শত মাইল ছিল। অধুনা গড়মণ্ডল ভিন্ন ভিন্ন জনপদে বিভক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সোহাগপুর, সম্বলপুর, মণ্ডল, জব্বলপুর ও ছত্রিশগড় প্রভৃতি জনপদ সমূহ সেই পুরাতন গড়মণ্ডলের অংশমাত্র। এই সকল জনপদ, কালে গড়মণ্ডল হইতে পৃথকীকৃত হইয়া পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত গড়নগর এই গড়মণ্ডলের রাজধানী। গড়নগর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। গড়নগরের অবস্থান-স্থানের সবিশেষ নির্দ্দেশ হওয়া সুকঠিন। তবে ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান জব্বলপুরের ২॥০ ক্রোশ অন্তরে গড়নগরীর অবস্থান ছিল। এখন তাহার কোন চিহ্ন না থাকিতে পারে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আকবরের ভারত শাসনকালেও গড়নগর বীরত্বে শ্রেষ্ঠতা, শৌর্য্যের অগ্রণী ও স্বাধীনতার গৌরব-ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। গড়মণ্ডল রাজ্য একটি অবলা হিন্দু-রমণীর শাসনাধীনে থাকিয়াও জগৎকে গৌরব-গরিমা এবং মহাপ্রাণতার বিষয় শিক্ষা দিতেছিল।

কিন্তু জগতের নিয়ম, হাসিলেই কাঁদিতে হইবে। হাসি কান্না কেহই চিরস্থায়ী নহে। আজ সুখে সুখের হাসি হাসি-

নেই, কাল আবার দুঃখে দুঃখের কান্না কাঁদিতে হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। গৌরবে মিসর হাসিয়াছিল, রোমনগরী আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল, তাই আজ তাহাদের কান্না দেখিয়া জগৎকে কাঁদিতে হইতেছে। সুতরাং গড়মণ্ডল আর কত দিন হাসিবে? তাহার বিদ্রূপাত্মক হাসি বিধাতা আর কত কাল স্থায়ী করিবেন?

আসফ খাঁ আকবরের সেনাপতি। অবাধ্য নবাব ও ভূস্বামিদিগের উপদ্রব নিবারণ করিয়া, দেশে শান্তি সংস্থাপন জন্য তিনি এখন আকবর কর্ত্তৃক নর্ম্মদা প্রদেশে প্রেরিত। গড়মণ্ডলের বিদ্রূপাত্মক হাসি তাঁহার গাত্রে শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল। গড়মণ্ডলের সেই বিপুল সৌন্দর্য্যরাশি, সুরম্য অট্টালিকা-পাদদেশে মনোরম বাপীতট, সুশীতল প্রস্রবণের মৃদু মন্দ জলস্রাব তাঁহার নয়ন মন আকর্ষণ করিল। তিনি দেখিলেন যে, এত সৌন্দর্য্য, এত রত্ন একটি সামান্যা রমণীর অধিকৃত। কিন্তু তিনি আকবরের সেনাপতি হইলেও তাঁহার কিছুই নাই। তিনি সামান্য বেতনভোগী ভৃত্য বই আর কিছুই নহেন। সামান্যা দুর্গাবতী তাঁহার সম্মুখে গড়মণ্ডলের স্বাধীন-শাসনকর্ত্রী। তিনি ভাবিলেন, "সামান্যা রমণীর নিকট হইতে কলে কৌশলে গড়মণ্ডল যবন-রাজ্য-ভুক্ত করা যাউক। আকবরের রাজ্য-সীমা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাঁহার প্রিয় পাত্র হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে গড়মণ্ডলের শাসন-ভার প্রার্থনা করি। আকবর অবশ্য আমার প্রার্থনা রক্ষা করিবেন। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে চাই কি আমি—আমি না হয় আমার বংশধরগণও কালে দুর্গাবতীর ন্যায় গড়মণ্ডল স্বাধীন ভাবে শাসন করিতে পারিবে।"

কুলোদ্ভব পাত্র পাইলেই দুর্গাবতীর বিবাহ দিবেন, চন্দন এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুর্গাবতীর মত পিতার মতের সহিত মিলিল না। সমগ্র জীবন যাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিবে, যাঁহার অস্তিত্বে তাঁহার অস্তিত্ব—বিলোপে বিলোপ সংসাধিত হইবে, যিনি গৌরব রক্ষা করিতে পারিলে গৌরব থাকিবে, না পারিলে সকলই জলধি-জলে নিক্ষিপ্ত হইবে; সে হেন গুরু-ভার-বহনকারী উপযুক্ত-পতি-লাভে দুর্গাবতী কাহারও মুখাপেক্ষী হইলেন না। পিতা কাপুরুষের সহিত বিবাহিতা করিতে সমুৎসুক দেখিয়া দুর্গাবতী পিতৃমতের পরিপোষকতা করিলেন না। পাঠক! পাঠিকে! শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, দুর্গাবতী স্বয়ংই পরিণয়-কার্য্যের স্থির করিলেন। চন্দনের অনভিমতি সত্ত্বেও ভট্টিবংশীয় * দলপৎ সার সহিত দুর্গাবতীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে (৯৫২ সালে) দুর্গাবতী পরিণীতা হন।

দুর্গাবতীর পরিণয় কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত হয় নাই। তাহাতে বিষম বিপ্লব ঘটিয়াছিল। আনন্দের কার্য্যে গভীর শোকের সমুত্থান হইয়াছিল—বিবাহ-বাসর সুসজ্জিত খট্টাঙ্গ, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, বা আলোকমালার পরিবর্ত্তে কত শত মানব-রক্তে অলক্ত-রঞ্জিত হইয়াছিল। সুমধুর বিবাহ-বাদ্যের পরিবর্ত্তে বিবাহক্ষেত্রে ক্রোধোদ্দীপক রণবাদ্য বাজিয়াছিল; কমনীয়তার পরিবর্ত্তে দৃঢ়তর সমাবেশ, স্নেহের স্থলে ক্রোধের কার্য্য, বন্ধুতার বিপর্য্যয়ে শত্রুতা অনিবার্য্য হইয়াছিল। শুনিয়াছি, পরিণয়-

* এই ভট্টি বংশ যদু রায়ের বংশ বলিয়া উল্লিখিত আছে।

প্রয়াসী শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে এক দিন বীরসাজে সাজিয়াছিলেন; কনকবরণী রাজনন্দিনী রুক্মিণীহরণে যুদ্ধার্থী হইয়াছিলেন। সে দিনের কার্য্য আর দুর্গাবতীর পরিণয়কার্য্য একই রূপ। তাহাতে যে বৃক্ষে যে ফল ফলিয়াছিল, দুর্গাবতীর পরিণয়েও সেই বৃক্ষে সেই ফল ফলিয়াছিল। জামাতা দলপৎ চন্দনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন; কঠোর রণে, বীর্য্যপ্রদর্শনে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া দুর্গাবতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্গাবতীর উদ্বেল হৃদয়ের প্রশান্ততা এই ভয়াবহ কাণ্ডের অভিনয়ে সংস্থাপিত হইযাছিল।

দলপৎ সা পূর্ব্বকথিত গড়মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা—স্বাধীন রাজা। তিনি ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে (৯৩৭ সালে) গড়মণ্ডলের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজ্য প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পরে দুর্গাবতীসহ দলপৎ পরিণয়সূত্রে গ্রথিত হন। কিন্তু বিবাহের পর অধিক কাল দলপৎ রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। বিবাহের চারি বৎসর পরে ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে দলপৎ সার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বীরনারায়ণ নামে তাঁহার একটি তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র ছিল। পতির পরলোকান্তে পুত্রের অপ্রাপ্ত-বয়স পর্য্যন্ত দুর্গাবতী গড়মণ্ডল শাসনে ব্যাপৃত হন।

দুর্গাবতী এখন গড়মণ্ডলের শাসনকর্ত্রী। তিনি এখন বিধবা—এখন তাঁহার পতি দলপৎ সা পরলোক-গত! রাজ-সংসার এখন মরুভূমি প্রায়। মরু মধ্যস্থ ওয়েসিসের* ন্যায় দুর্গাবতীর এক পুত্র বর্ত্তমান। পুত্রের নাম বীরনারায়ণ। বীরনারায়ণই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার নৈরাশ্যের

* মরুভূমির মধ্যবর্ত্তী উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডকে ওয়েসিস্ কহে।

আশা—শ্রান্তি কালের শান্তিদাতা বীরনারায়ণ না থাকিলে দুর্গাবতীর পক্ষে সংসার ও অরণ্য সমান। তাহা হইলে এত দিন কোন্ কালে গড়মণ্ডল যবন-রাজ্যভুক্ত হইয়া যাইত। কিন্তু বিধাতার লিখনক্রমেই হউক, কিম্বা গড়মণ্ডলের অদৃষ্টানুযায়ীই হউক, দুর্গাবতী পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই আজিও গড়মণ্ডল স্বাধীন।

দুর্গাবতীর রাজ্য-শাসন-প্রণালী বড়ই বিশুদ্ধ। তিনি অন্তের ক্রন্দনে কাঁদিতেন, অন্যের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। প্রজার কিসে সুখ বৃদ্ধি হয়, কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রজা-কুল নির্ব্বিঘ্নে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এই তাঁহার লক্ষ্য হইল। তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির পরই প্রজার সুখের জন্ত ব্যস্ত হইলেন। প্রজার সুখের কারণ অরণ্যানী-পরিবৃত গড়-মণ্ডলের অরণ্যাদি কর্ত্তন করিয়া স্থানে স্থানে সুপ্রশস্ত রাজ-পথ প্রস্তুত—জলাশয় খনন প্রভৃতি কার্য্যে দুর্গাবতী সমূহ যত্নবতী হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি স্বয়ং রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসিতেন। পরিদর্শনকালে যে গ্রামে যে দ্রব্যের অভাব দেখিতেন, পরে সেই সকল অভাব পূরণের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। জব্বলপুরের নিকটস্থ জল-শূন্য স্থানে আজিও দুর্গাবতী-বিনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর জলাশয়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক কথায় রাজ্যের সকলে দুর্গাবতীকে মা বলিয়া জানিত, আর তিনিও সকলকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ সহকারে পালন করিতেন। রাজ্যমধ্যে সম্পূর্ণরূপে সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণেও দুর্গাবতী সমূহ যত্নবতী ছিলেন। "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" এই ভাবিয়া সতত তিনি চিন্তিত থাকিতেন, যশো-

গৌরব বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় আপনার ইচ্ছানুযায়ীও দুর্গাবতী রাজ্যের সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে সাহসী হইতেন না। কার্য্যের কাঠিন্য দেখিলে—উপসংহারে, নারীবুদ্ধির বিচারে দ্বিধা জন্মিলে, দুর্গাবতী অন্যের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার পরামর্শের পাত্র অধর নামে এক ব্যক্তিই প্রধান ছিল। অধরের বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দর্শনে দুর্গাবতী তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিয়া, প্রধানতঃ তাঁহারই নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

দুর্গাবতীতে এক দিকে যেমন কামিনীর কমনীয়তা অন্য দিকে তেমনই পুরুষোচিত ওজস্বিতা বর্ত্তমান ছিল। এক দিকে যেমন তিনি দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে বিভূষিতা ছিলেন, অন্য দিকে তিনি তদ্রূপই রণক্ষেত্রে—শত্রুসংহারে বীর্য্যপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এক দিকে যেমন তিনি প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন, অন্য দিকে তেমনই তিনি শত্রুর প্রতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। এক দিকে যেমন দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া—দরিদ্রকে অন্নাভাবে শীর্ণকায়, বস্ত্রাভাবে কৌপিনধারী দেখিয়া ভক্তি-বারিতে তাঁহার হৃদয় মন ভাসিয়া যাইত—প্রাণ সতত তাহাদের কষ্ট নিবারণে প্রধাবিত হইত; অন্য দিকে তাঁহার নয়নযুগল হইতে ক্রোধাগ্নি নিঃসৃত হইয়া তাহা আততায়ীর হনন সাধন করিত। তাঁহার তেজস্বিতা ঘোর রণে, অরিদলনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত।

আজ ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ। দুরন্ত আসফ খাঁ গড়মণ্ডল আক্রমণ করিয়াছে। সে আজ রাজ্য লুণ্ঠনে ব্যাপৃত—হিন্দুরাজ্যের উৎপাদনে নিযুক্ত! হতাশাসমনে, ভয়বিচলিত নয়নে গড়মণ্ডল-

বাসীরা দুর্গাবতীর শরণাপন্ন। "বিষম বিভ্রাট! সতীর সতীত্ব রক্ষা হয় না—ধনীর ধন যায়—মানীর মান থাকে না। মা! আপনি রক্ষা করুন" বলিয়া সমগ্র গড়মণ্ডলবাসী দুর্গাবতীর শরণ লইয়াছে। গড়মণ্ডলবাসী সকলেই শক্তিহীন—নিস্পন্দপ্রায়—যবনোপদ্রবে রোরুদ্যমান। কিন্তু দুর্গাবতী ভীতা হইলেন না—স্বয়ং প্রচণ্ড হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া শাণিত অসি হস্তে যবনের সম্মুখীন হইতে সমুদ্যত হইলেন। আকুল প্রজাকুলের আকুলতা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকেও রণরঙ্গে মত্ত করিলেন। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রপ্রভাবে নির্জ্জীব, নিস্পন্দ প্রজাকুল জাগিয়া উঠিল। মাতার সহযোগিতায়, দেশের সংরক্ষণে সকল প্রাণ একপ্রাণ হইয়া যবন বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল।

বিপুল সাহসে অদম্য উদ্যমে সকলে যবন-আক্রমণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। অশ্বারোহী আট সহস্র ও হস্তিপৃষ্ঠে দেড় সহস্র এবং বহুসংখ্যক পদাতি প্রজাসৈন্য দুর্গাবতীর সহায়তা অবলম্বন করিল। পুত্র বীরনারায়ণও নিশ্চিন্ত রহিলেন না। জননীর সাহায্যার্থে দেশের উদ্ধারকল্পে তিনিও রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। মাতা-পুত্রের যুদ্ধে যবনেরা পরাজিত হইল। আসফ খাঁ সৈন্যসহ পলায়ন করিলেন। রাজ্য জয় করিতে আসিয়া স্বয়ং পরাজিত হইলেন। এই প্রথম দিনের যুদ্ধ—এই সে যুদ্ধের ফল।

পরাজিত যবনেরা কিন্তু গড়মণ্ডল জয়ে নিশ্চেষ্ট হইলেন না। আবার গড়মণ্ডল আক্রমণ তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। আবার তাঁহারা বহুসংখ্যক সৈন্যসহ গড়মণ্ডল জয়ে প্রধাবিত হইলেন। দ্বিতীয় বার গড়মণ্ডলে হিন্দু-যবনে যুদ্ধারম্ভ হইল। এবারও দুর্গা-

বতীর সৈন্যবল পূর্ব্ববৎ বলবৎ রহিল। যবনসৈন্য তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিল না। বরং এবার ছয় শত অশ্বারোহী যবনসৈন্য রমণীরণে প্রাণ হারাইল। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা যবনসৈন্য এবার অধিক হতাশ্বাস হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও হিন্দু-ললনার এইরূপ লোকাতীত ক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা রণে আকবর হেন সম্রাটের সৈন্য-দলকেও তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। সাহসে নির্ভর করিয়া প্রাণপণে অরিদলনে প্রবৃত্ত হইতেন।

রণ-ক্লান্ত হিন্দু-সৈন্যের বিশ্রাম-বাসনা জন্মিল। "আর কি! যবন আর আসিবে না" এই ভাবিয়া তাহারা দলভঙ্গ হইল। দুর্গাবতীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৈন্যদল বিশ্রাম লইতে চলিল। তাহারা এক বার ভ্রমেও ভাবিল না যে, সম্মুখে তাহা-দের চিরবিশ্রাম বর্ত্তমান—ক্ষণ পরে তাহাদিগকে চিরবিশ্রাম লইতে হইবে। এই রূপ দলভঙ্গ কারণেই, হিন্দুর আজ এই দুর্দ্দশা, হিন্দু জাতি আজ নিতান্ত হেয়!

আসফ খাঁ বড় চতুর। কূট যুদ্ধনীতির কুটিলতায় তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। বংশের দৃষ্টান্ত সমূহ তিনি মনে মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি স্মরণ রাখিয়াছিলেন যে, গুপ্ত চর প্রেরণে তাঁহারই পূর্ব্ব পুরুষগণ ভারতের অভিজ্ঞতা জানিয়া ভারত জয় করিয়াছেন। গুপ্তচরের মুখে গুপ্ত গৃহ-বিচ্ছেদের কথা শুনিয়া বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ জিত হয়। সুতরাং দুই বার পরাজিত হইয়া দুরন্ত আসফ খাঁ এবার গড়মণ্ডলের আভ্যন্তরিক বার্ত্তার অনুসরণে গুপ্তচর প্রেরণ করি-লেন। স্বাধীনচেতা গড়মণ্ডলের বুদ্ধির অগম্যে গড়মণ্ডলের

অবস্থা গুপ্তচর কর্ত্তৃক আসফ খাঁ সমীপে ত্বরায় নীত হইল। আসফ খাঁ অচিরে গুপ্তচর কর্ত্তৃক হিন্দু-সৈন্যের দলভঙ্গ সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। দুই বারের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর এইবার তিনি সফলমনোরথ হইবার সুযোগ পাইলেন। এবার তাঁহার হৃদয়ের সাহস ও বল পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইল। তিনি আবার সোৎসাহে—সগর্ব্বে গড়মণ্ডল আক্রমণ করিলেন।

গড়মণ্ডল তৃতীয় বার অবরোধিত। এবার তাহার শুভগ্রহ নহে। এবার সে অরিদমনে নিশ্চেষ্ট। গড়মণ্ডলবাসিগণ এবার বিশ্রাম লইতেছেন। সুতরাং গড়মণ্ডলের এ অধঃপতন আর কে নিবারণ করিতে পারিবে? কিন্তু দুর্গাবতী এখনও জীবিত। তাঁহার অটল-হৃদয় কিছুতেই টলিল না—তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার বীর পুত্র বীরনারায়ণ আর সামান্যমাত্র হিন্দু-সৈন্য সহায় হইল। কিন্তু তাহাতে আর কি হইতে পারে? অগণ্য যবন সহসা বীরনারায়ণকে আক্রমণ করিল। অস্ত্রাঘাতে বীরনারায়ণ হতচেতন হইয়া পড়িলেন। আসফ খাঁ সৈন্যসহ অটলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবার আর তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। আসফ খাঁ! ধন্য তোমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! তুমি দুইবার পরাজিত, কিন্তু এখনও তোমার গড়মণ্ডল জয়ের বাসনা অন্তর্হিত হয় নাই। "গড়মণ্ডল জয় করিব" এখনও তোমার এই বাসনা। এখনও তুমি এক মন্ত্রের উপাসক। তোমার এত অধ্যবসায়, এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ফল কেন না ফলিবে? জগতে সকল কার্য্যেরই কর্ম্মফল আছে। তবে তোমার বাসনার সফলতা না হইবে কেন? সহস্র পীড়নে প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার বাসনা

মিটিয়াছিল। বালক ধ্রুব ধ্রুব-বিশ্বাসের উপর হরিকে ডাকিয়াছিলেন, তাই হরি তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। আসফ খাঁ! এত অধ্যবসায়ে, এত কষ্টের পরও তোমার এ সামান্য বাসনা পূর্ণ না হইবে কেন?

বীরনারায়ণ এখন চৈতন্যশূন্য, মৃতপ্রায় দুর্গাবতী কি করিবেন? পুত্র লইয়া কি রণস্থল হইতে পলায়ন করিবেন, না স্বচক্ষে রণস্থলে পুত্রের মৃত্যু দেখিবেন? দুর্গাবতী দেখিলেন, এস্থলে পুত্রের মৃত্যু দর্শনও বরং শ্রেয়ঃ, কিন্তু রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহা হইলে একটি পুত্রের মায়ায় তাঁহার শত শত পুত্রকে কাল-যবনের কঠিন পীড়নে মরিতে হইবে। তিনি রণস্থল হইতে পলায়ন করিলে শত শত যবন রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাবৃন্দকে তৃণের ন্যায় ভস্ম করিবে। সুতরাং দুর্গাবতী পুত্রমায়ায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন না। এক পুত্রের মায়ায় তিনি জীবিতা থাকিয়া শত পুত্রের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে পারিলেন না। এক বীরনারায়ণকে বাঁচাইতে গিয়া পুত্রবৎসলা জননী তাঁহার শতসহস্র প্রজাপুত্রের ক্রন্দন শুনিতে পারিলেন না। তাহা পারিবেন কেন? স্নেহময়ী জননীর নিকট কি আর পুত্র-স্নেহের তারতম্য হইয়া থাকে? দুর্গাবতী সকলকেই পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, বীরনারায়ণের ন্যায় রাজ্যের সকলেই তাঁহার পুত্র ছিল। সুতরাং তিনি কেমন করিয়া পুত্রপ্রতি পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করিবেন? তাহা তো জননীর কার্য্য নহে! তিনি বীরনারায়ণের অনুসরণ করিলেন না। "হয় স্বয়ং মরিব, না হয় যবন মারিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞায় তিনি অটল ভাবে রণস্থলে দণ্ডায়মান

রহিলেন। পুত্রের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী দেখিয়াও সে দিকে তাকাইলেন না।

কিন্তু আজ গড়মণ্ডলের শুভগ্রহ নহে। গড়মণ্ডলের অদৃষ্ট ভঙ্গপ্রায়—শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। চতুর আসফ খাঁর চতুরতায় আজ হাস্যময়ী গড়নগরীর বদনে ক্রন্দন দেখা দিবে! গড়মণ্ডলে মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল। হিন্দু-যবনের রক্ত-প্রবাহে গড়মণ্ডল প্লাবিত প্রায়। সহসা শাণিত যবনশরে দুর্গাবতীর বাম চক্ষু বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতীর সহযোগী সৈন্যদলও ক্রমে বীর-শয্যায় শয়ন করিল। কিন্তু দুর্গাবতী তখনও নিবস্ত হইলেন না। তিনি চক্ষু-বিদ্ধ-বাণ বাহির করিতে সচেষ্টিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। শর চক্ষু ত্যাগ করিল না।

চক্ষু-সংলগ্ন শর নিঃসারিত হইল না বটে; সৈন্যবল নির্ম্মূল হইয়াছে সত্য; মৃতপ্রায় পুত্রের অদর্শন কঠোর যন্ত্রণাদায়ক হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু তথাপি দুর্গাবতীর মন বিচলিত হইল না। দুর্দ্দশার চরম সীমা প্রাপ্তা দুর্গাবতী তখনও যবন-দলনে নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। অন্তিমেও তাঁহার বিপুল বীর্য্য-শক্তির হ্রাস পাইল না। আসন্নাবস্থা প্রাপ্তা অসহায়া দুর্গাবতী লক্ষ্য ভুলিলেন না। চক্ষুবিদ্ধ হইয়াও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আসন্নকালের শরবীর্য্যও যবন-মুণ্ড ভূমিশায়ী করিতে লাগিল। ঐতিহাসিক কহিয়াছেন যে, মৃত্যুর অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেও দুর্গাবতী-শরে অসংখ্য যবন হতচেতন হইয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু সকলই ক্ষণস্থায়ী। দেখিতে দেখিতে সকলই বিফল হইল। প্রবল সিন্ধুজলে জলন্ত অনল নিভিয়া গেল। যবনশরে

দুর্গাবতীর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল। দুর্গাবতী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জগৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। দুর্গাবতী দেখিলেন, আর জীবনের আশা নাই। মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। হিন্দুনারী অন্তিম জীবনে অস্পর্শ্য যবনের স্পর্শিত হইতে কুণ্ঠিত হইলেন। "জীবনদানেও গড়মণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারিলাম না" বলিয়া মস্তকে করাঘাত করিলেন। এই দুর্গাবতী-জীবনের অন্তিম বাণী। অন্তিম বাণী অর্দ্ধোচ্চারিত হইতে হইতে স্বহস্তস্থিত শাণিত তরবারির আঘাতে ার্ব্বসম্মুখে দুর্গাবতী অন্তিম জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। আপনার াবনা না ভাবিয়া, দেশের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ীবন-বায়ুব অবসান হইল। প্রবল সাগর-তরঙ্গে পর্ব্বত চূর্ণবচূর্ণিত হইল—বীচিমালায় দেশ প্লাবিত হইল।

কথিত আছে দুর্গাবতীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার তদেহ যবনের স্পর্শিত হইবার আশঙ্কায়, তাঁহার কোন বিশ্বস্ত নুচর কর্তৃক যবনের অদৃশ্য ভাবে স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার াহত দেহ তথা হইতে চৌরগড় নামক দুর্গে নীত হয়। তৎপরে াার তাঁহার দেহের সৎকার্য্যাদি যবনের অজ্ঞাতে সম্পন্ন হয়।

১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ (৯৫৬ সাল) হইতে সুমহৎ রাজ্যশাসন ার্য্য প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ণ পঞ্চদশবর্ষ কাল অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপন করিয়া, ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে (৯৭১ সালে) দুর্গাবতীর জীবনীত অনন্ত সময়-স্রোতে বিলীন হইয়া যায়। তাঁহার জীবন গ্রস্ত হইয়া বিলুপ্ত হয় নাই, বার্দ্ধক্যে সে জীবনের বিনাশন হয় নাই, কঠোর শোকের কঠিন পীড়নেও তাহার াাপ হয় নাই—সে জীবন মহত্বে, দেবত্বে, অবশেষে

পুণ্যাত্মার ন্যায়, বীরের ন্যায় বীরত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে জীবন আত্মীয় স্বজন, ভাই বন্ধুর পরিবর্ত্তে, প্রচণ্ড শত্রুদল-পরিবেষ্টিত হইয়া, অন্তিমে হরির মধুর নামের পরিবর্ত্তে "গড়মণ্ডল রক্ষা করিতে পারিলাম না" এই বলিতে বলিতে মর্ত্ত্যভূমি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

দুর্গাবতীর মৃত্যুস্থান অধুনা তীর্থ স্থানে পরিণত। তাহা গড়মণ্ডলের একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের মধ্যে অবস্থিত। সাধারণের সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, দুর্গাবতীর সহযোগী মৃত সৈন্যদল, তাহাদের রণডঙ্কা এবং অস্ত্রাদি অধুনা প্রস্তর-আকারে উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিষ্ঠান করিতেছে। অধুনা গড়মণ্ডলবাসীরা সেই গিরিসঙ্কটে আসিয়া পূর্ব্ব-কাহিনী স্মরণ করিয়া মনোদুঃখে অক্ষিবারি মোচন করিয়া থাকে। কঠোর পীড়নের উপশমার্থে দুর্গাবতীকে স্মরণ করিয়া সতত ক্রন্দন করিয়া থাকে।

অনাথিনী গড়নগরী আজ কাঁদিতেছে। তাহার হাস্যময় মুখ আজ ক্রন্দনময়। "কোথা দুর্গাবতী—মা কোথায়!" আজ গড়নগরে এই ধ্বনি। মাতৃহীন সন্তানের ক্রন্দন ভারতে নূতন নহে, কিন্তু সে ক্রন্দনের নিবৃত্তি আছে। কই এ ক্রন্দনের ত নিবৃত্তি নাই? এ ক্রন্দন কেন চিরকাল সমভাবে চলিতেছে? তাহার কারণ আছে। ভ্রান্ত মানব ভাবী ভাবনা ভাবে না। কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সতত নিশ্চিন্ত থাকে। তাহাদিগকে তাই শেষে দুর্দ্দশার একশেষ ভোগ করিতে হয়। গড়নগরীর সন্তানমণ্ডলীকে এই কারণেই এই চির-কান্না কাঁদিতে হইতেছে। গড়মণ্ডল তখন ভাবী ভাবনা ভাবে

নাই। তাহারা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুভব করিতে পারে নাই। সন্তানের জন্য দুর্গাবতী প্রাণ দিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তান প্রাণের মায়া ছাড়িতে পারে নাই। তিনি সাধারণের জন্য রণক্ষেত্রে মরিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণে তো তাঁহার সহায় হয় নাই। তাই আজ গড়নগরীর এই কান্না। সে মনোদুঃখে কাঁদিতেছে। মাতৃহীনা গড়নগরী দস্যুপীড়নে কাঁদিতেছে! কিন্তু গড়মণ্ডল কাঁদিলে কি হইবে? মাতার ভাগ্য লইতে চেষ্টা কর। শুদ্ধ ক্রন্দনে কোন ফল নাই।

বিদুলা।

প্রকৃত জননী কে? পুত্র পালন সকলে করিয়া থাকে, পুত্রের জীবনে জীবন দানও অনেকের নিকট অসম্ভব নহে— কিন্তু তন্মধ্যে প্রকৃত জননী কয় জন? পুত্রের হিত-কামনা সকলে করিয়া থাকে, পুত্র সৌভাগ্যশালী হউক—সজ্জন হউক, প্রত্যেক জননী-হৃদয়ে এ বাসনা বর্ত্তমান আছে; কিন্তু কই, কয় জন জননী সে বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবতী হন? ভাবী সুখ দুঃখ, জীবনের উন্নতি অবনতি কৌমার কাল হইতেই যাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, যাঁহার যত্নে সন্তানের মনুষ্যত্ব, অযত্নে পশুত্ব সংসাধিত হইতে পারে, এ হেন গুরুভার-প্রাপ্ত। কয় জন জননী আপনার কঠোর কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন? সতীত্বে অনেকে সাবিত্রীতুল্যা হইতে পারেন; দানে কর্ণতুল্য হওয়াও অসম্ভব নহে; বাহুবলে অদ্বিতীয়া হওয়া— বীরত্বে শ্রেষ্ঠতা-লাভ করা অনেকের ভাগ্যে ঘটিতে পারে; কিন্তু এ জগতে প্রকৃত জননী নামের বাচ্য হওয়া দুর্লভ। আলোচ্য বিদুলা এইজননী নামের বাচ্য। প্রকৃত জননীর যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, বিদুলায় তাহা সমস্তই বর্ত্তমান আছে।

বিদুলা ক্ষত্র-কুলোৎপন্না। ইতিহাসে বরণীয় শাশ্বতবংশে তাঁহার জন্ম। যে বংশ-গৌরব শত্রুর নিকট প্রাণ দিবে, কিন্তু কখন অবনতি স্বীকার করিবে না, বিদুলা সেই মহৎ-বংশ-সম্ভূতা। ভাগ্যবলে তিনি মহদ্বংশেই পরিণীতা হইয়া-

ছিলেন। বিহুলা সৌবীর-রাজ-বনিতা। সৌবীর ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রাজ্য। শত শতাব্দীর কঠোর পরিবর্ত্তনে এখন তাহার কোন চিহ্ন বর্ত্তমান না থাকা অসম্ভব নহে; কিন্তু সৌবীর রাজ্য এককালে মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল। সমগ্র ইউরোপ যখন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; প্রাচীন মিসর নগরীর যখন অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই; গ্রীক বা রোমক জাতির অভ্যুদয়ের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচীন সৌবীর নগরী গৌরব-গরিমার লীলা-ক্ষেত্র ছিল। যে ইংরাজ ঊনবিংশ শতাব্দীতে আজ ভারতের একচ্ছত্রী রাজা, সেই ইংরাজের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন বন্য জন্তুর ন্যায় বনে বনে আহারীয় পশুর অন্বেষণে ধাবিত হইত; বিদ্যার গৌরবে, পরিচ্ছদের পারিপাট্যে, বীরত্বের শ্রেষ্ঠতায় যে জাতি আজ উচ্চপদারূঢ়, সেই জাতি যখন আবাসাভাবে পর্ব্বত-গহ্বরে বাস, পরিধেয় বস্ত্রাভাবে বৃক্ষত্বক্ পরিধান করিত, এই সৌবীর তখন বিদ্যার জ্যোতিতে আলোকিত ছিল—সভ্যতার উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতে পারিয়াছিল। প্রাচীন সৌবীরের অবস্থান-স্থান সবিশেষ নির্দ্দেশ হওয়া সুকঠিন। যাঁহার পূত সলিল-প্রবাহ পুণ্যময়ী হেমগিরি-গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া, রণবীর রণজিতের রাজ্য বিধৌত করিয়া, সতত দক্ষিণাভিমুখে সিন্ধুসলিলে বিলীন হইতেছে; সৌবীর সেই পবিত্রাত্মা সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। অনুমিত হয়, রাজপুতনার নৈর্ঋত কোণে, বর্ত্তমান মারবার এবং যশল্মীর রাজ্যের দক্ষিণাংশে সৌবীর রাজ্যের অবস্থান ছিল। এখন তাহা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া কতকাংশ রাজপুতনায় ও কতকাংশ বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশে সম্মিলিত হইয়াছে। ঐতি-

হাসিক ও ভৌগোলিক পুস্তকাদি পাঠে সৌবীর সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্বের উদ্ভাবন হইতে পারে। সৌবীর কখনও কখনও সিন্ধু-সৌবীর বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। বহু পরিবর্ত্তনের পর সৌবীরকে লোকে বদরী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন রাজার শাসনকালে সৌবীর বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছিল। মিসরীয়দিগের উন্নত অবস্থার সময়ে তাহারা সৌবীরে আসিয়া বাণিজ্য করিত, মিসরীয়েরা সৌবীরের নাম ওফির রাখিয়াছিল।* যাহা হউক, ভৌগোলিক কূট তর্কের অবতারণা না করিয়া আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

প্রাচীন ভারত বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে শাশ্বত বংশ সৌবীরের শাসনকর্ত্তা। আলোচ্য সময়ে শাশ্বত বংশ পতনোন্মুখ, সৌবীররাজ পরলোক-গত, রাজ্য বিশৃঙ্খলাময়। বিদুলা পতিহীনা অনাথিনী। তাঁহার যুবক পুত্র সঞ্জয়ের হস্তে সৌবীর রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত। পিতার অবর্ত্তমানে, মাতার পরিচর্য্যার সহিত তরুণ সঞ্জয় সৌবীরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত, কিন্তু তরুণ যুবক আর রাজনীতির কি জানেন? কূট যুদ্ধনীতির অভিজ্ঞতা তাঁহার পক্ষে আর কত দূর সম্ভব? তাই আজ সৌবীর রাজ্য বিপ্লবময় হইয়াছে। প্রজাবর্গ স্ব স্ব আধি-

* সৌবীরের বিবরণ কনিংহাম-কৃত ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত এবং মোক্ষমুলার কৃত ভাষা-বিজ্ঞান (Cunningham's geography of India & MaxMuller's Science of Language. প্রভৃতি ইংরাজী পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

পত্য বিস্তারে প্রয়াস পাইতেছে। পার্ব্বতীয়গণ সৌবীর লুণ্ঠনে ব্যাপৃত। তাহারা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে অনর্থক কষ্ট প্রদান করিতেছে।

এ সময়ে পশ্চিম-ভারতে সিন্ধুরাজ্য পরিবর্দ্ধনশীল। দিন দিন সিন্ধুরাজ্যের সীমা বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সময় সৈন্ধবগণ উন্নত। সিন্ধুরাজ্য অতুল ধনসম্পত্তিপূর্ণ। তাহাদের অর্থের প্রাচুর্য্যতা, ভুজবীর্য্যের প্রাধান্য তদ্দেশীয় অন্যান্য নৃপতিগণের অপেক্ষা সমধিক প্রবল। তাহারা আর এখন শুদ্ধ সিন্ধু-রাজ্যে পরিতুষ্ট নহে। রাজ্য-সীমা বৃদ্ধি করিতে তাহারা এখন যত্নবান্। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন সীমাবৃদ্ধির সুবিধা তাহাদের এত দিন ছিল না। প্রকৃতি সিন্ধুদেশকে যেন সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার দক্ষিণভাগে প্রচণ্ড আরব সাগরের ফেণিল তরঙ্গময় জলরাশি, উত্তর ও পশ্চিমে সলেমন পর্ব্বতশ্রেণী উন্নতশিরে দ্বারীর ন্যায় দণ্ডায়মান। সে যেন সৈন্ধবগণকে পশ্চিমে যাইতে দিতে অনিচ্ছুক—সতত যেন তাহাদিগকে পশ্চিম-গমনে বাধা দিতেছে। সৈন্ধবগণের রাজ্য-সীমা বৃদ্ধি করিবার প্রায় সকল পথই কণ্টকিত, কেবল একটিমাত্র পথ বর্ত্তমানে বর্ত্তমান।—সে সৌবীররাজ্য। সৌবীররাজ্য এত দিন বীর্য্যের আবাস স্থান ছিল—শাশ্বত বংশের শাসনে তাহার পরাক্রম-স্পর্দ্ধা প্রবল ছিল; সুতরাং সৈন্ধবগণ এত দিন তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এত দিন অন্যান্য প্রতিবন্ধকের ন্যায় সেও সৈন্ধবোন্নতির প্রতিবন্ধকতা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাদের প্রাধান্য প্রসারণে বাধা দিয়া বরং স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারে সৌবীর সুমহৎ চেষ্টা

পাইতেছিল। কিন্তু কালের লীলায় সৌবীরের গতি আজ ফিরিয়াছে।

সৌবীর আজ সম্যগ্নেতাও শাসনকর্ত্তাহীন। আজ সৈন্ধব-গণের চিরজন্মার্জ্জিত আকাঙ্ক্ষা পূরণেরও সমূহ সুযোগ উপস্থিত। যুবক সঞ্জয়ের হস্তে আজ সৌবীর রাজ্য বিশৃঙ্খলপ্রায়। সৌবীর-রাজ্য রক্ষা আজ শাশ্বত বংশের অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সৌবীরে আজ অসম্ভব সংঘটন হইতেছে। শাশ্বত বংশের নিকট যাহা নিতান্ত হেয়, সেই ভোগ-বিলাস আজ সৌবীরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাজ্যমধ্যে ভোগ-বিলাসের প্রাদুর্ভাবই রাজ্যের অধঃপতনের পূর্ব্বলক্ষণ। যুবক সঞ্জয় সতত ভোগ-বিলাসোন্মত্ত! সুতরাং সিন্ধুরাজ এ সুবিধা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সৌবীর রাজ্য তাঁহার উন্নতি-পথের একটি প্রধান কণ্টক। সত্বর সে কণ্টক উত্তোলন করিয়া পথ পরিষ্কৃত করা সিন্ধুরাজের লক্ষ্য হইল। ত্বরায় সিন্ধুরাজ লক্ষ্যসাধনের বন্দোবস্ত করিলেন। সৈন্ধব-সেনা অচিরে সৌবীর আক্রমণজন্য প্রস্তুত হইল।

ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত! সিন্ধু উত্তালময়! সৌবীর নিম্ন-গামী—পতনোন্মুখ! সিন্ধুতরঙ্গে সৌবীর প্লাবিতপ্রায়! সৌবীর এখনই সিন্ধুগর্ভে মগ্ন হইবে! দাস-দাসী-সমন্বিত, হয়-হস্তি-পরিবৃত, মণি-মুক্তা-রত্ন-খচিত রাজ-অট্টালিকা এখনই সিন্ধুজলে ভাসিবে—ডুবিবে! কে পতনোন্মুখ সৌবীরের উদ্ধার করিবে? প্রবল সিন্ধুপ্রবাহে কে বাধা দিতে সক্ষম হইবে? কেন—সঞ্জয়। সৌবীররাজ সঞ্জয় হতাশ্বাসপ্রায়! প্রাণভয়ে সৈন্ধব অবরোধে বাধা দিতে অনিচ্ছুক। "অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক" এই তাঁহার

বাসনা। তিনি অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিস্তব্ধ—শত্রুসংহারে নিশ্চেষ্ট। তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না যে, সৈন্ধবগণ সম্মুখবর্ত্তী—সৌবীর বিধ্বস্ত করিতে অগ্রসর।

সৈন্ধব অবরোধবার্ত্তা ত্বরায় বিদুলা সমীপে উপনীত হইল। বিদুলার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল! সৌবীরের অধঃপতন তাঁহার অদর্শনীয় হইল; তিনি আর তাহা দেখিতে পারিলেন না। সঞ্জয়ের বাসনার তিনি প্রতিবন্ধকতা করিতে অগ্রসর হইলেন। সঞ্জয়ের বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল না। তাঁহার জননী বিদুলা পুত্রের অধঃপতন দেখিতে পারিলেন না। অজ্ঞান পুত্রকে জ্ঞানদান তাঁহার চিরজন্মার্জ্জিত লক্ষ্য। দৈববিড়ম্বনায় এত দিন তাঁহার সে লক্ষ্য সিদ্ধ হয় নাই। এই বার সৈন্ধবগণের সুযোগে তাঁহারও সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সৈন্ধবগণ যেমন তাঁহাদের চিরাকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সাধনের সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, বিদুলাও অজ্ঞান পুত্রকে জ্ঞানদান করিতে তদ্রূপ আর স্থির রহিলেন না। বিদুলা জানিতেন, উপস্থিত সুযোগ পরিত্যাগ করিলে আর পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। সুতরাং তিনি চিরাকাঙ্ক্ষিতা আশা মিটাইতে মাতার কর্ত্তব্য পালনে যত্নবতী হইলেন।

বিদুলা দেবহৃদয়া। হৃদয় তাঁহার তেজস্বিতা-পূর্ণ। তিনি জানিতেন, মহত্ত্ব অপেক্ষা প্রাণ বড় নহে। মুহূর্ত্তকাল প্রজ্বলিত বিদ্যুতের গৌরব আছে; কিন্তু চির-ধূমায়িত তুষাগ্নি লোকের অপ্রীতিকর। তিনি অজ্ঞান সঞ্জয়কে ডাকিলেন, বলিলেন, "সঞ্জয়! শত্রুর নিকট হীনতা স্বীকার করিও না। পদদলিত কীট হীনতা স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু পদ-দলিত মনুষ্য মনুষ্য

নামের বাচ্য নহে। আমরা ক্ষত্রিয়—বরণীয় শাশ্বত বংশে আমাদের জন্ম—আমাদের কুলমাহাত্ম্য কখনও শত্রুর নিকট হীনতা স্বীকার করে নাই। তুমি হীনতা স্বীকার করিয়া নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক অর্পণ করিও না। তুমি পুরুষ; পুরুষত্ব দেখাইয়া পুরুষ নামের বাচ্য হও। জগতে মনুষ্য নাম অনেকের আছে; কিন্তু পুত্র! মহত্ত্ব কয় জনের আছে? জগতে কত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তন্মধ্যে কয় জনের নাম আছে? যাহাদের নাম নাই, তাহারা কি মনুষ্য? মরিলে পশু পক্ষীর নাম থাকে না—কীট পতঙ্গ-জন্মের উল্লেখ হয় না। কিন্তু পুত্র! তুমি মনুষ্য; মনুষ্য নাম রাখিতে যত্নবান হও। আর নিশ্চিন্ত থাকিও না। ত্বরায় সৈন্যসহ সৈন্ধব-শত্রুর সম্মুখীন হও। তাহাতে হয় তোমার তুচ্ছ জীবন যাইবে, নয় তুমি দেবনামে সম্পূজিত হইবে। এখনও তুমি রাজা; কিন্তু সঞ্জয়, আর দুই দিন পরে রাজা নাম কোথায় পাইবে।"

বিদুলার বাক্যে সঞ্জয়ের মোহ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। লুপ্ত-আশা সঞ্জয়-হৃদয়ে কথঞ্চিৎ বেগে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তিনি মাতার আজ্ঞায় সৌবীর-সৈন্য প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তিনি মাতার বাক্যে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলেন; কিন্তু তাঁহার নিদ্রার তন্দ্রা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল না। তিনি সৈন্য সহ হতাশাস মনে রণস্থলে গমন করিলেন। সিন্ধুনদের তীরে সিন্ধু-সৌবীরে যুদ্ধ সমারব্ধ হইল। প্রচণ্ড সিন্ধু-প্রবাহে মৃণ্ময় বাঁধ বাঁধা হইল। ক্ষণকালের জন্য সৈন্ধবসেনা অবরোধে বাধা পাইল। রক্তস্রোত কিছুক্ষণের জন্য সিন্ধু-প্রবাহের বেগ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

মানব-মন স্থির নহে। সতত বিভিন্নপথে ঘূর্ণায়মান হই-তেছে। মন-স্থির সুকঠিন। যিনি মনের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার মনের একাগ্রতা—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে.এ জগতে তিনিই ধন্য—এ জগতে তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। সঞ্জয়ের মন এখনও স্থির নহে। তিনি মাতৃ-বাক্যে যুদ্ধে গিয়াছেন বটে, কিন্তু জয়ী হইবার বিশ্বাস তাঁহার নাই। বিশ্বাসে বল আবশ্যক, তবে তো বাসনা সিদ্ধি হইবে? জয়ী হইবার বিশ্বাসই সঞ্জয়ের নাই, বিশ্বাসে বলপ্রাপ্ত হওয়া তো পরের কথা! ভীষণ রণকাণ্ডে তাঁহার ভয় জন্মিল। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু! রক্তস্রোত প্রবাহিত! সিন্ধুজল রক্তিম বর্ণ!—রণস্থল শ্মশান! সঞ্জয় আর দেখিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহার মনে ভীতি-সঞ্চার হইল। তিনি প্রাণ ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। সৈন্ধব সৈন্য ও সৌবীর-লুণ্ঠনে অগ্রসর হইতে লাগিল। মৃণ্ময় বাঁধ প্রবল সিন্ধু-প্রবাহে ভাঙ্গিল। উদ্বেল সিন্ধুজল সৌবীর ডুবাইতে প্রধাবিত হইল। সৈন্ধব-জয়-নিনাদে সৌবীর কাঁপিল—বাতবিকারাক্রান্ত রোগীর মুমূর্ষাবস্থার ন্যায় কাঁপিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। সৌবীর পর-আক্রমণে মর্ম্মভেদী স্বরে কাঁদিতে লাগিল, আর সৈন্ধবগণ অট্টহাস্যে হাসিয়া আনন্দ-ধ্বনিতে মেদিনী ধ্বনিত করিতে লাগিল।

সঞ্জয় গৃহে ফিরিলেন। নির্বীর্য্য পুরুষের ন্যায়—শত্রু-দলকে মাতঙ্গ জ্ঞানে পতঙ্গের ন্যায় গৃহে আসিলেন। মাতার অজ্ঞাতসারে স্বীয় প্রকোষ্ঠমধ্যে দীনভাবে শয়ন করিয়া রহি-লেন। অজ্ঞানের ন্যায় হিতাহিত বিবেচনা করিলেন না।

মান্যের প্রতি, রাজ্যের প্রতি ভ্রমেও একবার দৃষ্টিপাত করিলেন না। কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, —অজ্ঞান মোহনিদ্রায় অচেতন হইলেন। কিন্তু সঞ্জয়! তুমি অতি ভ্রান্ত! তুমি নিশ্চিন্ত থাকিলে কি হইবে? একটি হৃদয় যে এখনও নিশ্চিন্ত নহে,তোমার মত ভ্রম-নিদ্রায় নিদ্রিত হয় নাই। সে হৃদয় সতত তোমার কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত, কিসে তোমার ভাল হয়, কিসে তুমি জয়ী হও, এই সে হৃদয়ের একমাত্র ভাবনা —আন্তরিক বাসনা। সে হৃদয় পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া শোক করিতেছে,—অন্ধকারের ভিতরে—গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে, সে হৃদয় ভাবিতেছে, "সৌবীর ধন মানে বিভূষিত ছিল, কিন্তু আজ তাহার সকলই বিলোপপ্রায়! আমাদের পাপভারে ভারাক্রান্ত সৌবীর আজ সঞ্জয়ের হস্তে পড়িয়া সকলই হারাই-তেছে। কেশরী ছাগপাদদেশ-বিলুণ্ঠিত—উত্থানশক্তি বিরহিত! কোথায় রাজ্যসীমা বৃদ্ধি পাইবে—কোথায় সৌবীর আজ সমগ্র ভারতের রাজধানী হইবে, না আজ সে আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম শত্রুর ভ্রূভঙ্গিতে ভীত! দিগ্দেশ সে সৌবীরের নামে কাঁপিত, আজ সেই সৌবীর দস্যু-উপদ্রবে কাঁপিতেছে, ইহার এ কম্পন কিরূপে নিবৃত্তি হইবে? কোন্ সদুপায় অবলম্বন করিলে দস্যুভয়ে ভীত সৌবীর আবার সাহস প্রাপ্ত হইবে? সৌবীর না রক্ষা করিতে পারিলে, জগৎ যে আমাদের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিয়া হাসিবে! গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া যে, শত্রুকুল আমাদের দুঃখে আনন্দ প্রকাশ করিবে? মনুষ্য-জীবনে কেমন করিয়া শত্রুর হাস্য দেখিব? শত্রুর ভ্রূভঙ্গি দেখিয়াই বা কেমন করিয়া জীবন রাখিতে সক্ষম

হইব? না—তাহা হইবে না। একে একে সকল প্রাণ বিনিময়ে সৌবীর রক্ষা করিতে যত্ন পাইব। যত্নে কার্য্য-সিদ্ধি না হইলে প্রাণ যাইবে, কিন্তু অপমান সহ্য করিতে হইবে না—শত্রুর বিকট হাস্য দেখিয়া প্রাণকে ব্যথা পাইতে হইবে না। প্রাণ কি জন্য? যে প্রাণ আপনার মান রক্ষা করিতে অক্ষম, সে প্রাণের আর মূল্য কি? মূল্যহীন জীবন রক্ষার প্রয়োজন? প্রয়োজন কিছুই নাই।"

এ হৃদয় কাহার? কাহার হৃদয়ের এ বিষম ভাবনা? কেন?—সঞ্জয়-জননী বিদুলা। অচিরে সঞ্জয়ের প্রত্যাগমন-সংবাদ বিদুলা-সমীপে পৌঁছিল। বিদুলা সকলই শুনিলেন—তিনি গম্ভীরভাবে সঞ্জয়ের কার্য্য-কাহিনী শুনিলেন। সন্তান সঞ্জয় তাঁহার কথার অবমাননা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার কথানুযায়ী কার্য্য করেন নাই; রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া ক্ষত্রকুল-দূষিত করিয়াছেন—তাঁহার কারণ বরণীয় শাশ্বতবংশে গভীর কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত হইয়াছে; বিদুলা সে সকলই শুনিলেন। পুত্রের পাপ কার্য্যে তিনি আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলেন না। দেব-হৃদয়া বিদুলা পুত্রের কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইবেন কেন? হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইলে যে, রাজ্যেরই অমঙ্গল—তাহা হইলে যে তাঁহার বাসনার বিপরীত ফল ফলিবে! বাসনার বিপরীত ফল-রাজ্যের অমঙ্গল দর্শন বিদুলা আর কেমন করিয়া করিবেন? বিদুলা বুদ্ধিমতী। গতানু-শোচনায় ফল নাই বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল। ভাবী আশঙ্কার উচ্ছেদ-সাধনে তাঁহার অভিলাষ হইল। তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছিলেন যে, সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আর

দেখ, শত্রুগণ সম্মুখবর্ত্তী, রাজ্যের উৎসাদনে নিযুক্ত—রাজ্য শত্রু-পদভরে কাঁপিতেছে। সুতরাং সঞ্জয়! আর সময় নষ্ট করিও না। মহতের ন্যায় অরিদলনে শীঘ্র প্রবৃত্ত হও। আত্মার সংশোধনে, দেশের সংরক্ষণে, বিপক্ষের অনুসরণে, পুত্র! প্রাণ উপেক্ষা কর। আর ছার প্রাণের মায়ায় কঠোর কর্ত্তব্যের পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ হইও না।”

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-জননী বিদুলার বাক্যে বিস্মিত হইতে পারেন! পুত্র প্রতি জননীর এরূপ কঠোর বাক্যে সকলের আশ্চর্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহাতে বিস্ময় বা আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। এককালে ভারতরমণী প্রকৃতপক্ষেই এইরূপ তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে দেশের গৌরব ছিল; তাঁহাদের শৌর্য্যে দেশের গৌরব সংরক্ষিত হইত।

বিদুলার বাক্যে ভ্রান্ত সঞ্জয়ের চৈতন্য সম্পাদন হইল না। সঞ্জয় জননী-চরণে অবনত হইলেন। বিদুলার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, “জননি! আমার শরীর শত্রু-শরে ভগ্নপ্রায়! দেহ ক্ষতবিক্ষত—প্রাণ সশঙ্কিত! এবার যুদ্ধে যাইলে আমায় আর পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন না। আপনার পুত্র বড়, না রাজ্য বড়? কিন্তু জননি! রাজ্য বড় হইলেও, আমি এবার আর যুদ্ধে যাইতে পারিব না। আমি এবার আপনার শরণাগত। পুত্র বলিয়া জননীর ন্যায় এবার আমায় দয়া করুন।”

পুত্রের এরূপ কাতরোক্তিতে মাতৃহৃদয় স্নিগ্ধ হইতে পারে, যেরূপ তেজস্বিনী জননীই হউন না কেন, পুত্রের এরূপ কাত-

যোক্তি শুনিলে সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হয়, কিন্তু বিদুলা-হৃদয় তাহাতে অণুমাত্র ব্যথিত হইল না—সে হৃদয় অচল—অটল ভাবে স্থির রহিল। পুত্রস্নেহে আপনার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া দূরের কথা, বরং তিনি সন্তানের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার মনের গতি ফিরাইতে সচেষ্টিত হইলেন। বিদুলা জানিতেন, কার্য্য কখনও নিষ্ফল হয় না, কার্য্যফল অবশ্যম্ভাবী। সৎকার্য্যের সুফল এবং অসৎকার্য্যের কুফল অলঙ্ঘনীয়। তাই তিনি সঞ্জয়ের দুঃখে দুঃখিত হইলেন না। তাই চঞ্চল মানবের মত তাঁহার মন বিচলিত হইল না।

তিনি সঞ্জয়ের কথার উত্তর দিলেন। বলিলেন, "সঞ্জয়! পুত্রস্নেহ প্রবল বটে; কিন্তু কর্ত্তব্যের নিকট নহে। আমি পুত্রস্নেহ যেরূপ বুঝি, আমার কর্ত্তব্যবোধও তদ্রূপ আছে। তোমার যশোগৌরব বিলোপ পাইবে, অন্নাভাবে কাল তুমি অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করিবে; আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না, তুমি সৌবীর হইতে প্রবাসিত হইলে, স্বীয় হীনবীর্য্য এবং নীচাশয়তার পরিচয় দিলে, আমি কখনই প্রাণ রাখিতে পারিব না। তাহা হইলে—আমি জীবিত থাকিলে লোকে আমায় মানবী না বলিয়া গর্দ্দভী বলিয়া ডাকিবে। সুতরাং আমি তোমার অধঃপতন দেখিতে পারিব না। তুমি চেষ্টা কর, সফলমনোরথ হইবে—এ জগতে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টার গুণে মূর্খ বানরেও উত্তাল তরঙ্গায়িত সিন্ধু-গর্ভে সেতু বাঁধিতে পারিয়াছিল।—চেষ্টার গুণে রাক্ষসাপহৃতা সীতাকে বন্য বানরের সাহায্যে সামান্য মানবে উদ্ধার করিয়াছিল। পুত্র! অধিক বলিব কি! যে ভৃগুনন্দন

পরশুরামের প্রতাপে সমগ্র ভারত কাঁপিত—যে বীর পর্য্যায়ক্রমে স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে একবিংশতি বার আমাদের এই শৌর্য্য-সম্প: ক্ষত্রিয় বংশের উৎসাদন-সাধন করিয়াছিলেন; সুমহৎ চেষ্টার গুণে দারুণ অধ্যবসায়-লব্ধ রণনৈপুণ্যে ক্ষত্রকুলতিলক রাম কৌমার কালেই, তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারিয়াছিলেন; রাম অসহায়ে একাকীই ভার্গবকে জয় করিয়া ভার্গবারি নাম ধরিতে পারিয়াছিলেন। তবে তুমি ভীত হইতেছ কেন? দেহে প্রাণ থাকিতে, বাহুদ্বয়ে বল থাকিতে, সৈন্যগণ সহায় থাকিতে, তুমি কেন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ? এ সময়ে এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে—ইহা পশুর কার্য্য। পুত্র! তুমি আর 'না' কথা মুখে আনিও না। 'না' কথা মনুষ্যের জন্য নহে। 'না' কথা মানুষের মুখে শোভা পায় না। অমানুষ—অবীরই 'না' বলিয়া থাকে। মহৎ ব্যক্তিগণ কখনও 'না' কথা ব্যবহার করেন নাই। তুমি কেন 'না' কথার ব্যবহার করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত কর?

"পুত্র! উদ্যম দেখাও। প্রচণ্ড সমরানলে জীবনাহুতি দিতে অগ্রসর হও। জীবন চিরস্থায়ী নহে, আজ রক্ষা পাইলেও দুই দিবস পরে তাহাকে কেহ রাখিতে পারিবে না। পুত্র! যুদ্ধে মরিলে দেবত্ব পাইবে—লোকে দেব নামে তোমাকে পূজিত করিবে; নতুবা নরকে কীট-জন্ম লইতে হইবে। তবে এখন মরিয়া দেবত্ব পাইতে কেন না সচেষ্টিত হও? সঞ্জয়! আশা ত্যাগ করিও না। আশাই মানবের শক্তি—আর আশাই মানবের জীবন। আশা ভিন্ন মানবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে। ছিন্নমূল হইলেও আশাশূন্য ভগ্নোদ্যম হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পুত্র!

এ জগতে কেহই কাহার নয়—একাকী জগতে আসিয়াছ; জগৎ হইতে একাকী যাইতে হইবে। বন্ধুবর্গ, যাহাদের মায়া-মোহে তুমি যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারিতেছ না, তাহারা তোমার কয় দিনের জন্য? তোমার রাজ্য যাইলে তুমি ভিখারী হইলে, তাহারা কি তোমার সমভাগ্য গ্রহণ করিবে?—কখনই না। পুত্র! তাই বলি, নীরবে জন্মিয়া নীরবে লয় হইলে কি হইবে? পশু-পক্ষি-কীটাদি নীরবে জন্মে, আর নীরবে বিলয় হয়—কিন্তু মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া তদ্রূপ তুমি কেন নীরবে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রস্তুত?"

জননীর এবাক্যে কোন্ হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? কোন্ কাপুরুষ স্নেহমমতার আধার জননীর এই বাক্যে উত্তেজিত না হয়? সঞ্জয় অলস বটে, যুবজনোচিত ভোগ বিলাসিকতায় তাঁহার মনুষ্যত্ব বিলোপপ্রায় সত্য, কিন্তু জননী বিহুলার এই বাক্যে তাঁহার আলস্য দূর হইল অসার পার্থিব বৈভবের অসারত্ব তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন। কীর্ত্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, কীর্ত্তিই পার্থিব জীবনের অস্তিত্ব এতক্ষণে ভ্রান্ত সঞ্জয়ের বোধ জন্মিল। "জননি! প্রাণ যায় যাইবে, কিন্তু আপনার বাক্য আর লঙ্ঘন করিব না" এই বলিয়া সঞ্জয় জননীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। "সঞ্জয়! যদি প্রাণ উপেক্ষা করিয়া থাক, তবে অবশ্যই তুমি সফল মনোরথ হইবে" জননী বিহুলা এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ধন্য বিহুলা! ধন্য তোমার সাহস!

বাঙ্গালী জননী একবার বিহুলাদৃষ্টে জননী-জীবনের কঠোর দায়িত্বের বিষয় অনুশোচনা করিবেন কি? বিহুলার ন্যায়

সন্তানকে সাহসিকতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে যত্নবতী হইবেন কি? না বিদুলার সন্তান পালনে আপনাদের বিদুলাপ্রতি বীতশ্রদ্ধা জন্মিবে? আপনাদের মনে যাহা হয় হউক, কিন্তু জগতের নিকট বিদুলা সম্পূজিতা দেবী নামে আখ্যাতা।

এ দিকে সৈন্ধবগণের মহানন্দ। সঞ্জয়ের পলায়নের পর হইতেই তাহারা সৌবীর রাজ্য লুণ্ঠনে ব্যাপৃত। সৌবীরে হাহাকার উঠিয়াছে। ধন, মান, প্রাণ লইয়া সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সহসা পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিদুলা তুষমধ্যে অগ্নি দিয়াছিলেন, সে অগ্নি এখন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে অগ্নি এখন একস্থানে স্থির নাই—অবস্থান সম্প্রসারণ করিতে সমুদ্যত। সে জ্বলন্ত অনল এখন শত্রুকুল ভস্ম করিতে প্রকান্ত প্রয়াসী। সঞ্জয়কে পুনর্ব্বার প্রতিবন্ধকতা অবলম্বন করিতে দেখিয়া সৈন্ধবগণ ভীত হইল। ভয়ই সর্ব্বনাশের মূল। ভয় একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে আর কার্য্যসিদ্ধি হওয়া সুকঠিন। সৈন্ধবগণেরও তাহাই ঘটিল। তাহারা আর যুদ্ধ করিতে পারিল না। ভয়ে ভীত হইয়া অবরোধিত সৌবীর ত্যাগ করিয়া তাহারা পলায়ন করিল। দ্বিতীয় যুদ্ধে সঞ্জয় জয়ী হইলেন। বিদুলার দেববাক্যের পূর্ণতা হইল।

দ্বিতীয় বার সঞ্জয় গৃহে ফিরিলেন। প্রথম বার প্রত্যাগমন কালে তাঁহাতে যাহা লক্ষিত হইয়াছিল, এ বার তাহা হইতে তাঁহার আকার বিভিন্ন—অঙ্গ-বৈচিত্র্য স্বতন্ত্র। সে বার তাঁহার যে মুখে ক্রন্দনের বিষম কালিমাপাত লক্ষিত হইয়াছিল, এবার তাঁহার সে মুখ হাস্যময়, ভীতিব্যঞ্জক নৈরাশ্যের পরিবর্ত্তে এবার

সে বদন আনন্দপূর্ণ। সে বার যে বদন দেখাইয়াছিল পতন অলঙ্ঘনীয়, এবার সে বদন দেখাইতেছে যে উদ্যমে অবশ্যম্ভাবী পতন উলঙ্ঘন করা অসম্ভব নহে। "অদৃষ্টের গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না, অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটুক" যে বদনে সে বার এই পাপবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, সে বদন এ বারে যেন বলিতেছে "অদৃষ্ট আবার কি? অদৃষ্ট অলসদিগের অলসতা সম্পাদনের ছল, পাপীর পাপকার্য্য সাধনের পথ, অধঃপতনের ভিত্তি ও মূল। উদ্যম ও অধ্যবসায় অসম্পন্ন থাকিতে পারে, ঐশ্বরিক রাজ্যে এমন কার্য্য কিছুই নাই।"

সৌবীররাজ্য আবার শান্তিময় হইল। আবার শাশ্বত বংশের অধীনে সৌবীর উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। বিজয়ী সঞ্জয় সৌবীরের নাম মাত্র শাসনকর্ত্তা হইলেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার জননী বিহুলাই সৌবীর রাজ্যের শাসন-কর্ত্রী পালন-কর্ত্রী রহিলেন। মাতার পরিচর্য্যায় সন্তান সঞ্জয় সৌবীর-শাসন করিতে লাগিলেন। বিহুলা বিদ্যাবতী ছিলেন, আপন অধ্যবসায়ে, শিক্ষকের সামান্য সাহায্যে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি তাঁহার বিশেষ আয়ত্ত ছিল। এখন তাঁহার সেই বিদ্যার জ্যোতি সৌবীরের অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি সন্তান সঞ্জয়কে উপযুক্ত সুশিক্ষা দানে রাজ্যশাসনের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাজ্যশান্তি-নিকেতনে পরিণত করিলেন। পতনোন্মুখ সৌবীর অবলা রমণীর সাহসে আবার উন্নতি-সোপানে অধিরূঢ়!—চূর্ণ গিরিশৃঙ্গ অবলা-বীরত্বে আবার উচ্চশিখরে সমাসীন!

কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অপেক্ষা যে জননীর পুত্র-জীবন শ্রেষ্ঠ নহে; যিনি প্রাণের ভিখারী নহেন, কিন্তু মানের ভিখারী; সকলই যাঁহার নিকট তুচ্ছ, কেবল পুত্রের মহত্ত্বই যাঁহার লক্ষ্য; সে জননী কেন দেবী নামে পূজিতা না হইবেন? পতিত বাঙ্গালী না বুঝিয়া বিহুলাচরিত্রে বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, বিহুলা-হৃদয়ের মহত্ত্ব অনুভূত করিতে না পারিয়া বিহুলাকে দানবী, রাক্ষসী নামে অভিহিতা করিতে পারেন; কিন্তু বিহুলা দেবী। পুত্র-পালন কি করিয়া করিতে হয়, বিহুলা তাহা সবিশেষ জানিতেন। সন্তানের উন্নতি অবনতির পথ-জ্ঞান তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। বাঙ্গালী-জননী পুত্র পালন করিতে জানেন না বলিয়া, পুত্রের পার্থিব সুখ দুঃখের পথ চিনিয়া লইতে পারেন না বলিয়া, বিহুলাকে দেবী নামে সম্পূজিতা করিতে স্বীকৃতা না হইতে পারেন; কিন্তু যত দিন এই পৃথিবী স্বীয় কক্ষোপরি পর্য্যায়ক্রমে পরিভ্রমণ করিবে; যত কাল পর্য্যন্ত জগতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত সহৃদয় কবি এবং ইতিহাস বিহুলা নামের গৌরব বিস্মৃত হইবেন না। তাঁহাদের অমৃতময়ী বাণী আজীবন বিহুলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে। প্রকৃত জননী নামে বিহুলা মানব-সমাজে তত কাল সম্পূজিত হইবেন, তত কাল পর্য্যন্ত বিহুলা-সঞ্জয়-কাহিনী গম্ভীর নিনাদে জগতে ঘোষিত হইবে।



বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই।

বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই।

রাজার রাজ্যচ্যুতির কারণ রাজ-অত্যাচার। অত্যাচারে দুর্ব্বল প্রজাকুলও রাজবিদ্রোহী হয়, রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে—একমনে, প্রাণপণে রাজ-অমঙ্গল সংসাধনে প্রয়াস পায়। কুরুরাজ দুর্য্যোধনের অধঃপতন হইল কিসে? দুরাচার, দুরন্ত সিরাজ রাজ্যভ্রষ্ট হইল কেন? ভীরুই হউক বা সাহসীই হউক, কাপুরুষই হইক বা বীরপুরুষই হউক, দুর্ব্বলই হউক, আর বলবানই হউক, অবলা রমণীই হউক বা কঠিন পুরুষই হউক, অত্যাচারে সকলেরই হৃদয় ব্যথা পায়—অত্যাচার নিবারণে সকলেই সচেষ্টিত হয়; অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে—হুহুঙ্কারে, সাহস ভরে, ঘোর রণে অরিদলনে প্রবৃত্ত হয়। আলোচ্য লক্ষ্মীবাই ইহার দৃষ্টান্ত। লক্ষ্মীবাই অবলা রমণী—শতবর্ষের কঠিন প্রস্তর চাপনে নির্বীর্য্য, নিস্তেজ হিন্দু-রমণী। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ-রাজ্যের প্রবল পীড়নে—নিদারুণ অত্যাচারে তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়ও মাতিয়াছিল; ইংরাজ-অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল প্রদানে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; বীরসাজে সাজিয়া, গভীর নিনাদে, জীবন্ত উৎসাহের অনন্ত বীর্য্যে তিনিও ভারত বিকম্পিত করিয়াছিলেন; ইংরাজ শাসনের অন্তমূল কুঠারাঘাতে ছিন্ন করিতে সমূহ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

হিন্দু সাগরের পারে যাইবে? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিবে? স্বর্ণপ্রসূ ভারতে কি সন্তানের আহার জুটিবে না? তাই অধীন সৈন্যবেশে দাসবেশে দীন-

দের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারতের অন্তস্তলই বিকম্পিত হউক, সৈন্যবল তাঁহাদের অগণ্যই হউক, লক্ষ্মীবাই সে লক্ষ্য করিলেন না। ইংরাজ-অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের প্রতি স্তরে বদ্ধমূল; যে অত্যাচারে রণবীর রণজিৎ রাজ্যহারা, পুত্র দলীপ ধর্ম্মভ্রষ্ট, রাজ্যত্যাগী, দীনবেশে ভিন্নদেশে অবস্থিত; যে অত্যাচার অকারণে, অন্যায়রূপে রাজা নন্দকুমারের হত্যার কারণ, সে অত্যাচার-কাহিনী লক্ষ্মীবাই এত দিন অন্তরে অন্তর্নিহিত রাখিয়াছিলেন। সুযোগ পাইলে, যদি কখনও অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদান করিতে পারেন, অত্যাচারীর সমূহ দণ্ড দিতে পারেন, এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, লক্ষ্মীবাই এত দিন নিস্তব্ধ ছিলেন; স্থিরমনে সুযোগ অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন।

এখন সেই সুযোগ উপস্থিত। প্রবল ইংরাজ অত্যাচার ভারতের অসহ্য হইয়াছে। নানা সাহেব মাতিয়াছেন, তান্তিয়া-তোপী ইংরাজবিরুদ্ধে খড়্গ ধরিয়াছেন। সুতরাং কেমন করিয়া লক্ষ্মীবাই সে সুযোগ ত্যাগ করিবেন? অন্যের কথা ছাড়িয়া দাও, রণজিৎ সিংহের দুর্দ্দশার কথা স্মরণে ফল নাই; নন্দকুমারের অন্যায় হত্যা বা রণজিৎপুত্র দলীপের রাজ্যচ্যুতি—ধর্ম্মভ্রষ্টের স্মৃতিও ত্যাগ করা যাউক; তথাপি লক্ষ্মীবাই-হৃদয়ে আর একটি ভয়ঙ্কর ইংরাজ-অত্যাচারের কথা যে অঙ্কনে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা সহজে নষ্ট হইবার নহে। মৃত্যুকালে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে (১২৬০ সালে) তাঁহার পতি গঙ্গাধর রাও ইংরাজ-রাজ সহ যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, ইংরাজ পরে তাঁহার সে কথা রক্ষা করেন নাই। গঙ্গাধর রাও ঈশ্বরকে সাক্ষ্য রাখিয়া, ঈশ্বরের ইংরাজ-রাজকে শপথ করাইয়া যে "উইল" (দান-পত্র)

ত্ত করিয়া যান, ইংরাজ সে উইলের মান্য রক্ষা করেন ই। গঙ্গাধরের কথায় অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় স্বার্থ-সাধনায় প্রবৃত্ত য়াছিলেন। ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাচ্ছীল্য কাশ করিয়া, কেবল রাজ্যের সীমাবৃদ্ধির জন্য কাহারও পরামর্শ হণ করেন নাই।

সে সকল কঠোর অপমানের কথা লক্ষ্মীবাই হৃদয়ের স্তরে ব রাখিয়াছিলেন। পতি সতীর লক্ষ্য ও আরাধ্য। ইংরাজ াতের সম্মুখে সেই পতির অবমাননা করিয়াছেন; কথা গ করা দূরের কথা, ঘৃণ্য অপমানে তাঁহার বংশধরগণকেও পমানিত করিয়াছেন। রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাঁহার পত্নী ও ত্রকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন। বংশে বীর নাই, বীরত্ব খাইতে হইবে না, পুরুষ নাই, পুরুষত্ব প্রদর্শন করিতে হবে না, অবলা রমণী লক্ষ্মীবাই রাজ্যের শাসনকর্ত্রী। তাই রাজ অন্যায় আচরণে ঝাঁসি অধিকার করিয়া লইয়াছেন। নিদারুণ অত্যাচার কাহার না মনে থাকে? এ সকল কথাও ক্ষ্মীবাইএর মনে ছিল। কিন্তু মনে থাকিলে কি হইবে? ত দিন তাঁহার সিদ্ধি-সাধনের সুবিধা উপস্থিত হয় নাই; াই তিনি এত দিন নিস্তব্ধভাবে, বিমর্ষে কাল কাটাইতে-লেন। এখন সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার দ্ধিসাধনের দিন এখন আসিয়াছে। সুতরাং তিনি তাহা াগ করিবেন কেন? কোন্ মনুষ্য এরূপ সুবিধা ত্যাগ রিতে পারে? লক্ষ্মীবাই সাদরে এ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। নঃক্ষোভ মিটাইতে তাই তিনি এবার বদ্ধপরিকর হইলেন।

কুলতিলক শিবজী যে কুলের কুলগৌরব রক্ষা করিতে

গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন; কত বার বন্দিভাবে বন্দিত্বের ক্লেশ উপভোগ করিয়াছেন; সেই বীরকুলে—মহারাষ্ট্রবংশে গঙ্গাধর রাও জন্মপরিগ্রহ করেন। ঝাঁসি বহুকাল ব্যাপিয়া ঐ মহারাষ্ট্রবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল। ইংরাজশাসনের নব যৌবনে—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে (১২৪৫ সালে) গঙ্গাধর রাও ঐ ঝাঁসির রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এ সময়ে লর্ড অক্ল্যাণ্ড ভারতের শাসনকর্ত্তা (গবর্ণর জেনেরল) ছিলেন। গঙ্গাধর রাও কিন্তু অধিক কাল রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই তাঁহার শরীর জরাজীর্ণ, ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। তিনি জীবনে হতাশ্বাস হইয়া একটি দরিদ্র আত্মীয়-পুত্রকে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিলেন। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট সম্মুখে সাধারণের গোচরে ঐ পুত্রকে আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া তাঁহার নামে সমস্ত সম্পত্তি "উইল" (দান-পত্র) করিয়া দিলেন উইলে লেখা রহিল যে, তাঁহার পত্নী এবং পুত্র চিরকাল স্বাধীন-ভাবে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি উপভোগ করিবে। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি উঠিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। গঙ্গাধর রাও পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ কাল রাজ্যভোগ করিয়া, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে (১২৬০ সালে) ডালহৌসীর ভারতশাসনকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই লক্ষ্মীবাই সেই গঙ্গাধর রাওয়ের বনিতা। গঙ্গাধর রাও এই বনিতা এবং দত্তকপুত্রের স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে ভরণ পোষণের জন্য আপন বিষয়সম্পত্তি উহাদের নামে উইল করিয়া যান।

দুরন্ত ডালহৌসী গঙ্গাধর রাওয়ের সে কথা রক্ষা করেন নাই। রক্ষা করিব বলিয়া, জীবিত অবস্থায় তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকার পাইয়া, শেষে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই

আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী পুত্রকে দেশত্যাগী করিয়া, রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া, নিদারুণ অত্যাচারে মর্ম্ম-ব্যথা দিয়াছিলেন। লক্ষ্মীবাইএর মিনতি ইংরাজেরা তখন রক্ষা করেন নাই; যুক্তিসিদ্ধ, ন্যায়ানুমোদিত লক্ষ্মীবাইএর সারগর্ভ বাক্য ডালহৌসী তখন শ্রবণ করেন নাই; রমণীর নিবেদনে, আবেদনে তাঁহার কঠিন হৃদয়ের কাঠিন্য তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি রোষ-কষায়িত-লোচনে, নিদারুণ বচনে, লক্ষ্মীবাইকে অবমানিত করিয়াছিলেন; এজেণ্ট পাঠাইয়া, সৈন্যবলে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কথা রক্ষা করেন নাই, সন্ধির নিয়ম রক্ষা করেন নাই। সে অপমানের কথা কি লক্ষ্মীবাইএর মনে নাই? রমণী-হৃদয় কোমল বটে; স্বীকার করি, রমণী-হৃদয় দয়ার আধার, মমতার স্থান, কারুণ্যের দৃষ্টান্ত; কিন্তু সে হৃদয় যে ভগ্ন হইয়াছে, ডালহৌসীর বিষম পদাঘাতে তাহা চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়াছে,—নবভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, মধুরতার পরিবর্ত্তে দৃঢ়তার আধার হইয়াছে। সুকোমল কমল লৌহবিনির্ম্মিত মুদ্গার আকার ধারণ করিয়াছে, ফুলমালা কালসর্পরূপে পরিণত,—দংশনে মনঃক্ষোভ নিবারণে সমুদ্যত। তাই আজ ব্রিটিশ বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবাই তলোয়ারধারী। সিপাহি-বিদ্রোহে বিদ্রোহিণী-বেশে সম্মুখবর্ত্তিনী।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ (১২৬৪ সাল) আসিল। বিদ্রোহ-প্রবাহ প্রবাহিত হইল। আর্য্য আর্য্যগৌরব সংরক্ষণে, মর্ম্মাহত মর্ম্ম-ব্যথা নিবারণে, অত্যাচারে প্রপীড়িত অত্যাচারের প্রতিফল প্রদানে অগ্রসর হইল। ধর্ম্মের কারণ, মানের কারণ, স্বাধীনতার কারণ প্রাণপণে ঘোর রণে ইংরাজরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

দিনে দিনে, প্রহরে প্রহরে, দণ্ডে দণ্ডে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ইংরাজ-সৈন্য বলশূন্য হইতে লাগিল। এই সময়ে লক্ষ্মীবাই আপনার দলভ্রষ্ট পূর্ব্বপরিচিত বিশ্বাসী মহারাষ্ট্র-সৈন্যদলকে হস্তগত করিলেন—দল বাঁধিলেন। মহাত্মা নানকের দল ছিল, তাঁহার শিষ্য গুরু গোবিন্দ সিংহও দল বাঁধিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা ঈশার দল ছিল। মহম্মদেরও মহম্মদীয় দল ছিল। এ জগতে দল না বাঁধিলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবার নহে। তাই শিবজী আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন, আশী হাজার খালসা * সৈন্যের সাহায্যে তাই রণজিৎ সিংহ রণজিৎ নামে অখ্যাত হইয়াছিলেন। আজ অবলা হিন্দু-রমণী দল বাঁধিলেন। ক্ষুদ্র বটে রমণীর মন, অল্প বটে রমণীর বীর্য্য, লোকে বলে, রমণী-হৃদয়ে সাহস নাই, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নাই; কেবল মধুরতা এবং স্নিগ্ধতায় সে হৃদয় আর্দ্র,—সর্ব্বদা প্রাবৃট্-কালীন নদী-সৈকতের ন্যায়; কিন্তু লক্ষ্মীবাইএর এখন সে হৃদয়, সে মন নাই। তাহা এখন ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। এখন বলয়ের পরিবর্ত্তে করে তাঁহার শাণিত অসি। সুকোমল সুরঞ্জিত, পরিধেয় পরিধান-বিনিময়ে অঙ্গে তাঁহার সুকঠিন লৌহবিনির্ম্মিত বর্ম্ম; সুন্দরী সহচরী নারীগণের পরিবর্ত্তে,

---

* শিখ-সমাজের অধিনেতা গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্যগণকে "খালসা", অর্থাৎ পবিত্র নামে অভিহিত করিয়া তাহাদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছিলেন। সে শৃঙ্খল কিছুতেই ছিন্ন হয় নাই; তাঁহার বংশধর রণজিৎ সিংহের অধীনস্থ শিখসৈন্যও এই পবিত্র নামে অভিহিত ছিল। "ওয়া গুরুজি কা খালসা! ওয়া গুরুজি কা ফতে" অর্থাৎ "গুরু অকালী হউন গুরুর জয় হউক" এই খালসা-সৈন্যের বীজমন্ত্র ছিল।

সঙ্গে তাঁহার এখন বিকটকায় মত্তহস্তীপ্রায় অস্ত্রধারী মহারাষ্ট্র-সৈন্য।

১০ই মে মিরাটে সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা হইল। লক্ষ্মীবাই তাহাতে যোগ দিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ়া বীরবেশে সুসজ্জিতা, লক্ষ্মীবাই স্বদল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ ইংরাজরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে ইংরাজ-সৈন্য চমকিত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই মুমূর্ষু ভারতে যে, হিন্দুরমণী আবার শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্র ধরিবে, হুহুঙ্কারে আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া, বিশ্ববিজয়ী সৈন্যসহ সমরে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার বহির্ভূত। যাহা কেহ ভাবে নাই, চিন্তায় যাহা কাহারও আসে নাই, আজ তাহাই ঘটিল। লক্ষ্মীবাই তাহাই করিতে অগ্রসর হইলেন। অকুতোভয়ে, অসীম সাহসে, অদম্য উদ্যমে, সেনাপতি হিউরোজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলেন। যিনি যুদ্ধে সুপণ্ডিত, বীরত্বে অদ্বিতীয়, রণকৌশলে সুনিপুণ, আজ সামান্যা রমণী লক্ষ্মীবাই আপন অধ্যবসায়ের গুণে, সুমহৎ যত্নের গুণে, সেই ব্রিটিশ সেনাপতি হিউরোজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইলেন। তাঁহাকে অকারণে, অন্যায়রূপে রাজ্য-ভ্রষ্টা করিয়াছে, তাঁহার পুত্রকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়া দুরন্ত ডালহৌসী রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে; জগতের সম্মুখে বীরবংশের অবমাননা করিয়াছে; আজ লক্ষ্মীবাই সেই অপমানের প্রতিশোধ দিতে অগ্রসর হইলেন। দুই দলের বিরোধিতায়, হিন্দু-যবনের সঙ্ঘর্ষণে যে অনল জ্বলিল, তাহা এক দিনে নিবিবার নহে। প্রায় বর্ষকাল সে অনল প্রচণ্ড বেগে জ্বলিল। সসৈন্যা লক্ষ্মীবাই দিনে দিনে স্থানে স্থানে ইংরাজ-

মুণ্ড ভূমিশায়ী করিতে লাগিলেন। ইংরাজ স্তম্ভিত! অবল রমণীর বীরত্বে বিস্মিত! ভারতীয় বীরগণ একে একে যাঁহা সহিত সমর করিতে গিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছিলেন বীরবর নানা সাহেব, যিনি বিদ্রোহিতার মূল, হিন্দু-সৈন্যে অধিনায়ক, তিনিও যাঁহার রণে বার বার কত বার পরাজ স্বীকার করিয়াছেন; রণস্থল হইতে ঘোরতর যুদ্ধসময়ে যাঁহাকে পলায়ন-পরায়ণ হইতে হইয়াছে; সেই রণকুশল বীরশ্রে হিউরোজকেও স্থানে স্থানে রমণীবলে পরাজিত হইতে হইল তিনিও লক্ষ্মীবাইকে "বীরবমণী" আখ্যায় আখ্যায়িত করিলেন

ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভারত অরা জকে পরিণতপ্রায়। ইংরাজ-পক্ষে কাণল নীল, হাবলেক, লরেন্স এবং হিউরোজ প্রভৃতি বীরগণ প্রতিদিন অত্যাচারে ভারত বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে বীরনারী একে একে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে সৈন্যভ্রষ্টা হইলেন। অদৃষ্টক্রমে বল্লি নগরের যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যদল প্রায়ই নিহত হইল। ঐ একে কাল সাগরের প্রবল বাত্যা সকলকে জলনিমগ্ন করি । সহায়হীনা সম্পত্তিহীনা, বীরনারীর আশা ভরসা লোপ পাইল।

কিন্তু পাঠক পাঠিকে! তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, বীর-নারী বিপক্ষ-সংহারে নিশ্চেষ্ট রহিলেন; হৃদয়ের সাহস, বল, তাঁহার লোপ পাইল; কোমলাঙ্গের কঠিন আচ্ছাদন সুকঠিন লৌহবর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, জ্যোতিষ্মান্ শাণিত সেই করের অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তিনি অরিদলনে নিবৃত্ত হইলেন। ইহা কি হইতে পারে? যে মহামন্ত্র তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, যে মহৎ আশা—উচ্চ আশা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে;

যে বীরমন্ত্রে তিনি প্রণোদিত হইয়াছেন; তাহা কি সহজে ত্যাগ করিতে পারেন? পৃথিবী রসাতলে যাইতে পারে, দিবাকর দিব্যলোক ভ্রষ্ট হইতে পারেন, চন্দ্রালোকে পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে, ভেকে সিংহ-মস্তকে পদাঘাত করিতে পারে, পিপীলিকায় হিমাচল উত্তোলন করিতে পারে, যদিও এসকল অসম্ভব সম্ভব হয়, তথাপি বীর-নারীর বীরবাক্য কখনও লঙ্ঘন হইবার নহে। একবার যাহা বলিয়াছেন, আশ্রিত আশ্রম ত্যাগ করিয়া যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, সে ব্রতের উদ্যাপন না হইলে, উদ্যাপনে হয় রাজ্যের পুনরুদ্ধার, না হয় পার্থিব জীবনের জীর্ণসংস্কার সংসাধিত না হইলে, তিনি কখনই তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেন না। ইহা হিন্দুর কার্য্য নহে। হিন্দু-জীবনের এরূপ ভীরু উদ্দেশ্য নহে। তিনি মন্ত্র ভুলিতে পারিলেন না। সৈন্য-ভ্রষ্টা, রাজ্য-চ্যুতা, দীনা, ক্ষীণা, মলিনা লক্ষ্মীবাই আপনার গুপ্ত-মন্ত্র ত্যাগ করিলেন না। রাজ্যের অনেক রাজা সৈন্যগণকে বিদ্রোহে মাতাইয়া দিয়া, শেষে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন; ভীরুর ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায় অধীন হইয়া ইংরাজের পদ-সেবায় ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মীবাই তাহা পারিলেন না। স্বাধীনভাবে পত্তিত জীবনের উন্নতি-সাধন বা বিসর্জ্জন তাঁহার সেই মহাব্রত। বিদ্রোহকালে ইংরাজ-রাজের অধীনতা স্বীকার করিলে, চাই কি তিনি রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু সে যে ভীরুর কাজ, মহৎ-জীবনের তো তাহা লক্ষ্য নয়? সুতরাং তিনি তাহা পারিলেন না। সৈন্যভ্রষ্ট হইয়াও,—দলচ্যুত হইয়াও তিনি আবার যবন-রণে প্রবৃত্ত হইলেন।

চ্ছন্ন হইলে আপন কার্য্য সাধনের জন্য সে হৃদয় সতত প্রতীক্ষা করিতেছিল। সন্ধ্যা হইল, জগৎ অন্ধকারে ছাইল; সে হৃদয়ও আপন কার্য্য সাধনের সুযোগ পাইল। লক্ষ্মীবাই যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিতেছেন, হিন্দুনারী হিউরোজকে পরাজিত করিয়া বিজয়-ভেরী বাজাইতে বাজাইতে গৃহে যাইতেছেন, সে কঠিন হৃদয় আর তাহা দেখিতে পারিল না। আপন হৃদয়ের পরিচয় দিতে সে হৃদয় অগ্রসর হইল। জগৎ তাহার সে পাপ কার্য্য চক্ষে দেখিতে পারিবেন না বলিয়া অগ্রেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন—আর নয়ন উন্মীলন করিলেন না।

রণ-কোলাহলও নির্ব্বাণ হইল। চতুর ইংরাজ-সৈন্য অলক্ষিতভাবে অন্ধকারের মধ্যে গোলা-বর্ষণে বীরাঙ্গনাদ্বয়ের বধসাধন করিল। সান্ধ্য সমীর-স্রোত ভারতের জীবন-স্রোতের প্রতিবন্ধক হইল; ভূকম্পনে মেদিনী কাঁপিল, অন্ধকারে ধরণী ছাইল। অরি-দলনে অগ্রসরা ভীমরূপিণী উন্মাদিনী মূর্ত্তি এ মরজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইল। "লক্ষ্মীবাই নাই!" কেবল এই ধ্বনি! প্রতিধ্বনি কাঁদিতেছে! মন কাঁদ! প্রাণ কাঁদ! "লক্ষ্মীবাই নাই!" এই শোক-স্বরে সমস্বরে তরুলতা কাঁদ! কাঁদ পশুপক্ষী! কাঁদ কীটপতঙ্গ! কাল ১৮৫৮ অব্দ! কাল ১৭ই জুন! ঐ অব্দে ঐ দিনে লক্ষ্মীবাই জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন। গোয়ালিয়র-দুর্গে, ধার্ম্মিকের ন্যায়—বীরের ন্যায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বীর্য্য-প্রদর্শনে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বিষম যন্ত্রণা—নিদারুণ ক্ষোভ তাঁহার ঐ দুর্গে শেষ হইয়াছে। অত্যাচারে অন্তর্জ্বালা এইরূপেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

রাণী ভবানী।

রাণী ভবানী এ অধঃপতিত বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী—পূজার পাত্রী। ভবানীর পবিত্র জীবনী দেবত্বে পূর্ণ। তাহা কর্ত্তব্য-পরায়ণতার আদর্শ—বীরত্বে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঘৃণিত বাঙ্গালীর নিকট আজ সে জীবনীর আদর নাই। বাঙ্গালী রঙ্গরসের কথায় কাল কাটাইবে, নভেল, নাটক পড়িয়া আমোদ পাইবে; কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, কেহ রাণী ভবানীর জীবনী জানিবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালী, শিক্ষার গুণে নুরজঁহা বা চাঁদবিবি, রোলাণ্ড বা কর্দ্দে প্রভৃতি শত শত বিদেশীয়া রমণীর সম্যক্ জীবনী কথায় কথায় আবৃত্তি করিতে পারেন, কিন্তু কই, কয় জন রাণী ভবানীর পবিত্র-জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন?

ঐ যে উত্তর-বঙ্গে হিমাচল-পাদদেশে রাজসাহী বিভাগ পরিলক্ষিত হইতেছে, ছাতিম, ঐ রাজসাহীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। পবিত্র-পল্লী ছাতিম পবিত্রাত্মা রাণী ভবানীর জন্মস্থান। ভবানী পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্না—বারেন্দ্র-বংশ-সম্ভূতা। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী। আত্মারাম চৌধুরী চিরদরিদ্র। ভবানী সেই চির-দরিদ্রের কন্যা। দরিদ্র-নন্দিনীর আবার রাণী উপাধি কেন? দিনান্তে যাহার আহারের অভাব, কষ্টেও যাহার পরিধেয় বস্ত্রের অনাটন, সে হেন চির-দরিদ্র আত্মারাম-নন্দিনী ভবানীর আবার রাণী উপাধি কেন? পাঠক! পাঠিকে! বিস্মিত হইতে পারেন! কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। সৌন্দর্য্যে যিনি দ্বিতীয় তিলোত্তমা,

হৃদ্গুণে যিনি দেবী সরস্বতী, 'রাণী' উপাধি-লাভ তাঁহার পক্ষে আর কি অসম্ভব ?

শারীরিক সৌন্দর্য্যে কিম্বা হৃদয়ের মহত্ত্বে মানব-মন বিমোহিত হয়। ভবানী এতদুভয়েরই অধিকারিণী। তবে আর তাঁহার 'রাণী' উপাধি লাভ না হইবে কেন? রাজা রামজীবন রায় রাজসাহীর ভূম্যধিকারী—রাজা। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামজীবন রাজত্ব করেন। নাটোর তাঁহার রাজধানী ছিল। রামজীবনের দ্বিতীয় পুত্র রামকান্ত রায় অবিবাহিত। রামজীবন পুত্রের পরিণয়ার্থ পাত্রীর অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভবানীর অদৃষ্ট ফিরিল। রূপ-গুণ-বিভূষিতা ভবানী অদৃষ্টক্রমে রাজা রামজীবন রায়ের পুত্রবধূ হইলেন। রামকান্তের সহিত ভবানীর শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। পুত্রের পরিণয়ান্তে রামজীবন রায় অধিক দিন রাজ্য-ভোগ করিতে পাইলেন না। শীঘ্র বার্দ্ধক্যে তাঁহার শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া আসিল। পুত্রবধূ-মুখ সন্দর্শনের তিন চারি বৎসর পরে রামজীবন মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে (১১৩৭ সালে) রামজীবন পরলোক প্রাপ্ত হন। পিতার পরলোকান্তে রামকান্ত অতুল পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। সুতরাং দরিদ্র-নন্দিনী ভবানী এখন 'রাজরাণী'। কিন্তু নামে রাণী হইয়া তিনি আর কি করিবেন? রাজ্যভার পতির হস্তে। পতি রামকান্ত অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক—তরুণ যুবক। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয় মন যৌবনোচিত চাঞ্চল্যে পূর্ণ। বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া, অসংখ্য দাস দাসীর উপর আধিপত্য পাইয়া তাঁহার যৌবনোচিত ...

আর কিরূপে নিবৃত্ত থাকিবে? অর্থ অমৃতময়; কিন্তু ব্যবহারের বিপর্য্যয়ে তাহা হইতে প্রাণনাশক বিষের সৃষ্টি হয়। তরুণ রামকান্ত আর অর্থের ব্যবহার কি জানেন? সুতরাং তাঁহার হস্তে অর্থ অনর্থকর হইল। ক্রমে অর্থ-সহচর গর্ব্ব তাঁহার সহচর হইল, আর দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। সুজনের সুপরামর্শ তাঁহার কর্ণে শেল-সম বিদ্ধ হইতে লাগিল।

অর্থের অধিকারীর এইরূপ স্বভাবই অধঃপতনের লক্ষণ। দয়ারাম বহুকাল হইতে রাজসরকারের প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি রামজীবনের সময়ে আপনার কার্য্য-পটুতার কারণ সামান্য ভাণ্ডারী হইতে রাজ-সরকারে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামজীবনের মৃত্যুর পর রামকান্তের পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হয়। রামকান্তের বিকৃত চরিত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার কারণ তিনি রামকান্তকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকান্ত সে হিত-বাক্য শুনিলেন না। ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গরীয়ান্ নবীন যুবক দয়ারামকে অপমানিত করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। চির-সুহৃদ্ দয়ারামের সৌহৃদ্যতা-পাশ ছিন্ন করিয়া, আপনার জনৈক যুবা সহচরের হস্তে দয়ারামের কার্য্য-ভার অর্পণ করিলেন—ঐশ্বর্য্য-সহচর বন্ধু বান্ধব লইয়া সুখে জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন।

জগতে প্রকৃত বন্ধু দুর্লভ। কুকার্য্যের প্রতিবন্ধক, সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা, দুঃসময়ের সহায় এইরূপ সুহৃদ্ জগতে কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? ঐশ্বর্য্যে কত ক্রূরাচারী বন্ধুনামধারী হইয়া আইসে; যেন প্রাণ মন দিয়া বন্ধুর সেবা করিতে সমুদ্যত

হয়; কিন্তু ঐশ্বর্য্য ফুরাইলে, গৌরব বিনষ্ট হইলে তাহারা সে বন্ধু ফেলিয়া পলায়ন করে, আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া স্বস্থানে গমন করে। এই তো জগৎ! কিন্তু যিনি প্রকৃত বন্ধু-নামের যাচা, স্বার্থপরতা তাঁহার হৃদয় হইতে অনেক অন্তরে অবস্থিত, তাঁহার হৃদ্রাজ্যে আত্মপর বিচার নাই, তিনি বন্ধুর জন্য প্রকৃত পক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারেন, আপনার সুখ সম্পদ ত্যাগ করিয়া বন্ধুর সঙ্গে ভিখারী হইতে পারেন। রামকান্তের বন্ধু যুটিয়াছে বটে; কিন্তু এ বন্ধু সে বন্ধু নহে। ইহারা অর্থ-সহচর বন্ধু—স্বার্থসিদ্ধি ইহাদের মনোভাব। রামকান্তের প্রকৃত বন্ধু দয়ারাম, এখন বিতাড়িত—রামকান্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তাই আজ তিনি অবমানিত হইয়া রাজ-সংসার হইতে বিভিন্ন স্থানে গত। অতুল রাজ-সম্পত্তি এখন বন্ধুনামধারী রামকান্তের ছদ্মবেশী শত্রুর হস্তে ন্যস্ত। তাহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া সম্পত্তির অপব্যয় করিতেছে।

দয়ারাম সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম্মনিষ্ঠ। অবমানিত হইয়া রাজ-ভবন হইতে বিতাড়িত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রতিপালকের অধঃপতন দেখিতে পারিলেন না। যাঁহার অন্নে তাঁহার মনুষ্যত্ব, কেমন করিয়া তিনি তাঁহার অধঃপতন দেখিবেন? রাজার নিকট হেয় হইয়া রাজসরকার হইতে ভিন্ন হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন রহিল অন্য দিকে—অবমানকারীর দূষিত চরিত্রের পবিত্রতা-সম্পাদন তাঁহার লক্ষ্য হইল।

ভ্রান্ত রামকান্ত কিন্তু তাহা জানিতে পারিলেন না। দয়া-রামকে দূরীকরণের পর হইতেই তিনি স্বাধীন হইলেন। কাণ্ড-জ্ঞান বাধা বিঘ্ন না থাকায় মনের সাধে ধনভাণ্ডার শূন্য করিতে

লাগিলেন। বর্ত্তমান বঙ্গে ধনি-সন্তানের এইরূপেই অধঃপতন হইতেছে।

রামকান্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকালে ভবানীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক ছিল না। পঞ্চদশ বর্ষবয়স্কা বালিকার আর কত বুদ্ধি হইতে পারে? রামকান্ত কর্ত্তৃক অবমানিত দয়ারামের রাজভবন পরিত্যাগ কালে, ভবানী, স্বামিসমীপে দয়ারামের প্রত্যাগমন সম্বন্ধে অনেক মিনতি করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "স্বামিন্! দয়ারামকে তাড়াইয়া দিবেন না। দয়ারাম আমাদের শত্রু নয় মিত্র। কোন্ শত্রু শত্রুর অধঃপতন দেখিতে না পারে? কোন শত্রু শত্রুর অর্থ-সংরক্ষণে সচেষ্টিত হয়? আপনি দেখুন, দয়ারামের মনোভাব আমাদের প্রতি শত্রুতা-আচরণ নহে—তিনি সর্ব্বদা আমাদের হিত-কামনায় নিযুক্ত। অতএব আপনি তাঁহাকে মিনতি করিয়া গৃহে আনয়ন করুন। তাঁহা দ্বারা আমাদের মঙ্গল ব্যতীত কখন অমঙ্গল হইবে না।" কিন্তু মত্ত রামকান্ত তখন তাঁহার সে কথা রক্ষা করেন নাই। বুদ্ধিমতী ভবানী মিত্র দয়ারামকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রামকান্তকে বহু আয়াসেও চিনাইতে পারেন নাই।

রাজসাহীর রাজবংশ উচ্ছৃঙ্খলপ্রায়! রামজীবনের বহুকষ্টসঞ্চিত রাজভাণ্ডার রামকান্তের হস্তে পড়িয়া উৎসন্নদশাপ্রাপ্ত! রামজীবন বীজ বপন করিয়া অঙ্কুর সময়ে বীজে উপযুক্ত জল সেচন করিয়া, অঙ্কুরোদ্গত অবনতোন্মুখ ক্ষুদ্র বৃক্ষে যষ্টি অবলম্বন দিয়া রাজসংসারের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। বৃক্ষ কীটদষ্ট হইয়া অকালে লয়প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। দয়ারামকে অবলম্বন করিয়া

রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণে সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু আজ যৌবনোন্মত্ত রামকান্ত পিতার লক্ষ্য ভুলিয়াছেন। অবিরত ভোগসুখাসক্ত নবীন যুবক অসদ্বন্ধু পাইয়া অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারে নিযুক্ত। তাঁহার রক্ষা-কর্ত্তা নাই—পালন-কর্ত্তা নাই, তিনি আজ আপন মনে পিতৃরোপিত বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিতে অভিলাষী। সুতরাং ক্রমে ধনভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিতে লাগিল।—পিতৃসঞ্চিত অর্থের বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমে তাহা বিলোপ পাইয়া আসিল। দিনে দিনে রামকান্তের অবনতি-পথের প্রশস্ততা হইল। রাজ-ভাণ্ডার নানাপ্রকারে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

রামকান্তের চৈতন্য-সম্পাদন দয়ারামের লক্ষ্য। রামকান্তের অধঃপতন অনিবার্য্য দেখিয়া সুবুদ্ধির গুণে তিনি ধীরে ধীরে সে লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য অন্যের নিকট গণনীয় হইতে না পারে; কিন্তু তাহা উদারভাবে পূর্ণ; তাহাতে কত কত মানব-চরিত্রের গূঢ়ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। তাহার বাহ্য শত্রুভাবের পরিচায়ক হইলেও, বন্ধুত্বের গূঢ়ত্ব তাহাতে বর্ত্তমান আছে।

এই সময়ে বঙ্গদেশ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর শাসনাধীন। অত্যাচার-করণ তাহাদের অঙ্গের ভূষণ। ধনী তাহার ভয়ে ধনের ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কুলকামিনীর পবিত্র কুল তাহাদের অত্যাচারে রক্ষা হওয়া বড়ই কঠিন ছিল। চতুর দয়ারাম, আলিবর্দ্দি চরিত্র বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে আলিবর্দ্দির দ্বারা রামকান্তের চরিত্র-সংস্কার নিশ্চই হয় তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। দয়ারাম

ানিতেন, দুঃখী না হইলে সুখীর সুখ অনুভব করা সুকঠিন। াস্ত রামকান্ত পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া কখনও দুঃখের মুখ দেখেন নাই—সর্ব্বদাই তিনি ঐশ্বর্য্যভোগে সুখী। সুতরাং াঁহাকে কথঞ্চিৎ দুঃখদানে শিক্ষাদান কর্ত্তব্য বলিয়া দয়ারামের াধ জন্মিল। রামকান্তের আর অধিক দুর্দ্দশা তিনি দেখি- লন না। অনুযোগে অভিযোগে আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক রামকান্তকে র্ব্বস্বান্ত—পথের ভিকারী করিয়া, তাঁহাকে কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত ইলেন। নবাব আলিবর্দ্দিকে দিয়া রামকান্তকে কষ্ট দেওয়া কন? রামকান্ত আপনার ধনের অপব্যয় করিয়া পথের ভকারী হউন না কেন? দয়ারাম যদি রামকান্তের মিত্রই ন, তবে তাঁহাকে এত শীঘ্র সর্ব্বস্বান্ত করিতে ইচ্ছুক কেন? প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। ভ্রান্ত আমরা, তাহার গূঢ়ত্ব কি ঝব? দয়ারাম দেখিলেন, রামকান্তের সম্পত্তি তাঁহাকর্ত্তৃক গবিলাসে অপব্যয়িত হইয়া তিনি ভিকারী হইলে, আজী- ন ভিক্ষাবৃত্তিই তাঁহার অবলম্বন হইবে, তাঁহার পুত্র পৌত্রা- কেও পিতার ন্যায় ভিক্ষুক হইতে হইবে। কিন্তু যদি াহাকে ইহা হইতে বিভিন্ন রাখিয়া ক্ষণকালের জন্য অপরের স্ত রাজ্যভার ন্যস্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বিকৃত চরিত্রের কৃতিস্থ হওয়া অসম্ভবপর নহে। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া রাজ্য নঃপ্রাপ্ত হইলে আর রাজ্য কখনও বিপ্লবময় হইবে না। তুল ঐশ্বর্য্য অপব্যয়ে ব্যয়িত না হইয়া রামকান্তের বংশধরগণ চিত্ত ভোগ করিতে পাইবে। সুতরাং আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক মকান্তের চরিত্র-দোষ নিবারণ করা কর্ত্তব্য ইহাই দয়ারাম র করিলেন।

ক্রমে দয়ারামের বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল। আলিবর্দ্দি খাঁর দ্বারা দয়ারাম অভীষ্ট-সিদ্ধির সুবিধা পাইলেন। তিনি আলিবর্দ্দি সমীপে বলিলেন, "রাজসাহীর রাজভাণ্ডার অর্থ-পরিপূর্ণ। অথচ রাজা রামকান্ত আপনাদের প্রাপ্য কর প্রদান না করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছেন। সুতরাং আপনি রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎস্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করুন।" দয়ারামের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, অর্থলোলুপ আলিবর্দ্দি এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন আশার লহরে নাচিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, রাজ্য কিছুদিন লোকের মন প্রবোধের জন্য অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া, পরে আবার তাহা যবনরাজ্যভুক্ত করিয়া লইব। আপাততঃ অন্য এক জনকে নামমাত্র রাজোপাধি প্রদান করিয়া রাজ্য রামকান্তের শাসনচ্যুত করা তাঁহার অভিপ্রেত হইল। দয়ারামের কথাক্রমে আলিবর্দ্দি ত্বরায় তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। নিদ্রিত ব্যাঘ্র শব্দ শ্রবণে জাগিয়া উঠিল—শীকারের অনুসরণে তদভিমুখে ধাবিত হইল। সৈন্যদল পাঠাইয়া আলিবর্দ্দি রামকান্তের রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। বলপ্রদর্শন পূর্ব্বক অকারণে অন্যায়রূপে রামকান্তকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, দয়ারামের অভিলাষক্রমে লোকের মন বুঝাইবার জন্য, দেবীপ্রসাদ রায় নামে ঐ বংশীয় এক ব্যক্তি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

নবাবের আজ্ঞাক্রমে বিনাদোষে রামকান্তের জমীদারী অন্য এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইল। সস্ত্রীক রামকান্ত গৃহত্যাগী হইয়া জগৎশেঠের শরণ লইলেন। রাজা রামকান্ত এখন পরা

শ্রিত—নবাবের ধনরক্ষক জগৎশেঠের শরণাগত। চরিত্র-দোষে রাজ্যেশ্বর আজ পথের ভিখারী। ভ্রান্ত মানব এইরূপেই অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

দয়ারামের মনোভাব রামকান্তকে শিক্ষাদান—অনর্থক কষ্টদান নহে। তাঁহার শিক্ষা লাভ হইলে, হিতাহিত জ্ঞান জন্মিলে আবার নবাব-সরকার হইতে তাঁহাকে রাজ্য পুনঃপ্রদান করিবেন এই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। কালে তাহাই হইল। দুঃসহ গ্রাসাচ্ছাদন-ক্লেশ রামকান্তকে ব্যথিত করিল। রাজরাণী ভবানী স্বামিসহ দুঃখ-সাগরে ভাসমানা, এ কষ্ট তাঁহারও অসহ্য হইল। সুপরামর্শদানে তিনি স্বামীর মন ফিরাইলেন, চির-সুহৃদ্ সেই দয়ারাম-সহ পুনঃ সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপনে রামকান্তকে উৎসাহিত করিলেন। রামকান্ত এবার কি করিবেন? প্রাণের দায়ে, যাতনার কঠিন পীড়নে, দয়ারামের শরণ লইলেন। দয়াবান্ দয়ারামের উদ্দেশ্য সফল হইল। রামকান্ত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি আবার সুকৌশলে পিতৃরাজ্য রামকান্তকে পুনরর্পণ করিলেন।

রাজ্যের পুনরর্পণ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গল্প আছে। গল্পটি পাঠে ভবানীর পবিত্র চরিত্রের পবিত্রতা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইতে পারিবে, এই আশায় তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল। অর্থের অপূর্ব্ব মহিমা! অর্থে রাজাকে রাজ্যচ্যুত—ভিখারী করিতে পারা যায়, আবার সামান্য ভিখারীও সার্ব্বভৌম রাজা হইতে পারে। দয়ারাম কর্ত্তৃক রামকান্তের রাজ্যচ্যুতি ও রাজ্যপ্রাপ্তি সকলই অর্থের লীলা। দয়ারাম অর্থলোভ প্রদর্শনে আলিবর্দ্দিকে রামকান্তের রাজ্য গ্রহণে উৎসাহিত

পার্থিব জীবনের সুমহৎ দায়িত্ব তাঁহার বোধগম্য হইল। তিনি জানিলেন যে, ছদ্মবেশধারী, বাহ্য উপকারী স্বার্থপবদল কখনও মিত্র নামের বাচ্য নহে। মিত্র-হৃদয় বাহ্য আত্মীয়তা দেখায় না। তাহা আড়ম্বরশূন্য ধীর প্রবাহপূর্ণ—সতত ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃশিলা বহিয়া থাকে। তিনি বুঝিলেন যে, তিনি যাহাদের মিত্রজ্ঞানে প্রাণমন দিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার মিত্র নহে—মিত্র-বেশধারী কপট শত্রু; আর দয়াবান্ দয়ারাম, যাহাকে তিনি গর্ব্বভরে রাজসংসার হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার মিত্র—সংসার-মরুর একমাত্র পরিচালক। শিক্ষা প্রাপ্তির পরই তিনি দয়ারামকে চিনিলেন। তদবধি দয়ারাম তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ ও পরামর্শের পাত্র হইলেন। রাজ্য মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল। রাজকার্য্যও পূর্ব্বের ন্যায় সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত হইতে লাগিল।

রাজা রামকান্ত ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে (১১৬৩ সালে) পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি প্রায় ১৬ বৎসর কাল রাজ্যভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না। বহু পূর্ব্বে ভবানীর গর্ভে তাঁহার দুইটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা উভয়েই কৌমার কালে কালকবলে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং রামকান্তের মৃত্যুর পর তদীয় রাজসিংহাসন শূন্য হইল। দয়ারামের মন্ত্রণায় ভবানী রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। অবলা হিন্দুরমণী যবনরাজ্যে "রাণী ভবানী" নামে বিখ্যাত হইলেন। রাজসিংহাসন প্রাপ্তিকালে ভবানীর বয়ঃক্রম প্রায় ৩২ বৎসর হইয়াছিল। ৩২ বৎসর বয়সে সুকঠিন রাজ্যশাসন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রায় ৪৭ বর্ষ কাল সুনিয়মে

সুযশের সহিত ভবানী রাজ্যশাসন করেন। এ অধঃপতিত বাঙ্গালী-রমণীর পক্ষে ইহা বড় অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

রাজ্য-শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভবানীকে অনেক বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। রাজ্য বিপ্লবময়। রাজ্যমধ্যে ইংরাজ-মুসলমানে বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত। দিন দিন মুসলমান-গর্ব্ব খর্ব্ব-প্রায় আর ইংরাজ-গৌরব পরিবর্দ্ধনশীল। রাজ্যের এ হেন বিপ্লবকালে অবলা বাঙ্গালী-রমণী রাণী ভবানীর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত। বঙ্গ আলিবর্দ্দির দৌহিত্র দুরন্ত সিরাজের শাসনাধীন। সিরাজ পাপের অবতার, তাহার চরিত্রে নরক দৃশ্য দৃশ্যমান। সিরাজ হেন দুরন্ত শাসনকর্ত্তার অধীনে, রাজ্যলোলুপ ধূর্ত্ত ইংরাজের সম্মুখে, বাঙ্গালী-রমণীর রাজ্যশাসন কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহজে অনুমেয়! রাণী ভবানীর তারা নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। খাজুরানিবাসী রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত তারার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই তারা বিধবা হন। তারার রূপলাবণ্য সুবিখ্যাত ছিল। সিরাজ-অত্যাচারে রূপবতীর সতীত্ব সংরক্ষণ সহজ ছিল না। দুরন্ত প্রলোভনে কিম্বা বলপূর্ব্বক, সহজে না হইলে সৈন্য প্রেরণেও সুন্দরী রমণীগণকে বন্দী করিয়া আনিত। রাজকন্যা তারার রূপরাশির প্রশংসাবাদ শুনিয়া দুরাচারের দুরাকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি পাইল। তারাকে আপনার জীবনতোষিণী করিতে দুর্দ্দান্তের ইচ্ছা হইল। দুরন্ত সিরাজ প্রথমে কৌশলে অর্থাদিদানে বাসনার পরিতৃপ্তি করিতে সম্যক্ প্রয়াস পাইল। ভবানীকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া তারাকে হস্তগত করিতে সচেষ্টিত হইল। কিন্তু সকলই বিফল। অর্থ-বিনিময়ে অন্য জাতির কুলললনার

কুলবিনিময় হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু সতীপ্রধান বঙ্গাঙ্গনার সতীত্ব, অর্থে বিনিময় হইতে পারে না. স্বর্গীয় বস্তু প্রদান করিলেও তাহার মূল্য হয় না—তাহা অমূল্য। ভবানী অর্থের প্রলোভনে ভুলিলেন না। বরং গলদসৎকারে সিরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "যদিও হিন্দুগর্ব্ব থর্কপ্রায়—যদিও হিন্দু আজি উৎসন্ন-দশাগ্রস্ত, তথাপি সিরাজ কেন পাপিষ্ঠেরা তাহাদের পদদলিত হইবারও যোগ্য নহে। তাহাদের পাপমুখের পাপকথা হিন্দুর নিকট অশ্রাব্য—নরক-কীট-দষ্টের আর্ত্তনাদের ন্যায়।

ভবানীর এ বাক্যে সিরাজ-হৃদয় ব্যথিত হইল। গর্ভবতীর গর্ভ ভেদ করিয়া গর্ভকোষস্থিত সন্তান দর্শন করিতে যে পাপিষ্ঠের পাপ-হৃদয় ব্যথিত হয় না; অকারণে বক্ষে প্রস্তর চাপনে, জীবন্ত দেহ গভীর জলে নিক্ষেপ করিতে যে হৃদয় কুণ্ঠিত নহে; বায়ুবিতাড়িত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কঠোর চাপনে, কঠিন পীড়নে, গভীর আর্ত্তনাদে শত লোকের মৃত্যু দেখিয়াও যে হৃদয়ের কাঠিন্য দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারে, আজ সামান্যা রমণীর শৌর্য্যে সে হৃদয় ব্যথিত। বাঙ্গালী-রমণীর ইহা বড় অল্প গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু দুবৃর্ত্ত সিরাজ স্থির রহিল না। শ্লাঘা নিবারণে, বাসনার সম্পূর্ণ সংসাধনে তাহার হৃদয় মন উত্তেজিত হইল। অবমাননার প্রতিশোধ প্রদানে, অভিলষিত তারাহরণে দুরন্ত সিরাজ রাজসাহীর রাজ-ভবনে সৈন্যদল প্রেরণ করিল। ভবানীকে বন্দিনী করিয়া অপমানের প্রতিশোধ দান এবং তারাকে হরণ করিয়া দুরাচারের দুরাকাঙ্ক্ষা পূরণ সৈন্যদলের অভিপ্রেত হইল। নবাবের আজ্ঞাক্রমে তাহারা রাজসাহীর রাজভবন উদ্দেশে তদভিমুখে গমন করিল।

কি ভীষণ বাণী! বঙ্গাঙ্গনা ভবানীর প্রতি বঙ্গাধিপ সিরা-জের আক্রোশ! শুনিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠে!—দেহ মন অবসন্ন হয়! আমরা, ভীরু দস্যু দেখিয়া কাঁদিতে পারি; গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া, দাসবেশে সে চরণ সেবা করিতেও পশ্চাৎপদ নহি; কিন্তু ভবানীরাজ্যে দস্যু-উপদ্রব প্রশ্রয় পাইল না। তিনি সিরাজের পাপ-সৈন্যের ভয় পাইলেন না। দস্যুদলকে উপযুক্ত শিক্ষাদান তাঁহার অভিপ্রেত হইল। "আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর কুল-কামিনী, আর দুর্দ্দান্ত সিরাজ দস্যু-দলের শিরোমণি" এই ভাবিয়া ভবানী-হৃদয় অবসন্ন হইল না। দুরাচারীর পাপকথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মে ব্যথা দিয়াছে, পবিত্রকুলে কলঙ্ক-অঙ্কন-কামনা তাঁহার হৃদয় দিবা-নিশি দহন করিতেছে, দুরাচারের অত্যাচারে প্রজাকুলের ক্রন্দন তাঁহার মর্ম্মভেদী হইয়াছে, সুতরাং রাণী ভবানী সিরাজ-সৈন্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন।

বিস্ময়ের কথা—আশ্চর্য্যের দৃষ্টান্ত! আজ কাঙ্গালিনী বঙ্গ-নারী রাজ-প্রতিকূলে দণ্ডায়মানা। গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া, পাপীর দণ্ডবিধানে, সতীত্বের সংরক্ষণে সমুদ্যতা। বাঙ্গালী পুরুষ কখনও যাহা পারে নাই—সপ্তদশ জন যুদ্ধার্থী যবন-সৈন্যে যে জীবন সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিল; রাজ্য ছাড়িয়া, ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া যে হিন্দু রাজা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন; সেই বংশসম্ভূতা রাণী ভবানী আজ যবন-সৈন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিনী! যাহা হউক, ভবানীকে কিন্তু স্বয়ং যুদ্ধে সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে হইল না। ধাত্রী, পালনকর্ত্রী, মাতার উত্তেজনায় সমগ্র রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। ভবানীর শত সহস্র প্রজা-সৈন্য সিরাজের বিদ্রো-

হিতা অবলম্বন করিল—বিদ্রোহিদিগের যবন-সৈন্যের সম্মুখীন হইল।

ভবানীর আজ্ঞায় সমগ্র রাজ্য একতাসূত্রে আবদ্ধ হইল। হলকর্ষণোদ্যত কৃষককুল দূরে হল ফেলিয়া বংশযষ্টি হস্তে আক্রমণকারী রাজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে ছুটিল। রাজ্ঞীর অন্নে প্রতিপালিত ভৃত্যগণ গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া করে তীক্ষ্ণ ভল্ল এবং তরবারি লইয়া, যবনের প্রতিযোগিতা অবলম্বন করিল। শিখগুরু গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্র যে জাতির জাতীয়তার সম্যক্ পরিস্ফুরণ করিতে পারে নাই; নগরে, নগরে, পর্ব্বতে কন্দরে তূর্য্যনিনাদে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র গাহিয়াও যে শিবজী সম্যক্‌রূপে ভারত মাতাইতে পারেন নাই, আজ সামান্যা ভবানীর শৌর্য্যে সেই ভারতের পতিত বঙ্গদেশ মাতিয়াছে। কি আশ্চর্য্যের কথা! সামান্য বঙ্গের ক্ষুদ্র প্রদেশ একতাসূত্রে সংগ্রথিত দেখিয়া সিরাজ-সৈন্যের গতি ফিরিল। অসহ্য অত্যাচারে সমগ্র রাজ্য ক্ষেপিয়াছে, পার্থিব বাসনা ত্যাগ করিয়া ভীরু বাঙ্গালী যুদ্ধার্থী হইয়াছে দেখিয়া, নবাব-সৈন্য পশ্চাৎপদ হইল। যুদ্ধ করিল না, যুদ্ধার্থী যবন পলাইল। সামান্যা বাঙ্গালী রমণীর লোকাতীত বিক্রমে, আশাতীত বীরত্বে যবন আজ পরাজিত!—পলায়িত! দুরাচারের দুরাশা মিটিল না।

আজ যাহা বিস্ময়কর, স্বপ্নবৎ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া পরিগণিত, রাণী ভবানী প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর আজ যাহা কল্পনায় আসে না, মনে ধারণা হয় না, শতাব্দী পূর্ব্বে সামান্যা নারীর দ্বারা বঙ্গে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু আজ তাঁহার নিদর্শনমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। শত-বর্ষের পরিবর্ত্তনে বঙ্গের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এ বঙ্গ আর যেন সে বঙ্গ নহে। সুকঠিন লৌহ বজ্র যেন এখন সুকোমল নবনীত আকার ধারণ করিয়াছে। প্রস্তর-বিনির্ম্মিত অটল অচল এখন যেন আর্দ্র কর্দ্দমময় হইয়াছে। এখন আর বঙ্গে সে মনুষ্য নাই, সে শৌর্য্য নাই—বঙ্গ এখন শ্মশান! প্রকৃত মানব-শূন্য, মৃত কঙ্কালপূর্ণ শ্মশান!

রাণী ভবানী ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। সকল পুণ্যানুষ্ঠানের মধ্যে দান তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠান ছিল। দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, অন্নদানে অন্নের ভিকারীর, বস্ত্র দানে বসন-হীনের, আর জল দানে তৃষাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ, যে জীবনের প্রধান কার্য্য, এ জগতে তিনিই ধন্য। ধর্ম্মাত্মা ঈশার জীবনে লৌহ-ক্রুশে আত্মদান, স্বহস্তে কর্ণের পুত্র-মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ব্রাহ্মণ সেবায় অর্পণ, সর্ব্বস্ব দানে বলির ভিখারী বেশগ্রহণ, জগৎপটে আজিও পরিদৃশ্যমান। ভবানী সেই দাতাদিগের অগ্রণী। দরিদ্রের দুঃখ তাঁহার সহ্য হইত না। প্রাণ যেন তাঁহার দরিদ্র-দুঃখে কাঁদিত। ধর্ম্ম তাঁহার দরিদ্রের দুঃখ-নিবারণ; কর্ম্ম দরিদ্রে দান। স্বহস্তে সকল দান অসম্ভব। তাই রাণী ভবানী কর্ম্মচারিগণের উপর ১০০, এক শত টাকা পর্য্যন্ত দানের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারিগণ পদবী অনু-সারে কেহ এক টাকা, কেহ পাঁচ টাকা, কেহ দশ টাকা, কেহ বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত দান করিতে পারিবে, এই তাঁহার নিয়ম ছিল।

জগতে ধনী বিস্তর, কিন্তু কই, কয় জন ধনী ধনের প্রকৃত

ব্যবহার জানেন? ধনবানের লক্ষ্য আপনার সুখের দিকে, আমোদের প্রতি। ধনবানের ধন শৌণ্ডিক পাইবে, বেশ্যা; ধনবানের ধনে ধনী হইবে—এই তো জগতের নিয়ম। কয় জনের হৃদয় কাঙ্গালের জন্য কাঁদে? কাঙ্গাল অনাহারে মৃতপ্রায়, তাহাতে কয় জনের দৃষ্টি পড়ে? কিন্তু কাঙ্গালের প্রতি ভবানীর দৃষ্টি ছিল। তাঁহার রাজ্যে অন্নাভাবে অনাহারে, বৈদ্যাভাবে অচিকিৎসায়, জলাভাবে দারুণ বৈশাখীয় গ্রীষ্মে কিম্বা বস্ত্রাভাবে পৌষের প্রচণ্ড শীতে কাহারও মৃত্যু হইতে পারিত না। অন্ন দানের জন্য গ্রামে গ্রামে বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, সুচিকিৎসার জন্য সুচিকিৎসকসঙ্গে সুপথ্য লইয়া ভৃত্যগণ সতত প্রজাবর্গের গৃহে গৃহে ফিরিত। জল-শূন্য গ্রামে জলাশয় খনন, বসন-হীনে বস্ত্র দান রাণী ভবানীর জীবনের মহাব্রত। দরিদ্রের সংসারে অবিবাহিতা কুলকামিনীর বিবাহে তিনি বিস্তর টাকা দান করিতেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালের সময় হইতে কৌলিন্য-প্রথা প্রচলন অবধি এ দেশের সকলকেই কন্যা-দায়-গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্ব দান করিয়া কত পিতা পথের ভিখারী হইয়াছেন। রাণী ভবানীর নিকট কন্যা দায়-গ্রস্ত ব্যক্তি আপনার অভাব জানাইলে তিনি প্রাণপণে তাহা পূরণ করিতেন। অর্থ সাহায্যে, বস্ত্র দানে, অলঙ্কার দানে, তিনি কন্যার বিবাহ দেওয়াইতেন। পূর্ব্বে মুসলমানগণ অত্যাচার করিয়া অনেক লোকের গৃহাদি ভগ্ন করিয়া গৃহ-স্বামীকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিত। সেই সকল লোক ভবানীর শরণ লইলে রাণী তাহাদিগকে স্বরাজ্য মধ্যে বাসোপযোগী নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। গৃহাদিও নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন। আজি পর্য্যন্তও রাণী

ভবানীর দানের নিদর্শন, রঙ্গপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, যশো-হর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং কাশী প্রভৃতি প্রদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকল জাতীয় লোক আজি পর্য্যন্তও ঐ সকল দেশে অন্যূন পাঁচ লক্ষ বিঘা নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছে।

দানের কারণ কাশীতে অন্নপূর্ণা এবং ভবানীতে প্রভেদ ছিল না। প্রতিদিন অন্নপূর্ণা-মন্দিরে অসংখ্য দরিদ্রকে অন্ন দান, কাশীর পঞ্চক্রোশ মধ্যে তৃষ্ণাতুরকে পানীয়, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্যদ্রব্য, শ্রান্তকে শান্তিগৃহ দানে ভবানী কাশীতে দেবী নামে পূজিতা। শরণাগত শত্রুর উদ্ধারেও ভবানী প্রাণ দানে স্বীকৃতা ছিলেন। শরণাগত শত্রুরও উপকারে পরাঙ্মুখ নহেন, এমন হৃদয়বান্ ব্যক্তি জগতে কয় জন বিদ্যমান? টিকারীর রাজা রাণী ভবানীর সহিত শত্রুতা আচরণ করিয়াছিলেন। ভবানী গয়ায় গমনকালে টিকারীর রাজা তাঁহাকে পিতৃপুরুষের পিণ্ড-দানে বাধা দিয়াছিলেন। হিন্দুর পবিত্র কার্য্যে হিন্দু কর্ত্তৃক বাধা দান রাণী ভবানীর মর্ম্মভেদী হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐ রাজা আবার যখন রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া যবন-কারা-গারে বন্দী হন, তখন কে তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়াছিল? ভারতে শত শত ঐশ্বর্য্যশালী মিত্র-রাজা থাকিতে কই কয় জন টিকারীর রাজার মুক্তিকল্পে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন? রাণী ভবানী ত তাঁহার শত্রু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শরণাগতের উপ-কার করণে রাণী ভবানী নিবৃত্ত থাকিতে পারিলেন না। আপনি সমস্ত রাজস্ব প্রদান করিয়া টিকারীর রাজার মুক্তি দান করিলেন।

ভবানী একবার মুখ ফুটিয়া যাহা বলিতেন, কখনও তাহার

অন্যথা হইত না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, একমাত্র দান মনুষ্যের পরিত্রাণের উপায়—মোক্ষ লাভের পথ। ভবানী জানিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে যত কিছু পুণ্যকর্ম্ম আছে, দরিদ্রে অন্নবস্ত্রাদি দানে, তাহাদের অভাব পূরণই তন্মধ্যে মনুষ্যের একমাত্র কর্ম্ম। তিনি মনুষ্য ছিলেন, কিন্তু কেবল নিজের উদর-পূরণ তাঁহার কার্য্য ছিল না, অগ্রে অন্যের উদর পূরণ করিয়া দিয়া পরে তিনি স্বয়ং আহার করিতেন। দান করিয়া তিনি রাজভাণ্ডার শূন্য করিয়াছিলেন। বলিতে কি, অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া তিনি দান করিয়া গিয়াছেন।

ভবানী বিশেষ বিদ্যাবতী না হইলেও বিদ্যার গৌরব জানিতেন। বিদ্যার উন্নতি কল্পেও তিনি অনেক স্থানে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। জীবিতাবস্থায় বৎসর বৎসর তিনি প্রায় ২০।২৫ সহস্র টাকা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদগকে দান করিতেন। এতদ্ভিন্ন কোম্পানির হস্তে কয়েক লক্ষ টাকা ছাত্রবৃত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাবধি ঐ সকল টাকার সুদ হইতে অনেক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে।

রাণী ভবানী হিন্দু ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। দানে লক্ষ্য রাখিয়া, দরিদ্রের ভরণপোষণ ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তিনি সর্ব্বদা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রতাদিতে নিযুক্ত হইতেন। পার্থিব সুখে অবহেলা করিয়া, বিলাসিতা বা ব্যসনাদি হইতে দূরে থাকিয়া, তিনি সতত ঈশ্বরে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি যখন যে কার্য্য করিতেন, শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, সর্ব্বদা হরির মধুমাখা নাম জপ করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

ভবানীর অন্তিম জীবন রাজসাহীতে অতিবাহিত হয় নাই। রাজসাহী গঙ্গাহীন স্থান—পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পুণ্যময় প্রবাহ রাজসাহী স্পর্শ করে নাই; তাই ভবানী অন্তিম জীবনে ভাগীরথী-তীরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম জীবন মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ভাগীরথী-তট-স্থিত বড়নগর নামক স্থানে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বৈধব্য দশায়, বার্দ্ধক্যাবস্থায়, মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে একটি পোষাপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; জামাতার মৃত্যুর পর, রামজীবনের বংশ বংশধর অভাবে বিলোপ পাইবার কালে ভবানী ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার পোষাপুত্রের নাম রামকৃষ্ণ রায়। রামকৃষ্ণের হস্তে রাজসাহীর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, মায়াময় সংসারের মায়াপাশ কর্ত্তন করতঃ ভবানী বড়নগরে গঙ্গাতীরে সতত দেবারাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সুকঠিন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া, ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রমে রাণী ভবানী পরলোক প্রাপ্ত হন। ধাম্মিকার ন্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে (১২১০ সালে) ভবানীর মৃত্যু হয়।

ভবানী সময়ের সুব্যবহার করিতে জানিতেন। আমরা কার্য্যের কাঠিন্য অনুভব করিয়া যেরূপ "আর সময় নাই, এ কার্য্য হইবে না" বলিয়া নিস্তব্ধ থাকি, ভবানী তাহা থাকিতেন না। তিনি জানিতেন যে, জগতে সময় অপেক্ষা কার্য্য অধিক নহে; মনুষ্যকে যত কঠিন কার্য্যই সমাধা করিতে হউক না কেন, সময়ের অসঙ্কুলন বশতঃ যে, সে কার্য্যের সমাধানে প্রতিবন্ধক ঘটে, ভবানী তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জানিতেন যে, কার্য্যের কঠিনত্ব অলসেরাই অনুভব করিয়া থাকে, পরি-

শ্রমী, অধ্যবসায়ী—কথনই সম[illegible]য় দিয়া নিশ্চিন্ত থা[illegible] না। তাই তিনি আলস্যে বঙ্গাঙ্গনার ন্যায় আমোদ-প্রমো উপকথায় সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন ন তাঁহার জীবন সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে, মহত্ত্বের অনুসর অতিবাহিত হইত। তিনি দিনের অংশ করিয়া রাখিয়াছিলে এক এক অংশে এক একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইব বলিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সময়ে সদ্ব্যবহারে অসামুষোচিত পরিশ্রম দর্শনে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন কথা বলিলে, ভবানী উত্তর করিতেন, "পৃথিবীতে জন্মি য়াছি কি জন্য?—মনুষ্য জন্মে মনুষ্য নামের বাচ্য হইতে কিন্তু মনুষ্য নাম কিরূপে পাওয়া যায়? পরিশ্রমই মনুষ্য নামে প্রবর্ত্তক, স্রষ্টা; আলস্য মনুষ্যত্বের অপচায়ক। মনুষ্য জন্মে আলস্যে মনুষ্যত্ব নষ্ট করা কি কর্ত্তব্য? কথনই না। জগতে যে যত পরিশ্রম করিবে, সে তত উন্নত হইবে—এজগতে তাহার নাম তত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে। তবে শ্রম করিব না কেন? তোমরাও সুপরিশ্রমে সময় অতিবাহিত কর, জগতে মহৎ হইবে। অন্নের জন্য তোমাদিগকে অন্যের দাস হইতে হইবে না, তোমরাও কত লোককে অন্নদান করিতে পারিবে।

রাণী ভবানীর বেশ ভূষার পারিপাট্য ছিল না। তিনি রাজরাণী হইলেও গরিবের বেশে, গরিবের ভাবে দিন কাটা-ইতেন। বঙ্গের অনাথিনী বিধবাগণের ন্যায় তাঁহারও পরি-ধেয় পরিধান সামান্য ছিল। বেশ ভূষার পারিপাট্য বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাব পরিবর্ত্তন হইতে পারে, বেশ ভূষার সঙ্গে সঙ্গে ভোগবিলাসিতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতে পারে,

এই ভাবিয়া ভবানী বেশ ভূষার পারিপাট্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। যাহাদের মন ঈশ্বরে ন্যস্ত, সতত যাহারা ঈশ্বরের সেবায় ব্যস্ত, তাহারা আর বেশ ভূষার পারিপাট্য লইয়া কি করিবে? বেশ ভূষায় ভ্রান্ত মানবের নিকট মহত্ব প্রকাশ পাইতে পারে, বেশ ভূষার পারিপাট্য দর্শনে মানব-মন বিমোহিত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট তো বেশ ভূষার পারিপাট্য আবশ্যক করে না!—সেখানে যে হৃদয়ের পারিপাট্য আবশ্যক! সুতরাং ভবানী আর বেশ ভূষা লইয়া কি করিবেন? জগৎ যাহাতে ভুলিয়া আছে, ভবানী তাহাতে ভুলেন নাই। ভবানী সামান্য বেশে সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ডাকিতেন।

ভবানী সময় তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এক ভাগে ঐশ্বরিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, দ্বিতীয় ভাগ দীনে অন্নাদি দানে অতিবাহিত হইত, আর অবশিষ্ট এক ভাগ সময়ে আপনার আহারাদিতে ও রাজকীয় সমগ্র কার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। সন্ধ্যার পর ভবানীর একটি ক্ষুদ্র সভা হইত। সভায় প্রজাবর্গের আবেদনাদি শ্রবণ করিয়া রাণী ভবানী তাহার বিচারাদি করিতেন। ঐ সভায় প্রজাবর্গের সুখ দুঃখের কথা ও তাহাদের প্রতি রাজ-কর্ম্মচারিগণের সুব্যবহার কুব্যবহারের বিষয় সম্যক্ সমালোচনা হইত। রাণী ভবানী সভায় আলোচ্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রবণ করিয়া তাহার যথাযথ মীমাংসা করিতেন।

পরিবারবর্গের চরিত্রের উপর রাণী ভবানীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহাতে পরিবারবর্গ কুপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত না করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে, কর্ত্তব্যের অনুশোচনায় দিন অতিবাহিত

করেন, রাণী ভবানী তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। পৌরগণ কি প্রকারে—সৎকার্য্যে, কি কুকার্য্যে দিন যপন করিতেছেন, তিনি সর্ব্বদা তাহা দেখিতেন। তিনি জানিতেন যে, পৌরগণের চরিত্রের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি না রাখিলে সে চরিত্র দূষিত হইতে পারে; অভিভাবক যদি অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে সৎশিক্ষাদান কর্ত্তব্য-জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার অধীনস্থ পরিবারগণের চরিত্রে দোষ-সঙ্ঘটন সম্ভাবনা। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সে সকল চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখিলে, তাঁহাদিগকে সৎপথে গমন করিতে শিক্ষাদান করিলে, পরে সে চরিত্র আদর্শ-চরিত্রে পরিণত হইতে পারে। ভবানী তাই পৌরগণের সৎ-শিক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। আপনার সহস্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ইহাকেও একটি মহৎ কর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, প্রত্যহ অন্ততঃ এক একবার করিয়াও পৌরগণ কে কি ভাবে আছেন, তাহা তিনি দেখিতেন।

ভবানী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক বিগ্রহমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন; তাহার কথঞ্চিৎ নিদর্শন অদ্যাবধি ভারতের নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। রাজসাহী, বড়নগর, গয়া ও কাশীধামে তাঁহার স্থাপিত অনেক দেবমন্দির ও তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভবানীর সংস্থাপিত রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, দণ্ডপাণি ও বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি বিগ্রহ মূর্ত্তি সমূহ আজিও কাশীতে বর্ত্তমান আছে। ভবানী কাশীর মধ্যে আর একটি বড় পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন। যে সকল অনাথ দীনদুঃখী সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে জীবন যাপন করিত, রাণী ভবানী কাশীতে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

রের আবাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ভবানী ঐ
ন লোকের বাসস্থানের জন্য অন্যূন তিন শত বাটী প্রস্তুত
য়া দিয়াছিলেন, এবং দরিদ্র ব্যক্তিগণের কাশীবাস কালে,
নি তাহাদিগকে আহারাদি দানেরও বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া
য়াছিলেন।

ভবানী দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়সে পতিহীনা হইয়া প্রায় ৪৭ বর্ষকাল
জ্যভোগ করতঃ পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরলোক-
প্তির পূর্ব্ব হইতেই রাজ্য পোষ্যপুত্রের হস্তে পতিত হয়।
মকৃষ্ণও মাতার ন্যায় তাপস ছিলেন; তিনি কয়েক বর্ষ
ত্র রাজ্যভোগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতঃ রাজ্যত্যাগী
। তদবধি রাজসাহীর রাজভবন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।
ধুনা তাহার আর বিশেষ কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।
রাজ-রাজ্যে আজ সে সংসার ভিন্ন ভিন্ন সংসারে বিভক্ত হইয়া
শৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কীর্ত্তিই মানবকে জীবিত রাখে। ভবানী আজ দেবলোকে,
স্তু তাঁহার কীর্ত্তির প্রভাবে বোধ হইতেছে,তিনি যেন এখনও
মুখে বর্ত্তমান। বোধ হইতেছে, যেন লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের
ন্নকর্ত্রী, সেই অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা আজিও নয়নপথে আপ-
তা। তাঁহার কার্য্য স্মরণ-পথে উদিত হইলে মনে হইতেছে,
ন দরিদ্রের আর ভয় নাই, ওই তাহাদের অন্নদাত্রী জননী
বার আসিয়া ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়
অধঃপতিত বঙ্গে ভবানীমায়ের আদর নাই; লোকে ভবানী-
য়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে না, কিন্তু অন্য দেশ হইলে কবির
খনী ভবানী-গুণ গাহিত; লোকে বিহঙ্গমকে ভবানীর নাম

গাহিতে শিক্ষা দিত; রাণী ভবানীর নামে দেশে অনাথবাস সংস্থাপিত হইত। কিন্তু এ পোড়া বঙ্গে তাহার কিছুই নাই। বঙ্গদেশ গুণের গৌরব জানে না, মহত্ত্বের পূজা করে না। বঙ্গের তাই আজ এই দুর্দ্দশা! তাই বঙ্গ আজ সকল কার্য্যেই পর-মুখাপেক্ষী!!

শূর-সুন্দরী পদ্মিনী।

ভীমসিংহ আজ বন্দী! বিশ্বাসঘাতক দুরাচার যবনের সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ! মিত্রজ্ঞানে শত্রুর কৌশল-জালে বিজড়িত! কপট অতিথিবেশে অভ্যাগত তক্ষকের বিষময় বিষম দংষ্ট্রাগ্রে আপতিত। অতিথি কদাচারী শত্রু হইলেও দেব রাজপুতের অনুগ্রহের পাত্র। তাই সেই অতিথিবেশধারী দুরন্ত যবন, দাসত্ব স্বীকার করিয়া, শিষ্টাচার প্রদর্শনের ভান করিয়া, শেষে কৌশলে, কপটাচরণে ভীমসিংহকে বন্দী করিল। যাঁহার কারণ স্বচ্ছ মুকুরে, স্থির নেত্রে প্রতিমার মোহিনী প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন; নিঃসঙ্কোচে অসূর্য্যম্পশ্যারূপা, অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু-রমণীর রমণীয় প্রতিকৃতির মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; ভাগ্যবলে, অতিথিবেশে অনায়াসে, দেবের অগম্য রাজভবনে প্রবেশ করিতে পাইলেন; হৃদয়ের বলবতী আশার তৃষা যাঁহার কারণ কতক পরিমাণে নিবৃত্ত হইল; সেই দেবতুল্য দেবের বন্দিভাব! সম্রাট বলিয়া—ভারতের একচ্ছত্রী রাজা বলিয়া—ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গরীয়ান্, ধনমদে প্রমত্ত, দৈববলে বলীয়ান্, তাই বলিয়া দুর্ব্বলের প্রতি এত অত্যাচার! "পদ্মিনীকে না পাইলে ভীমসিংহকে মুক্তি প্রদান করিব না।" তাহার পরও ঈশ্বরের ন্যায়-রাজ্যে—ঈশ্বরের ন্যায়-চক্রের সমক্ষে এত আস্পর্দ্ধার কথা!

পদ্মিনী লাবণ্যবতী। স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, মর্ত্ত্যে রাজস্থানে পদ্মিনী। তিনি কুসুমকাননে প্রস্ফুটিত কমলিনী, অথবা খনিমধ্যে লুক্কায়িত মরকত মণি। তাঁহার সুমধুর লাবণ্য-

জ্যোতিই রাজস্থানের সমস্ত অনর্থের মূল। তাঁহারই লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া, তাৎকালিক ভারতীয় সম্রাট আলাউদ্দিন ভারতের কত রত্ন হরণ করিয়াছেন; তাঁহারই কারণ অপূর্ব্ব ভারতীয় কুসুমনিকর অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়াছে; সুরম্য স্বর্গ-পুরী এই পাপ নরকে পরিণত হইয়াছে; দুরন্ত আলা একবার দুইবার—এইরূপে কত বার সোণার চিতোর ধ্বংস করিয়াছেন! সেই স্বর্গপুরী এই দগ্ধ শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন! আর তাঁহা-রই কারণ হিন্দুজীবনের আরাধ্য দেব দেবী চূর্ণীকৃত হইয়াছে—সনাতন হিন্দুধর্ম্মে কত কলঙ্কের অঙ্কপাত হইয়াছে। জিগীষার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া, আলা চিতোর আক্রমণ করেন নাই; যশোলিপ্সা, তাঁহার সমরোদ্যোগের কারণ ছিল না; অথবা চিতোরের তুচ্ছ মণি-মুক্তা-প্রবালাদি লুণ্ঠন করিয়া রাজ-সিংহাসন সজ্জিত করাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি এক মাত্র অমূল্য রত্ন, জগতের নিকট—স্বর্গের পিতার নিকটও অমূল্য রত্ন—সতীপ্রধানা হিন্দুমহিলার অমূল্য সতীত্ব-রত্ন হরণ করিতে অভিলাষী; ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অপেক্ষা মহত্তর সতীর সতীত্ব নাশ করিতে সমুদ্যত। পাপ ম্লেচ্ছজীবনে সতী পদ্মি-নীকে লাভ-আকাঙ্ক্ষা! কি দুরাকাঙ্ক্ষা!!

সেই দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, আলা চিতোর নগর অবরোধ করিলেন। দেশে দেশে প্রচার করিলেন, "যদি রাজ-পুত-কুল রাজ্য, ধন ও প্রাণ রক্ষা করিতে বাসনা করে, তবে পদ্মিনীকে যবন-করে অর্পণ করুক।" ভাবিলেন, যবন কেন পরাক্রমশালী সম্রাট কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ চিতোরবাসী, কত কাল আর রাজ্যনাশ-ভয়ে, ধর্ম্ম-ভয়ে, প্রাণ-ভয়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা

অপূর্ণ রাখিবে? কত কাল আর রাজস্থানের ফুল্ল সরোজিনী প্রচণ্ড অনিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না? কত কাল আর আরাধ্যা পদ্মিনী যবন-করে প্রদত্ত হইবে না? কিন্তু তাঁহার সে চিন্তা ভ্রম মাত্র। ভ্রম অচিরেই ভ্রমে পরিণত হইল। রাজপুতেরা বীর-জাতি। তাঁহারা ভীরু বা কাপুরুষ নহেন, যে এ অবমানকর ঘৃণার্হ প্রস্তাবে অনুমোদন করিবেন—সামান্য রাজ্যনাশ-ভয়ে, তুচ্ছ ধনের লোভে, ছার প্রাণের জন্য যবনের জঘন্য প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিবেন? তাঁহারা দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হইয়া, জীবনের জীবনস্বরূপিণী পদ্মি-নীকে যবনকরে অর্পণ করিবেন, এ কি সম্ভব হইতে পারে? তাঁহারা সকলে মিলিয়া, একতার কণ্ঠমালা কণ্ঠদেশে ধারণ পূর্ব্বক যবনের অবরোধ প্রতিরুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন। বীরমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া, যবনের আশার বিপক্ষে অস্ত্র ধরি-লেন। যে আলা এত দিন রাজপুত জাতিকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, নগর অবরোধ করিলেই পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইব মনে করিয়াছিলেন, এত দিনে আজ তাঁহার সে আশা দুরাশা বলিয়া প্রতীয়মান হইল; অনায়াসে পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করা কষ্টকর বলিয়া জ্ঞান জন্মিল। রাজপুত জাতির হৃদয়ের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, বিপুল সাহসিকতা ও অত্যুচ্চ উদারতার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, শেষে দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই-লেন। তাঁহার আশার সম্পূর্ণ সফলতা হইল না; দেবী মহুলের বিলাসিনী হইলেন না। সুতরাং আলা আর কি করিবেন? অগত্যা আশার কতক পরিমাণেও নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে নগর মধ্যে ঘোষণা করিলেন, "যদি কেবল

মুকুরে সুন্দরী পদ্মিনীর মোহিনী মূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়াও দেখিতে পাই, তবে চিতোর নগর ত্যাগ করিতে পারি—অবরোধ আবদ্ধ চিতোরবাসীকে অবরোধ হইতে মুক্তি-প্রদান করিতে পারি।"

চিতোর নগর এখন অবরুদ্ধ—যবন-গ্রাসে নিপতিত। এখন যবন সম্রাটের এ প্রস্তাবে সম্মতি দান কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য এখন রাজপুত বীর যবনের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিলে চিতোর নগর যে উদ্ধার পাইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ। পিঞ্জর ভাঙ্গিতে না পারিলে, পিঞ্জর হইতে বহির্গত না হইলে, কেমন করিয়া তাহার অবরোধকারী শত্রুকে ভূমিশায়ী করিতে পারিবে? পিঞ্জর হইতে বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া অবরোধকারী শত্রুকে ভীতি প্রদর্শন করিলে, অবরুদ্ধের‌ই বিপৎপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। রাজপুত যদি দুরন্ত সম্রাট আলাউদ্দিনের কথা রক্ষা না করেন—স্বচ্ছ মুকুরে সরলা বালার প্রতিচ্ছায়া আলাকে না দেখান, সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়া, এ অবমানকর প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদান করতঃ যবন-বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেন, তবে সহজেই কি দুরাচারের দুরভীষ্টের প্রতিরোধ করিতে পারিবেন? আলাই কি বীর নহেন? তিনি কি নির্জ্জীব মাংস পিণ্ড মাত্র? তাঁহার সৈন্যবল, অর্থবল কিছুরই অভাব নাই। কথা রক্ষা না হইলে, ঘৃণ্য অপমানে অবমানিত হইলে, তিনিই কি নিঃশব্দে নির্ব্বিবাদে চিতোর ত্যাগ করিবেন? ভীমসিংহের হৃদয় স্নেহে পরিপূর্ণ। চিতোরকে শান্তি-নিকেতনে পরিণত করাই তাঁহার রাজ্য-শাসনের মূল মন্ত্র। চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে

শোণিতদান অপেক্ষা, শান্তিদান করিতেই তিনি সমুৎসুক। তিনি দেশ, কাল এবং পাত্র বিবেচনা করিয়া, কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজার প্রধান কার্য্য রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপন। পদ্মিনীর মোহিনী প্রতিচ্ছায়ার পরিবর্ত্তে, তিনি রাজ্যমধ্যে সেই শান্তি সংস্থাপনেই অধিক প্রযত্নপর হইলেন। ত্রেতাযুগে প্রজারঞ্জনার্থ আর্য্য রাম প্রাণের প্রতিমা সীতাকে বনবাসে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ভীমসিংহও তো সেই কুলোদ্ভব। তিনি রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য বিবেচনা করিয়া আলার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

তাই আজ ভীমসিংহ শঠ যবনের শঠতা-জালে বিজড়িত। স্বর্ণলতা ভ্রমে ভুজঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; অমূল্য মণি ভ্রমে জ্বলন্ত অনলে হস্ত পোড়াইয়াছেন। অতিথি-বেশে আলা রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া, শত্রু হইয়াও আতিথ্য হেতু মিত্রের ন্যায় সম্মান পাইয়া, পদ্মিনীর সেই প্রতিচ্ছায়া অবলোকন করিলেন। কিন্তু সে মূর্ত্তি দর্শনে সহসা আলার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। তাঁহার সতৃষ্ণ নয়ন ফিরিতে কুণ্ঠিত হইল। মহিলার মধুর মোহিনী মূর্ত্তি মন মোহিত করিল। আলা স্থিরনেত্রে, একদৃষ্টে, নিস্পন্দভাবে সে মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার আশার তৃষা নিবৃত্তি হইল না, বরং তৃষ্ণা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। তখন কৌশলে অভিলষিত রত্ন লাভ করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।

পদ্মিনীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া প্রত্যাগমনকালে যবনরাজ, ভীমসিংহ সহ সাদরসম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন। অযথা অত্যাচারে, মিবারবাসীকে অন্যায় ক্লেশ প্রদান জন্য, ভীমসিংহের

সম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; অকপট-হৃদয় ভীম সিংহও সেই কুহকে ভুলিলেন; মিত্রজ্ঞানে শক্রর প্রতি মিত্রব আচরণ করিলেন; এইরূপে শক্রর কুহকে পতিত হওয়াই সক নাশের মূল। আলাব শিবিরে গমনকালে ভীমসিংহ, নানারূ আমোদ আহ্লাদে তাঁহার সঙ্গে কিয়দ্দূর গমন করিতেছেন, এম সময়ে পথিমধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত কতকগুলি যবন-সৈনিক হঠা ভীম-সিংহকে আক্রমণ করিল। অসতর্ক ভীম-সিংহকে আক্রমণ করিয়া পরে বন্দী করিল। তাই আজ ভীমসিংহ বন্দী—ব্যাধে বংশীধ্বনিতে মোহিত হইয়া ব্যাধ-হস্তে ধৃত।

তাহার পর? তাহার পর আর কি বলিব? যবন বন্দিভাবে ভীমসিংহকে শিবিরে লইয়া গেল। দেশমধ্যে ঘোষণা করি "এখনও পদ্মিনীকে পাইলে পদ্মিনীর বিনিময়ে ভীমসিংহে মুক্তি দান করিতে পারি—চিতোর নগরীর অবরোধ ত্যা করিতে পারি। নতুবা চিতোরের আর রক্ষা নাই; চিতোরে অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে! চিতোর শীঘ্রই নরক হইবে!"

যবন কি জানে না "পদ্মিনী কে?" পদ্মিনী কি ম্লেচ্ছের রাজহংসী কি সামান্য বকের? স্বর্ণলতা কি ক্ষুদ্র দুর্ব্বাদলের স্বর্ণপ্রতিমা কি কাল ভুজঙ্গের? দেবাদিবাঞ্ছিত নন্দনকাননে সুবিমল সুগন্ধি পারিজাত কি নরকের নারকীয় চরিত্র চরিত দৈত্যের?—না, দেবারাধ্যা দেবী পাপ দৈত্যের বিলাস-সামগ্রী পদ্মিনী দেববংশে সম্ভূতা। অগ্নিকুলে সমুদ্ভূত প্রসিদ্ধ চোহা কুল। যে চোহানকুলের আদিপুরুষ বীরবর চোহানের বংে প্রসিদ্ধ আজমীর দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠাবান্ অজয়পা হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী বীরকেশরী পৃথ্বীরাজ, প্রবল পরাক্রান্ত, ধর্ম্মবা

বলীয়ান্ ধর্ম্মাধিরাজ ও রণকুশল মাণিকরাও জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, এ নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই বীর চোহান-কুলে হামির শঙ্কের ঔরসে পদ্মিনীর জন্ম। ভারতীয় মরু-ভূমির অন্যতম বীরভূমি প্রাচীন সিংহল তাঁহার জন্মভূমি। আবার অন্ত দিকে লতিকার আশ্রিত-আশ্রয়—ভারতের ইতিহাসে সুবিখ্যাত, ত্রেতাযুগে ভারতশাসক শ্রীরামচন্দ্রের সূর্য্যবংশে সমুদ্ভূত বীর-বংশ শীশোদীয়-কুলের কুলবধূ। বীরভূমি রাজপুতনার অন্তর্গত বীরপ্রসূ কনক নগরীর তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা ভীমসম পরাক্রমশালী ভীমসিংহের পত্নী। খৃষ্টীয় ১২৭৫ অব্দে (৬৮২ সালে) তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মণসিংহের অপ্রাপ্ত-ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত ভীমসিংহ মিবারের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। লক্ষ্মণসিংহ নাম মাত্র রাজা ছিলেন—পিতৃব্য ভীমসিংহের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত রাখিয়া স্বয়ং নাম মাত্র রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে সুবিখ্যাতা, লোক-ললাম-ভূতা, লাবণ্যবতী সতী পদ্মিনী সেই ভীমসিংহের প্রাণসমা প্রিয়তমা পত্নী।

পদ্মিনী সতী—সতীত্বে সাবিত্রী! শুনিয়াছি, সত্যকালে সতী সাবিত্রী, মৃত পতি সত্যবানের মৃত-দেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নির্ম্মম-হৃদয় যমের সম্মুখে কাতরতা, পবিত্রতা এবং পাতিব্রত্য হেতু আরাধ্য দেবের মৃত-দেহে জীবনী শক্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, অসম্ভব কথা—পাষাণহৃদয় যম সতী সাধ্বী সাবিত্রীকে সতীত্বের কারণ আকাঙ্ক্ষিত মৃত পতির অমূল্য জীবন প্রতিদান করিয়াছিলেন। তবে সতী পদ্মিনী কি পাপে ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক অন্যায়রূপে বন্দীকৃত পতির বন্দিত্ব মোচন করিতে পারিবেন না? তিনি আরাধ্য দেবের মুক্তির জন্ত কি কোনরূপ চেষ্টাও পাইবেন না?

ভীমসিংহ অন্যায়রূপে বন্দী। চিতোর নগরী সেই আন্দোলন-স্রোতে ভাসমানা। "কেমন করিয়া রাজপ্রতিনিধির উদ্ধার হইবে?" চিতোরের আবালবনিতাবৃদ্ধ সকলেই এই আন্দোলন করিতেছেন। এখন কি প্রকারে ভীমসিংহের উদ্ধার হইবে? বেবত্বে বা কাপুরুষত্বে? বিক্রমসহ অসির সাহায্যে বা ম্লেচ্ছপদলেহনে? সতী স্ত্রীর সতীত্ব নাশে বা বীরের রক্তপাতে? অত্যাচারের এইরূপ আন্দোলনই কার্য্যসিদ্ধির মূল। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, আন্দোলনে সকলই সিদ্ধ হয়। এক দিনে কিম্বা দুই দিনে, এক বর্ষে কিম্বা দুই বর্ষে, এক শতাব্দীতে কিম্বা দুই শতাব্দীতে আন্দোলনের ফল অবশ্য ফলিবে। অত্যাচারে ও পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া, দুঃখের অন্ধতম কূপে নিমজ্জিত থাকিয়া, দুর্দ্দশার চরম সময়েও যদি "অত্যাচারের প্রতিশোধ দিব" এই মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া, আন্দোলন করিতে থাকি, তবে অবশ্যই আন্দোলনের ফল ফলিবে—মরুভূমি উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিণত হইবে। রাজারাসর্দ্দারগণের মধ্যে সেই শুভকর আন্দোলন-স্রোত প্রবাহিত হইল; ভীমসিংহের উদ্ধারকল্পে নানা তর্কবিতর্ক সমুত্থিত হইল; কিন্তু সহসা কেহই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। সকলে সতী স্ত্রী পদ্মিনীর মনোভাব জ্ঞাত হইবার জন্য সমুৎসুক হইলেন।

এই বার পদ্মিনী পরিত্রাণার্থিনী। তাঁহার লেখনীর উপর চিতোরের ভাগ্যলিখন নির্ভর করিতেছে। তিনি রক্ষা করিলে, চিতোরের গৌরব রক্ষা হয়, না করিলে চিতোরকে পথের ভিখারিনী—কাঙ্গালিনী হইতে হইবে। এখন তিনি কি করি-

বেন? পদ্মিনী বুদ্ধিমতী—সাক্ষাৎ সেই বীণাপাণি সরস্বতী দেবীর প্রিয় দুহিতা। বুদ্ধির প্রভাবে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে, ভীমসিংহের উদ্ধারকল্পে এক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন। সকল পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া, সকল উপায়ের নিষ্ফলতা অনুভব করিয়া, আর অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল দান করিবার জন্য, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পতি ভীমসিংহের উদ্ধারার্থ এক গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিলেন। অচিরে আলার সম্মুখে রাজপুত-দূত প্রেরিত হইল—বুদ্ধিমতী সতী পদ্মিনীর বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত সম্রাটসমীপে দূত উপস্থিত হইল।

দূত সম্রাটকে বিজ্ঞাপিত করিল যে, "পদ্মিনী পতির জন্য সতীত্বে বিসর্জ্জন দিতেও সক্ষম। চিতোর নগরীকে অবরোধ হইতে মুক্ত করিলেই পদ্মিনী যবনের অঙ্কশায়িনী হইবেন। যে দিন যবন চিতোর ত্যাগ করিবে, পদ্মিনী সেই দিনই যবনের বিলাসিনী হইবেন। আর যদি এ কার্য্যে যবন-রাজ সম্মতি প্রদান করেন, তবে আরও একটি কথা সম্রাটকে রক্ষা করিতে হইবে; মহিষীর সহচরীগণ তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাতের নিমিত্ত—এ জন্মে পদ্মিনীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার জন্য, তৎ-সমভিব্যাহারিণী হইয়া যবন-শিবিরে আগমন করিবেন। যবন-সম্রাট দেখিবেন, সে সকল কুলকামিনীর পবিত্র কুল যেন যবন কর্তৃক কলঙ্কলিপ্ত না হয়; দেখিবেন, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, পাশব বৃত্তির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া, দুরন্ত যবন যেন তাঁহাদের শিবিকা-সম্মুখে গমন না করে।"

আলা কুহকিনী আশার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। শূর-সুন্দরী পদ্মিনী—রাজস্থানের ফুল্ল সরোজিনী তাঁহার অঙ্ক-

শায়িনী হইবেন; মনোহর মূর্ত্তি স্বর্গের স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র স্বর্গ ত্যাগ করিয়া নরক আলোকিত করিবেন; সুতরাং আলা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি দূতের বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। শুদ্ধ সম্মতি? আনন্দ সহকারে, মিষ্ট বাক্যে, দূতকে পরিতুষ্ট করিয়া পদ্মিনীর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। "তুচ্ছ চিতোর নগরীর জয়েচ্ছা। তুচ্ছ চিতোর নগরীর অবরোধ ত্যাগ!! যাহার জন্য এত যত্ন করিতেছি, এত কষ্টে নিশিদিন সৈন্যসহ নগর অবরোধ করিয়া রহিয়াছি, সেই রত্নই যদি সহজে করগত হইল, তবে আর বিদ্রোহে প্রয়োজন কি? রাজপুতেরা বীর পুরুষ। সহজে তাহাদিগকে দলন করা সম্ভব নহে। সে স্থলে কৌশলে অভিলষিত রত্ন হস্তগত হইলে আর বিগ্রহে প্রয়োজন কি?" আশায় মুগ্ধ হইয়া আলা চিতোর ত্যাগ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

সতী-প্রধানা হিন্দু-ললনার অমূল্য সতীত্ব-রত্ন ত্যাগ! পতি-পরায়ণা সতী পদ্মিনীর এ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মতি দান!! সিংহী ধূর্ত্ত শৃগালের চক্রে পড়িয়া আত্মদান করিবে, এ কি সম্ভব? পদ্মিনী চক্রীর চক্র ভেদ করিয়া স্বীয় চক্রে যবন-মুণ্ড ছিন্ন করিতে সমুদ্যতা; ব্যাধের জালে, কলে কৌশলে ব্যাধকে জড়িত করিতে সমুৎসুকা; যবনের চতুরতার প্রতিদান প্রদানে বদ্ধপরিকরা। তাঁহার বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম সাধারণে প্রকাশ পাইল না; বিপক্ষপক্ষ তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইল না। পদ্মিনী ভীমসিংহের জন্য অমূল্য সতীত্ব-রত্ন ত্যাগ করিবেন, সকলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিল।

কিন্তু সহসা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিল।

দুরন্ত আলার দুরভিসন্ধির ফল ফলিবার উদ্যোগ হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সাত শত সমাবৃত শিবিকা আলার দুর্গাভিমুখে গমন করিল। আলা তদ্দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল ও বিমোহিত হইলেন। ভাবিলেন, "এত দিনে আমার আশা পূর্ণ হইল—আশামূল পদ্মিনীকে পাইলাম।" কিন্তু ভ্রমেও একবার ভাবিলেন না যে, হিন্দু-রমণীর নিকট সতীত্ব কি মহামূল্য ধন? যে হিন্দু সতীত্বের আরাধনা করে—পূজা করে; সতীকে দেবী বলিয়া যাহারা অর্চ্চনা করে; সেই বরণীয় হিন্দু-নারী কেমন করিয়া দেহে প্রাণ থাকিতে সেই অমূল্য সতীত্ব-রত্ন অগাধ জলধিজলে নিক্ষেপ করিবে? যাহাদের দেহে একটুমাত্রও শোণিত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়; আর্য্যগৌরবের কণিকামাত্রও যাহাদের স্মৃতিপথে পরিভ্রমণ করে; এক কথায় মান সম্ভ্রম কাহাকে বলে, এ কথা যাহারা বুঝিতে পারিয়াছে; তাহারা আর কেমন করিয়া আলার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিবে?—কেমন করিয়া সতীর সতীত্ব যবনকরে সমর্পণ করিবে? যাহারা অর্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিয়াছে; জীবনের অসারত্ব অনুভূত করিয়াছে; একমাত্র মহত্ত্বের দিকে যাহাদের লক্ষ্য; হৃদয় যাহাদের দেবত্বে পরিপূর্ণ; তাহারা আর কেমন করিয়া জাতীয় মহত্ত্ব, কুলের মহত্ত্ব ত্যাগ করিবে? বিশেষ এ তো উচ্চ রাজপুত-কুলোদ্ভবা পদ্মিনী! ভীমসিংহ বন্দী বলিয়াই তাঁহার সৈন্যদল এখনও নিস্তেজ হয় নাই। তাহারা বুঝিয়াছিল, ভীমসিংহ না থাকিলেও তাঁহার বীরপত্নী তাহাদের যোগ্য অধিনায়কের অনুপযুক্তা নহেন—তাহাদের দেহে তখনও রাজপুত-কুলের পূর্ণ শোণিত প্রবাহিত ছিল; তাহাদের স্মৃতিপথে তখনও আর্য্যগৌরব পূর্ণরূপে

বিরাজ করিতেছিল। তাহারা দেহে প্রাণ থাকিতে, হৃদয়ে সাহস থাকিতে, বাহুতে বল থাকিতে, অসির তীক্ষ্ণতা থাকিতে, এ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মতি দিতে যে কখনই পারিবে না, মোহান্ধ আলা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিলেন না যে, এ শিবিকায় সে পদ্মিনী নাই; এ শিবিকায় সেই চক্রীর চক্র। চক্রধারী হরি তাঁহার সহায়। যিনি দ্বাপরযুগে, দুঃশাসনহস্তে সতী দ্রৌপদীর অপহৃতপ্রায়, লজ্জা স্বচক্রে রক্ষা করিয়াছিলেন—বস্ত্রহরণ কালে, বস্ত্রবেশে তাঁহার কটিদেশের আবরণ হইয়াছিলেন; সেই চক্রপাণি আজ পদ্মিনীর সহায়। পদ্মিনী তাঁহারই মাহাত্ম্যে ভীমসিংহের উদ্ধারকরে জাতীয় সংরক্ষণে এই গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

পাঠক! পাঠিকে! এ গুপ্ত উপায় কি বুঝিতে পারিয়াছেন? এ গুপ্ত উপায় আর কিছু নহে। ঐ যে সাত শত সমাবৃত শিবিকা দেখিতেছেন, উহাতে পদ্মিনী নাই—উহাতে স্ত্রীলোকের নাম গন্ধও নাই। অবিনশ্বর গ্রীক কবি-কুঞ্জর হোমরের মহাকাব্যে বর্ণিত ভীষণ ট্রয় যুদ্ধের কথা স্মরণ করুন; ট্রয়যুদ্ধে সেই লুক্কায়িত অশ্ববেশধারী সৈন্যগণের কথা স্মরণ করুন! উহাও তাই। শিবিকার অভ্যন্তরে এক জন করিয়া রাজপুত বীর; আর বহির্দ্দেশে, বাহকবেশে ছয় জন করিয়া রাজপুত-সৈন্য। এ সকল সেই পদ্মিনীর মন্ত্রণা। সতী পদ্মিনী পতির উদ্ধারার্থ এই নূতন কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। আলা যদি সহজে ভীমসিংহকে মুক্তি প্রদান না করেন, তবে অন্তিমে প্রাণপণে অসির সাহায্যে ভীমসিংহের উদ্ধার-সাধন এই গুপ্ত রাজপুত সৈন্যের অন্তর্নিহিত মনোভাব, কিন্তু ফলে যে কি হইবে, তাহা

কে বলিতে পারে? ইহাতে বিষময় কি অমৃতময় ফল ফলিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কিন্তু যাহাই হউক না কেন, ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে যাহাই থাকুক না কেন, প্রথমে আলা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পদ্মিনী তাঁহার অঙ্ক-শায়িনী হইবেন, এই আশাতেই তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। কিসে কি হইবে, আর কিসে কি হয়, এ জ্ঞান তখন তাঁহার নাই। মানব এইরূপই দুরাশার দাস। এইরূপ দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়াই মানব সকল হারায়। আলা এ গুপ্ত অনুষ্ঠানের মর্ম্ম অবগত হইতে না পারিয়া, একবার পদ্মিনীসহ শেষ সাক্ষাতের জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ভীমসিংহকে মুক্তি প্রদান করিলেন। মনোভাব, পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলেও ভীমসিংহকে মুক্তিপ্রদান করিবেন না; অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পদ্মিনী সহ ভীমসিংহের শেষ সাক্ষাৎ হইলে পর, আবার তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিবেন। দুষ্টের কি দুরভিসন্ধি! কিন্তু তাহা হইল না; আলার আশা মিটিল না। পদ্মিনীর অপূর্ব্ব কৌশলে, অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অব-কাশ কালে, ভীমসিংহ যবন-শিবির হইতে পলায়ন করিলেন; দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, তীব্রবেগে চিতোরে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে, ভীম-সিংহের অবকাশ প্রাপ্তি কাল অতিবাহিত হইলে আলার মন সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইল। কালবিলম্ব অবৈধ, ভীমসিংহের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, আর এই সুযোগে পদ্মি-নীকে প্রাপ্ত হওয়া বিধেয় বলিয়া, তাঁহার জ্ঞান জন্মিল। সৈন্যসহ তদনুসরণে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পরে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল। আলা যাহা দেখিবেন

মনে করিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত হইল। তাঁহার মনের আশা তিনি দেখিবেন সেই পদ্মিনী, নারী-কুলের সীমন্তিনী—সুন্দরী কুলের অগ্রণী; কিন্তু দেখিলেন, অস্ত্রধারী বীর রাজপুত-সৈনা, বীরত্ব তাঁহাব শ্রেষ্ঠ—অস্ত্রেব চাকচিক্যই তাঁহাদের সৌন্দর্য্য। সহসা আলার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি আশাগিরির উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান ছিলেন, অকস্মাৎ তাহা হইতে গভীর নিরাশানীরে নিপতিত হইলেন। আলা দেখিলেন, অস্ত্র সহ সুসজ্জিত বীর রাজপুত সৈন্য; পদ্মিনীর পিতৃব্য বীববর গোরা তাহাদের নেতা; আর তাঁহার ভ্রাতা দ্বাদশ বর্ষীয় বীর বালক বাদল তাহাদের অধিনেতা। আলা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। সাধ্বী পদ্মিনীব পাতিব্রত ধর্ম্ম রক্ষার্থে অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ধন্য হিন্দু নারী! ধন্য তোমার হৃদয়!! ধন্য তোমার পতি-ভক্তি!!! পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা যে আলার একমাত্র উদ্দেশ্য, যাহার কারণ সে আপনার পদে আপনি কত কুঠারাঘাত করিতেছে; দিন দিন তাহার স্ববল ধ্বংস হইতেছে; সেই আজ তোমার মহিমায় স্তম্ভিত হইয়াছে। পরে আলা আপনার সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থে আদেশ করিলেন। হিন্দু-যবনে ঘোরতর সমর বাঁধিল। সমরের ফল যাহা ফলিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। বীরনারী পদ্মিনীরই জয় হইল। কত শত যবনমুণ্ড ভূমিশায়ী করিয়া, বীরবর গোরা যদিও তনুত্যাগ করিলেন, তথাপি বীর বালক বাদল জয়ডঙ্কা বাজাইয়া, মহোল্লাসে চিতোরে প্রবেশ করিলেন। পদ্মিনীর জীবননাটকের এক অঙ্ক শেষ হইল। আর অবশিষ্ট এক অঙ্ক। তাহা সুখের কি দুঃখের হইবে, জগদীশ্বর জানেন।

আবার যবন! আবার যবন! এততেও নিস্তার নাই! এক-বার নয়, দুই বার পরাজিত। আবারও নগর আক্রমণ! এবার যে চিতোর সৈন্যশূন্য! বিগত কাল সমরে পদ্মিনী পিতৃব্যের পদে ধরিয়া, "অবলাকে রক্ষা করুন" এইরূপ মিনতি করিয়া তাঁহাকে সমরাঙ্গনে পাঠাইয়াছিলেন; কি করিবেন, ধন যায়, প্রাণ যায়, সতীর সতীত্ব যায়, তাই বালক বাদলের কোমলাঙ্গে স্বহস্তে সুকঠিন বর্ম্ম পরিধান করাইয়া দিয়াছিলেন; রণোৎসাহে উৎসাহিত করিয়া, আর্য্যগণের আর্য্যকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া দিয়া যুদ্ধনীতি অনভিজ্ঞ সেই বালককে বিভীষণ রণাঙ্গনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার আর কি হইবে? কোন্ বীর অম্লানবদনে কাল রণাঙ্গনে গমন করিবে? যবন ক্রমান্বয়ে তিন বার চিতোর আক্রমণ করিল। গত দুই বার বীরগণ সোৎ-সাহে, স্বদেশহিতৈষিতার জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে রণে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার যে বীর নাই, কে আর রণে যাইবে? কে আর চিতোর রক্ষার্থে সমরক্ষেত্রে অকাতরে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইবে? বিষম সমস্যা, ভয়ঙ্কর কথা; চিতোরের ভবিষ্য ভাগ-লিখন অন্ধকারময়। ঐ আল্লা পুনর্ব্বার চিতোর আক্রমণ করিলেন! দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া, তাহাতে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন! সুতরাং এ দুর্দ্দিনে এসকল কথা স্মরণ করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে, অশ্রু অনিবার্য্য হয়।

তবে কি হইবে? এই বারই কি চিতোরের অন্তিম কাল উপস্থিত হইল? এই বারই কি একেবারে সোণার চিতোর অধঃপতিত হইবে? চিতোর বীরশূন্য বটে,

কিন্তু এখনও তো ভীমসিংহ বর্ত্তমান! অরি-দমনকারী অরি-সিংহ, দুর্জ্জয় রণে অজেয় অজয়সিংহ প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণও তো এখনও জীবিত! তবে আর ভয় কেন? স্বদেশ, সম্মান এবং সতীত্বের নিকট তো রাজপুত জাতির জীবন নয়? মহত্ত্বের সংরক্ষণ যে জীবনের মহাব্রত, যাঁহারা আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশপ্রেমিকতার জীবন্ত আদর্শ, আত্ম-শোণিত দানে, স্বদেশ সংরক্ষণে যাঁহারা বিশেষ অভ্যস্ত, তাঁহারা জীবিত থাকিতে আর ভয় কি?

ভয় নাই সত্য, কিন্তু কষ্ট, কেহই যে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন না? পদ্মিনী এত দিন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার বীরপতি ভীমসিংহই স্বদেশের উদ্ধারকল্পে হিন্দুর হিন্দুত্ব, সতীর সতীত্ব রক্ষার সদুপায় অবলম্বন করিবেন। কিন্তু কালবিলম্ব হইতেছে। দুরন্ত যবন ক্রমে দৃঢ়, দৃঢ়তররূপে চিতোরের অবস্থান সংরক্ষণ করিতেছে; দিন দিন গুপ্তভাবে মাঠে ঘাটে কত রাজপুত সৈন্য যবন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেছে, অত্যাচারে, প্রবল পীড়নে, রাজার সুশাসন অভাবে কত নাগরিক নগর ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। দুরাচার যবনের দুর্বৃত্ততার প্রতিদান হইল না দেখিয়া, কত কুলনারী গৃহে বসিয়া অক্ষিবারি মোচন করিতেছে। পদ্মিনীর হৃদয়ে এ সকল সহ্য হইল না। পদ্মিনী পতি ভীমসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। আবার যবন-রণে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন।

কিন্তু ভীমসিংহকে কি আর উৎসাহিত করিতে হয়? বীরকে কি আর বীরত্ব শিক্ষা দিতে হয়? না সম্মুখে আপ-

ভিত ছাগের অনুসরণে সিংহকে ইঙ্গিত করিতে হয়? পদ্মিনীর উৎসাহ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ভীমসিংহ কাল সমরের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন। সে ভীষণ সমরে একে একে ক্রমান্বয়ে পুত্রগণকে প্রেরণ করিয়া, পরে আপনিও প্রাণ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উপর আবার পদ্মিনীর জলন্ত উৎসাহ, একান্ত অনুরোধ। "রণে যাইতে হইবে, না গেলে মান, সম্ভ্রম, গৌরব কিছুই থাকিবে না। দেশ অরাজকে পরিণত হইবে। আর্য্যসন্তান রাজপুত-কুল জগতে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া খ্যাত হইবে।" নারীর মুখে এ হেন বীরবাক্য। বিশেষ এ নারী আবার তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী সতী সাধ্বী পদ্মিনী। যাঁহার অপূর্ব্ব কৌশলে মহাপ্রলয় হইতে চিতোর রক্ষা পাইয়াছে, ভীমসিংহের অমূল্য জীবন যে অবলার রণ-কৌশলে সংরক্ষিত হইয়াছে, অগণ্য বিজয়িনী যবনসেনা আলার অধীনে থাকিলেও যে রমণীর রণে পরাজিত হইয়া দলভ্রষ্ট হইয়াছে, এ আবার সেই পদ্মিনী—রাজস্থানের প্রফুল্ল সরোজিনী। এ বাক্য কি লঙ্ঘন হইতে পারে? বিশেষ বীর জাতির নিকট। যে জাতির জাতীয়তার মূলমন্ত্র ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ ব্যবহার, অর্থাৎ যে জাতি অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার আর বিনীতের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেই বীর রাজপুত জাতি আর কেমন করিয়া পদ্মিনীর এ মূল্যবান্ প্রস্তাবে সম্মত না হইবেন?

পদ্মিনীর প্রস্তাব অনুযায়ী সকল স্থির হইল। একে একে ক্রমান্বয়ে একাদশ সংখ্যক রাজপুত বীর কাল-সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিল। পদ্মিনীর মহামূল্য প্রস্তাবের মূল্য রক্ষা হইল না।

একাদশ দিনের কাল-সমরে রাজপুতকুল নির্ম্মূলপ্রায়। আলা যেন কালান্তক যমের ন্যায় ক্ষত্রোৎসাদনকারী মূর্ত্তিমান পরশুরামের ন্যায়, ধরণী বীরশূন্য করিবার জন্য শাণিত তরবারি হস্তে চিতোরদ্বারে দণ্ডায়মান। অনাহারে অবরুদ্ধ নগরে বা কাল-সমরে চিতোরপুরী বীরশূন্য করিবেন, এই তাঁহার আন্তরিক বাসনা। পিশাচের হৃদয়ে দয়া নাই, মমতা নাই। অকারণে অন্যায়রূপে অন্যকে অপার ক্লেশ প্রদান করিতে পিশাচের ক্লেশ নাই। অনর্থক ধরণী জীবশূন্য করিতে ভারতমাতাকে পুত্রহীনা, অনাথিনী করিতে আলার দুঃখ নাই। আলা নিঃশঙ্কচিত্তে, নিরুদ্বেগে দিনে দিনে একে একে রাজপুতকুল নির্ম্মূল করিল। বীরপ্রসূ চিতোর বীরশূন্য হইল, চিতোরের সকলই কাল সাগরের প্রবল স্রোতে নিমজ্জিত হইল।

আজ চিতোরের শেষ দিন সমাগত। চিতোরের ভাগ্য আজ ভাঙ্গিয়াছে। অবশিষ্টও ভাঙ্গিবে। আর ক্ষণকাল পরে সংসার চিতোরের জন্য কাঁদিবে, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ চিতোরের জন্য কাঁদিবে। শ্মশান! চিতোর আজ শ্মশান!! বীরশূন্য, মনুষ্যশূন্য চিতোর আজ হিংস্র কাল সর্পপূর্ণ। চিতোরে আর কেহই নাই, কেবল ভীমসিংহ ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অজয়পাল বর্ত্তমান। বাপ্পার পবিত্র বংশের উৎসাদন হইবে। পিতৃবংশ অনন্ত নরক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সেই পবিত্র বংশে জলগণ্ডূষদানের একমাত্র অধিকারী, পুত্র অজয়পালকে রণে যাইতে ভীমসিংহ বাধা দিলেন, ভিখারীর বেশে দেশে দেশে লুক্কায়িত ভাবে জীবন যাপন করিতে অনুমতি দিলেন। আর আপনি রক্ত পরিধান করিয়া জীবনের জীবনস্বরূপিণী পদ্মিনীর নিকট

অন্তিমের অন্তিম বিদায় লইয়া; আসন্ন কালের উদ্দেশে যবন-সমরে গমন করিলেন; ধন্য ভীমসিংহ! ধন্য তুমি! তোমরাই জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিয়াছিলে। তোমরাই জাতীয় গৌরব কাহাকে বলে জানিয়াছিলে। তাই রণে আপনার প্রাণের পুত্র-গণকে বিসর্জ্জন দিয়াছ; শেষে আপনিও অগ্রসর হইলে।

রণে যাহা ঘটিল, তাহা আর বলিব না—বলিতে পারিব না। শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইবে; অন্তর ভগ্ন হইবে; মন বিষাদ-সাগরে ডুবিয়া যাইবে। নিদারুণ সমরে বীরবংশ লোপ পাইল। চিতোর বীরশূন্য হইল; ম্লেচ্ছের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইল; আর ভীমসিংহ; ভীমসিংহ বীরের ন্যায় সম্মুখ-সমরে অগণ্য যবন-সেনার বিনাশ সাধন করিয়া, শেষে অন্তিমে ভগবান্ আশু-তোষের নাম জপ করিতে করিতে নশ্বর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এদিকে পাঠক! পাঠিকে! পদ্মিনীর কথা শুনিবেন কি? সতীর সতীত্ব দেখিবেন কি? ঐ দেখুন! আজিও সে চিতা জ্বলিতেছে। দেখুন! অপূর্ব্ব জীবনের অপূর্ব্ব কাণ্ড! এক দিকে কালসমরে ভীমসিংহের জীবনী শেষ হইল—আর অন্য দিকেও কাল জহর ব্রতের অনুষ্ঠান হইল। শত শত রাজপুত-ললনা হৃদয়-বিদারক শোকস্বরে জগৎ কাঁদাইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল কাঁপাইয়া, সেই বিশ্বদগ্ধকারী জ্বলন্ত পাবকে আত্মদেহ বিসর্জ্জন দিল; রূপ, লাবণ্য, যৌবন সকলই অনলে মিশিল। পদ্মিনী সকলকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া, স্বয়ং শেষবর্ত্তিনী হইলেন। পতির অনুসরণে সতী পতির নাম জপিতে জপিতে সেই জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিলেন। জগতে বীরত্বের, বিদ্যাবত্তার, ও

বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শেষে সতীত্বের ও সতীজীবনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

আর কি লিখিব? সে হৃদয়স্তম্ভনকারী অবর্ণনীয় বিভীষণ দৃশ্যের আর কি বর্ণনা করিব! আজিও সে দৃশ্য বর্ত্তমান রাজস্থানের যে স্থলে এ ভয়াবহ কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল, পদ্মিনী নাটকের এ ভয়াবহ দৃশ্য যে স্থলে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা আজিও বর্ত্তমান। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে (৭১০ সালে) সংঘটিত কাল কাহিনীর প্রমাণ আজিও রাজস্থানে রহিয়াছে। সে বিভীষণ চিতা আজিও আগ্নেয়গিরির ধাতু-নিঃস্রবের ন্যায় ধূমরাশি নিঃসারণ করিতেছে। পতিপ্রাণা সতী পদ্মিনীর সতীত্বের প্রমাণ দিতেছে! জগৎ! যদি সে চিতা দেখিতে বাসনা থাকে, আর তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সাহস থাকে, তবে তাহা দেখ! আর যদি ভীরুর ন্যায়—কাপুরুষের ন্যায় তাহা দর্শন করিয়াই না হয়, দর্শনে একটু অশ্রুবারি মোচন করিয়াই স্থির থাক, তবে আর তাহা দেখিয়া কাজ নাই। সে কথা স্মরণ করিয়াও কোন ফল নাই।

বেহুলা।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, দৃষ্টি-প্রতিরোধকারী গভীর অন্ধকারের ভিতরে একটি জ্বলন্ত মণির ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল ; কল্পনার অন্তরে, ইতিহাসের বাহিরে, সে চরিত্র সতত প্রতিভাত হইতেছিল ; গম্ভীরভাবে সে যেন জগৎকে শিক্ষা দিতেছিল যে, "মহত্ত্ব লুক্কায়িত থাকিবার নহে। নিবিড় জঙ্গলে বসিয়াই হউক, কিম্বা অকূল সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসমান থাকিয়াই হউক, মহত্ত্বের অনুষ্ঠান কখনই অকীর্ত্তিত থাকে না,—তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়,বেগবতী স্রোতস্বতীর বালুকা-রোধী স্রোতের মত সর্ব্বদা আপনার বেগ বর্দ্ধন করিয়া থাকে।" বেহুলা কত শতাব্দী পূর্ব্বে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ; কোন্ স্থানে, কিরূপে তাঁহার পবিত্র জীবনীর পরিস্ফুরণ হইয়াছিল ; যদিও তাহা গভীর নৈশান্ধকারে দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছে, তথাপি সে জ্যোতির দীপ্তি সম্যক্ লক্ষিতে না হইলেও, ক্ষীণভাবে আজও জগৎ আলোকিত করিতেছে ;—জগৎ-মুখে সে মহিমা কত আবর্ত্তনের পর আজিও পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু বিস্তর অনুসন্ধানেও বেহুলার প্রকৃত জীবনী প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। বহু পরিবর্ত্তনে সে জীবনী পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়াছে। আজ জগতে তাহা উপাখ্যান আকারে উপকথার মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে ; লোকে গল্পের ন্যায় দিন দিন তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিতেছে। আমরা সেই নানা অলঙ্কার-বিভূষিত, বিভিন্নাবস্থাপ্রাপ্ত চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্য চিত্র সাধারণে প্রকাশ করিতে সম্যক্ প্রয়াস পাইব ;—গভীর অন্ধকারের ভিতর হইতে

বিশৃঙ্খলতার মধ্যে সম্ভবতঃ সত্য বাছিয়া লইতে সম্যক্ চেষ্টিত হইব।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণের ন্যায় বেহুলা-জীবন বিশ্বাস-অযোগ্য, বহুল অলৌকিক ঘটনা দ্বারা পরিশোভিত; সেই লোক-বিশ্বাস-বহির্ভূত, অলৌকিক জীবনীর সংক্ষিপ্ত সার কথা বর্ণন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। উল্লিখিত আছে যে, বহু পূর্ব্বে সম্ভবতঃ এই বঙ্গদেশে নিছনী-নগরীর অবস্থান ছিল; সেই নিছনী-নগরী বেহুলার জন্মস্থান। অধুনা নিছনীর কোন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ হয় না। বেহুলা বণিক-দুহিতা; ঐ নিছনী-নগরে, সায় বণিকের ঔরসে, অমলা সুন্দরীর গর্ভে বেহুলার জন্ম হয়। বেহুলার কুমারী জীবনের বিশেষ ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। যৌবনে তাঁহার জীবনের বিকাশ পাইয়াছিল; তরুণ বয়সে সে জীবনী তরুণত্ব দেখাইয়াছিল।

বেহুলা পরমা সুন্দরী। কবি বলিয়াছেন যে,তাঁহার মুখজ্যোতি মনোহারিণী—পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনঃ-স্নিগ্ধ-কারিণী; তাঁহার আরক্তিম অধরপল্লব বিদ্যুতের দ্যুতি প্রকাশ করিত—নয়নযুগল খঞ্জন-নয়নকে অবনত রাখিত। কিন্তু আজ জগৎ বলিতেছে যে, তাঁহার হৃৎসৌন্দর্য্যের নিকট দৈহিক সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না; তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য সমসময়ের লোককেই বিমোহিত করিয়াছে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত জগৎ তাঁহার হৃৎ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত রহিয়াছে—তাঁহাকে দেবী নামে সম্পূজিতা করিতেছে। দৈহিক সৌন্দর্য্য অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হৃৎসৌন্দর্য্যের অধিকারী অতি অল্প লোক। দেশবিশেষে, জলবায়ুর গুণে লোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে পারে—তাহা

ঈশ্বরের সৃষ্ট। ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় কায়ার পতনে তাহার পতন হইয়া থাকে; কিন্তু হৃন্মধ্যে হৃদয়ের শুচিত্ব হইতে সংসাধিত হৃৎসৌন্দর্য্যের বিকাশ পায়, কালের পরিবর্ত্তনেও সে সৌন্দর্য্যের বিলোপ হয় না।

এই সময়ে চম্পকনগর নামে আর একটি স্থানের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। চম্পকনগরই বেহুলা-জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির স্থান। চম্পকনগরে চাঁদ সদাগর নামে অন্য এক ধনবান্ বণিকের বাস ছিল। সেই চাঁদ সদাগরের ঔরসে, সনকাসুন্দরীর গর্ভে নখিন্দর জন্ম গ্রহণ করেন। সৌন্দর্য্যশালিনী বেহুলা এই নখিন্দরের পরিণীতা পত্নী।

বেহুলা-নখিন্দরে পরিণয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু দম্পতিযুগল পরিণয়-সুখ ভোগ করিতে পান নাই। আনন্দের বিবাহে শোকধ্বনি উঠিয়াছিল; বিবাহের অব্যবহিত পরে, ফুলশয্যা-গৃহ ক্রন্দনের কালিমায় কলঙ্কিত হইয়াছিল; দুরন্ত ফণী মণি হরণ করিয়া অধিকারীকে কাঁদাইয়াছিল; তক্ষকের বিষম দংশনে সতী পতিহীনা হইয়াছিলেন; বেহুলা-ক্রোড়ে নখিন্দরের জীবনস্রোত কালস্রোতে মিশিয়া গিয়াছিল। গভীর নৈশান্ধকারের মধ্যে—জগৎ স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইলে, নিদ্রাভিভূত নখিন্দরকে কালসর্পে দংশন করিল; সতীপার্শ্বে পতি-জীবন বিলুপ্ত হইয়া গেল। বেহুলা-জীবনের মাহাত্ম্যও জগতে প্রকাশ পাইবার উপযুক্ত পথ পাইল।

নখিন্দরের সর্পাঘাত সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। গল্পটি অলৌকিক উপন্যাসে পূর্ণ; কিন্তু তাহাতে বেহুলা-জীবনের পাতিব্রত্যের পরিচয় উপকথার আকারে, ঔপন্যাসিক ভিত্তিতে কিয়ৎ

পরিমাণে সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তাহাতে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস সত্বেও তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল। কথিত আছে, নখিন্দরের পিতা চাঁদ সদাগর সাকারবাদীদিগের পূজ্য দেবতাকে পূজা করিতেন না। বিশেষতঃ সাকারবাদীদের সম্পূজিতা সর্পদেবী মনসা তাঁহার পূজ্যার পরিবর্ত্তে ঘৃণার পাত্রী ছিলেন। অনেক অনিষ্টসাধনের পর, মনসাদেবী অবশেষে তাঁহার পুত্র নখিন্দ-রকে বিনষ্ট করিয়া পিতৃমনে ব্যথা দিতে উদ্যত হন। "নখি-ন্দরকে ফুলশয্যা-গৃহে সর্পদংশনে মরিতে হইবে" এই বলিয়া মনসাদেবী চাঁদ সদাগরকে অভিসম্পাত প্রদান করেন। চাঁদ সদাগর সর্পভয়ে ফুলশয্যা-দিবসে অচ্ছিদ্র লৌহ-গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন; সেই লৌহ-গৃহে মশক মক্ষিকার গমনোপযোগী ছিদ্রও বর্ত্তমান রহিল না। বেহুলা ও নখিন্দর ফুলশয্যা-রাত্রিতে সেই অচ্ছিদ্র গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন। সকলে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইল যে, "আর ভয় নাই, মশক মক্ষিকার অগম্য গৃহে কখনই সর্প প্রবেশ করিয়া নখিন্দরকে দংশন করিতে পারিবে না।" কিন্তু সকলই বিফল! বিধাতার চক্রে পড়িয়া নখিন্দরের জীবন রক্ষা পাইল না। গভীর রাত্রিতে নখিন্দর ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন,; ক্ষুধার্ত্ত নখিন্দর পত্নী সম্মুখে, আকুলপ্রাণে ভোজ্যদ্রব্য চাহিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে ভোজ্যদ্রব্য কোথায় পাওয়া যাইবে? গৃহের বাহিরে যাইতে পারিলে ভোজ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু বেহুলা গৃহের বাহিরে কেমন করিয়া যাইবেন? দ্বারোদ্ঘাটনকালে কালসর্প গৃহে প্রবেশ করিয়া যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে! সুতরাং বেহুলা বাহিরে যাইতে সাহস পাইলেন না। কিন্তু তাই

থলিয়া তিনি পতির ক্ষুধাকাতরতা কেমন করিয়া দেখিবেন? সতী, পতির আকুলতা দেখিতে পারিলেন না। নখিন্দরকে আহারদানে সম্যক্ চেষ্টিত হইলেন। সেই গৃহের ভিতরেই অন্ন রন্ধন করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষুধাকাতর স্বামীর তুষ্টি-সাধনে প্রয়াস পাইলেন। কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া লইলেন, মাঙ্গলিক-হাঁড়ি রন্ধন-হাঁড়ি হইল, আর তন্মধ্যস্থ মাঙ্গলিক তণ্ডুলে রন্ধন-তণ্ডুলের কার্য্য করিল, আর লৌহ-প্রস্তরের সংঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিল, দারুণ চেষ্টার গুণে ক্রমে অন্ন প্রস্তুত হইল। কিন্তু এত আয়াসেও তাহা নখিন্দরের ভোজ্য হইল না। বেহুলার আয়াস-লব্ধ অন্ন ভোজন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহাকে কালসর্প দংশন করিল। রন্ধন-অনল-শিখায় গৃহে কালীর চিহ্ন হইয়াছিল; সেই কালীর চিহ্নের ভিতর হইতে সূত্রাকার কালসর্প দেখা দিল; আর বেহুলার প্রাণের প্রাণ অকালে সেই কালসর্প দংশনে বিনষ্ট হইল। জানি না, এ ঘটনা সত্য কি না; কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা কবি-কাহিনীর কল্পনা, কিম্বা সাকারবাদীদিগের মনসামাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের জল্পনা।

গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। নিশিশেষে পিতা মাতা মর্ম্মভেদী স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বেহুলার ক্রন্দন শীঘ্রই থামিল। "বিপদে কাঁদিব কেন? কাঁদিলে ফল কি? কাঁদিয়া সময় নষ্ট করিলে বিপদোদ্ধারে যে বিঘ্ন ঘটিবে!" এই ভাবিয়া বেহুলা কাঁদিলেন না। বেহুলা বাল্যকালে শুনিয়াছিলেন যে, চেষ্টার অসাধ্য এ জগতে কিছুই নাই। তাঁহার মনে এখন সেই কথা স্মরণ হইল। তিনি ভাবিলেন যে, "চেষ্টায় যদি সকল কার্য্যই হইতে পারে, তবে সর্পদষ্ট মৃত পতির জীবন কেন না

পুনর্জ্জীবিত হইবে? দারুণ চেষ্টার গুণে সাবিত্রী সতী মৃত স্বামী সত্যবান্‌কে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন, তবে আমি আমার মৃত পতিকে বাঁচাইতে পারিব না কেন? সাবিত্রীও মানবী, আর আমিও মানবী; তবে তিনি যাহা পারিয়াছিলেন, আমি তাহা কেন পারিব না?" ক্রমে তাঁহার চিন্তা বাড়িল; নিমেষে নিমেষে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, সে চিন্তা তাঁহার মর্ম্মস্থলস্পর্শিনী হইল। তিনি স্থির করিলেন, "স্বামীর জীবন বাঁচাইব" প্রতিজ্ঞা করিলেন, "হয় পতির জীবন বাঁচাইব, না হয় তাঁহার সহমৃতা হইব।" যে কল্পনা কখনও কাহারও অনুভূত হয় নাই, লোকের চিন্তায় যাহা কখনও আসে নাই, নারী বেহুলা আজ সেই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এখন কি হইবে? নারী-বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে? —না ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইবে? বেহুলার অধ্যবসায়ে নখিন্দর জীবন পাইবেন?—না, দুই জীবনই কাল-সমুদ্র-জীবনে মিশিবে? যাহা হউক বেহুলা আত্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন না। কেবল "পতির জীবন বাঁচাইব" সতত তাঁহার লক্ষ্য তদভিমুখে ধাবিত হইল। তিনি গৃহ ত্যাগ করিলেন। পার্থিব জীবনের মায়াপাশ কর্ত্তন করিয়া পতি-জীবন বাঁচাইতে সচেষ্টিতা হইলেন। সত্বর কদলী বৃক্ষের একটি ভেলক* প্রস্তুত হইল। সে ভেলক নদীর জলে ভাসমান হইলে, মৃত পতি ক্রোড়ে সতী বেহুলা তাহাতে চড়িলেন; আলুলায়িত কেশে, কাঙ্গালিনীর বেশে তিনি ভেলকোপরি ভাসমানা হইতে লাগিলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর বারণ শুনিলেন না। পিতা মাতা ভাই

* কবির কাব্যে এই ভেলক "মান্দাস" শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

বন্ধুর জন্য কাতর হইলেন না। কেবল একমাত্র পতিজীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পতিই মোক্ষ, পতিই দেবতা, পতিসেবাই স্বর্গ এই ভাবিয়া মৃত পতি ক্রোড়ে ভেলকোপরি নদী-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এক দিকে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

তটিনী-স্রোতে ভেলক!—ভাসিতেছে! দিবারাত্রি জ্ঞান নাই, আলোক আঁধার লক্ষ্য নাই, শীতগ্রীষ্মে কষ্ট নাই, ভেলক সতত তরঙ্গ-মুখে চলিতেছে। দিনের পর দিন যাইতেছে, রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে, কিন্তু তাহার গতির নিবৃত্তি নাই। সে গ্রামের পর গ্রাম পাইতেছে, নগরের পর নগরে যাইতেছে আর বেহুলা আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় লোকের নিকট অবগত হইতে সম্যক্ চেষ্টা পাইতেছেন। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন,"সর্পদষ্ট মৃতের পুনর্জ্জীবিত হইবার কি কোন উপায় আছে?" লোকে যে যেরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে. তিনি তাহা সম্যক্ শুনিতেছেন, আর তৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শুনিয়াছি, কত পতিপ্রাণা সতী পতিবিয়োগে, মৃত পতিদেহ ক্রোড়ে করিয়া জ্বলন্ত অনলে জীবন্ত জীবন বিসর্জ্জন দেয়; গভীর শোকের কঠোর দংশনে কত সতী পতিসহ সহমৃতা হয়; কিন্তু এরূপ তো কখনও শুনি নাই!—শুনিয়াছি একমাত্র সাবিত্রীর কাহিনী, আর শুনিলাম এইমাত্র বেহুলার জীবনী। বেহুলা অনাহারে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অকাতরে, রুক্ষকেশে, জীর্ণবেশে, নদীস্রোতে—তরঙ্গমুখে ভাসিতে চলিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "একবার যাঁহাকে আমার জীবনের আশ্রয় জ্ঞান করিয়াছি, তিনিই আমার জীবন। আর আমার শরীর রক্তমাংসপিণ্ডমাত্র; জীবন যাইলে রক্তমাংসপিণ্ডসার

দেহ লইয়া কি করিব ? এক দিনের জন্যও যাঁহাকে "আমার" ভাবিয়াছি,তাঁহার প্রাণে নিশ্চয়ই "আমার" প্রাণ। তবে প্রাণের বিয়োগে দেহ কত দিন থাকিবে ?—ধূলার দেহ পচিয়া দুর্গন্ধে ধূলাসার হইবে যে ! কেন পচনে জীবন বিনষ্ট করিব ? যাঁহার জীবনে "আমার" জীবন ; হয় সে জীবনে এ জীবনে এক জীবন হইয়া অনন্ত শূন্যে মিশিয়া যাইবে, নয় এ জীবন বিভিন্ন দেহে পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিবে ! যাঁহাকে "আমার" বলিতে পারিয়াছি, সে জীবনে ও আমার জীবনে কখনই ভিন্ন নহে। দেহমাত্র ভিন্ন হইলে, প্রাণ ভিন্ন নহে—হৃদয় একই ! মোহান্ধ মানব বাহ্য চক্ষে দেখিতে পারে, "জগতে সকলই ভিন্ন।" সকলই ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যিনি "আমার" তিনি আমা হইতে কখনও ভিন্ন নহেন। আর যখন ভিন্ন নহেন, তখন সে জীবনে এ জীবন যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?"

ক্রমে দেশে ক্রন্দনের রোল বাড়িল। কোথায় দিনের আবর্ত্তনে দিনে শোক কমিবে ; কিন্তু বেহুলা-নখিন্দরের শোক শীঘ্র কমিল না। মৃতের বিচ্ছেদ মানবে অনায়াসে সহিতে পারে, কিন্তু জীবন্তে মৃতপ্রায় দর্শনে লোকে মনে বড়ই ব্যথা পায়। মৃত-পতিক্রোড়ে বেহুলার নদীস্রোতে তনুত্যাগোদ্যম ক্রমে নিছনী-নগরে তাঁহার পিতা মাতার নিকট পৌঁছিল। শোকে জনক জননী অধীর হইলেন—অশ্রুজলে তাঁহাদের হৃদয় ভাসিয়া গেল ; গভীর শোকে, অনাহারে বেহুলা-জীবন নদীস্রোতে বিলীন হইয়াছে ভাবিয়া,তাঁহার পিতা সায় বণিক, মাতা অমলা-সুন্দরী অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অপত্যস্নেহ তাঁহাদিগকে তনয়ার অনুসরণে ধাবিত করিল। রোরুদ্যমানা, আলুলায়িত

কেশা, শোকাতুরা জননী, তনয়ার দর্শনে, "জীবিতা থাকিলে বেহুলাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিব" এইরূপ স্থির করিয়া নদী-প্রবাহের পশ্চাৎ মৃত নখিন্দর-ক্রোড়ে বেহুলার অনুসরণে গমন করিলেন। আর পিতা সায় বণিকও পত্নীর ন্যায় অপত্য-স্নেহে কাতর হইয়া তনয়ার অনুসন্ধানে চলিলেন।

মাতাপিতার অনুসন্ধানে বেহুলার অনুসন্ধান হইল। তাঁহারা দেখিলেন, স্রোতমুখে, ভেলকপৃষ্ঠে, কয়েক দিবসের দুর্গন্ধ মৃত শব ক্রোড়ে একটি যুবতী রমণী—পাগলিনীর ন্যায়; পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এ নারী সুন্দরীকুলের অগ্রণী, কিন্তু এবার তাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার আর সে মূর্ত্তি নাই; সুন্দরী মূর্ত্তি কালী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, মুখজ্যোতি নৈরাশ্যমেঘে আবৃত হইয়াছে; বদন বিশুষ্ক, দেহ শীর্ণ, রূপলাবণ্য অন্তর্হিতপ্রায়!—যেন মুমূর্ষাবস্থায় আপতিতা। জনক জননী সে ভয়াবহ দৃশ্যে ভীত হইলেন—উচ্চৈঃস্বরে শোকধ্বনিতে কাঁদিয়া বলিলেন, "বেহুলা! দাঁড়াও—আমাদের ফেলিয়া কোথায় যাইবে? তুমি না ফিরিলে আমরা বাঁচিব কেমন করিয়া? অগ্রে তোমার পিতামাতাকে বাঁচাও, পরে যথা-ইচ্ছা গমন করিও।"

পতিশোকোন্মত্তা বেহুলা পিতামাতার ক্রন্দন শুনিলেন। পিতামাতার ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয়ও কাঁদিল বটে; কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্টা হইলেন না। কাতরে, ভক্তিসহকারে বিনয়নম্র-বচনে তিনি পিতামাতাকে উত্তর দিলেন। বলিলেন, "জনক-জননি! আমায় আর কেন ডাকিতেছেন? আমার পাপজীবনে আর প্রয়োজন কি?—পতি যে পথে, আমিও সেই পথে যাই;

অনর্থক বাধা দিবেন না। বাধা দিলে আমার ধর্ম্মে ব্যাঘাত পড়িবে, কীটপরিপূরিত অনন্ত নরকে কীট-দষ্ট হইয়া আমার জীবন যাইবে। আপনারা আমার প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা পাইতেছেন বটে, কিন্তু আপনারা চেষ্টা পাইলে কি হইবে? যদি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা "আমার জীবন" বাঁচান, তবেই আমি বাঁচিব; নতুবা আপনারা মহাচেষ্টা করিলেও আমাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। আপনারা অনর্থক কাঁদিয়া ব্যাকুলিত হইবেন না। কাঁদিলে কি হইবে? ঈশ্বর সমীপে "আমার জীবন" বাঁচাইবার প্রার্থনা করুন, আমি অবশ্য বাঁচিব। ঈশ্বরের কৃপাগুণে আবার আপনাদের চরণ-সেবা করিতে পারিব। ঈশ্বর যদি আমার দিন দেন, তবেই আপনারা আমাকে পাইবেন; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ঈশ্বর আমায় দিন দেন। পিতা মাতা! আপনারা আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমি বাঁচিলে শীঘ্রই আপনাদের নিকট ফিরিয়া আসিব। আপনারা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে আমাদের আগমন প্রার্থনা করুন। তাহা হইলে শীঘ্রই আমাকে পাইতে পারিবেন।" এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে, কথা শেষ হইতে না হইতে, নদীস্রোত বৃদ্ধি পাইল,—ভেলক আর দাঁড়াইল না; জনকজননী আর তনয়ার কথা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহারা গগনভেদী স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; "কি সর্ব্বনাশ হইল!" বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভেলক অদৃশ্য হইল, জনকজননীর দৃষ্টি আর বেহুলার প্রতি পৌঁছিল না; তনয়ার দেখা পাইয়াও জনকজননী তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিলেন না—সে জীবন জলে ভাসিয়া গেল।

বেহুলার জনকজননী তাঁহার অদর্শনে শেষে গৃহে ফিরিলেন; অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে, নিরাশ-বদনে নদীতট হইতে চলিয়া গেলেন। বেহুলার ভেলকণ্ড ভাসিতে ভাসিতে, তরঙ্গরঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। পিতামাতার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া একমাত্র পতির জীবনে লক্ষ্য রাখিয়া বেহুলা ভাসিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন যাইতেছে, আর দুঃখের পর দুঃখ আসিতেছে। দিনের পর দিন যাইল, বেহুলারও দুঃখের পর দুঃখ আসিতে লাগিল। জগদীশ্বর যখন যাহার প্রতি রুষ্ট হন, তখন তাহার দুঃখের আর নিবৃত্তি থাকে না। বেহুলার দুঃখেরও নিবৃত্তি হইল না, বরং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার দুঃখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেহুলা তরঙ্গোপরি ভাসমানা, তাহা একটি মৎস্যজীবীর নয়নগোচর হইল। অন্ধকারে মণির জ্যোতি নির্ব্বাণ হয় না, হীরক কয়লার মধ্যে থাকিলে, তাহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। বেহুলার রূপরাশির সৌন্দর্য্যও লুক্কায়িত থাকে নাই; সে মাধুর্য্য দর্শনে মৎস্যজীবীর হৃদয় চমকিত হইল, তাহার ভ্রূযুগল স্পন্দন-রহিত হইয়া আসিল। সে বেহুলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, মৃত শব ক্রোড়ে ভাসমানা হইবার কারণ জানিতে বাসনা করিল। বেহুলা তাহার কথার উত্তর দিলেন। উত্তর শুনিয়া মৎস্যজীবী অবসন্ন হইল, সাশ্চর্য্যে বেহুলাপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। বেহুলা কিন্তু আর সে দিকে তাকাইলেন না। আপন মনে, কান্তের অনুসন্ধানে, নদী-স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। মৎস্যজীবী নয়ন ফিরাইতে পারিল না; সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সে বেহুলাকে

আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করিতে চেষ্টা পাইল। বেহুলাকে বলিল, "গলিত মৃত পতি লইয়া তুমি কোথায় যাইবে? মৃত কি কখনও জীবিত হয়? তুমি ও আশা ত্যাগ কর। আইস, আমার সহিত সুখে বাস করিবে। আমার নিকট থাকিলে আমি তোমায় সমূহ যত্ন করিব।"

পাপ-মুখে পাপ-কথা সতী শুনিবেন কেন? যিনি পতির কারণ দিবানিশি অনাহারে, জলে জলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন; "কিসে পতির উদ্ধার হইবে? কেমন করিয়া নখিন্দরকে বাঁচাইব?" এই ভাবনা ভিন্ন যাঁহার মনে অন্য ভাবনার স্থান নাই; পিতার মায়া, মাতার স্নেহ, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর বারণ, সহচরী সঙ্গিনীগণের অনুরোধ, যে সতীর পতিভক্তির ন্যূনতাকল্পে সহায়তা করিতে পারে নাই; তিনি কেন সামান্য মৎস্যজীবীর কথায় ভুলিবেন? তিনি উপদেশচ্ছলে মৎস্যজীবীকে বলিলেন, "ভাই মৎস্যজীবী! এ আশা কেন? পরস্ত্রীর অমূল্য সতীত্বনাশে বাসনা কেন?—ইহা যে মহাপাপ! এ পাপের ক্ষমা যে ঈশ্বরের নিকটও নাই! তুমি কি কাহারও নিকট শোন নাই যে, এ পাপে জ্বলন্ত নরকে কীট-দষ্ট হইয়া মরিতে হয়! ভাই! এরূপ আশা করিও না।" দুরন্ত মৎস্যজীবী উপদেশ শুনিল না; কথায় বাধা দিয়া বলপূর্ব্বক বেহুলাকে আক্রমণ করিতে যাইল। অনাথিনী অবলার প্রতি দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ মৎস্যজীবীর আক্রমণ! কি ভয়ঙ্কর কথা! স্মরণে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, শোণিত-প্রবাহে বাধা পায়। সন্তরণপটু মৎস্যজীবী সন্তরণ দ্বারা বেহুলাকে ধরিতে যাইল। পতিবিয়োগবিধুরা বেহুলা "হরি রক্ষা করুন" বলিয়া

কাঁদিয়া উঠিল; মুমূর্ষুর ক্রন্দন দয়াল হরির কর্ণে প্রবেশ করিল। পাপ মৎস্যজীবী বেহুলাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। কলনাদিনী স্রোতস্বিনী সঙ্গিনীর দুঃখে কাতর হইলেন, ক্রোড়স্থিতা সহচরিণী বেহুলার প্রতি দুরন্তের আক্রমণ তাঁহার অসহ্য হইল, তিনিই দুরন্তের আক্রমণে বাধা দিলেন। নদী-স্রোত প্রবল হইয়া আসিল, ভেলক দ্রুতগতিতে ভাসিয়া চলিল, দুরন্ত মৎস্যজীবীর বাসনা পূর্ণ হইল না, সে সন্তরণে বেহুলাকে আক্রমণ করিতে পারিল না—মৃত পতি ক্রোড়ে সতী আপন মনে চলিতে লাগিলেন। মৎস্যজীবী সন্তরণ-শ্রমে কাতর হইয়া ফিরিয়া গেল।

মৎস্যজীবীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বেহুলার ভেলক আবার আপন মনে নদীতরঙ্গে চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দুঃখের অবসান হইল না—কোন ক্রমেই তিনি দুঃখসহ-নের অবধি দেখিতে পাইলেন না। একে অনাহারে, ক্ষুৎপিপা-সায় তাঁহার দেহ বিশুষ্কপ্রায়—প্রাণ কণ্ঠাগত, তাহাতে আবার নরক-জগতের নারকীয় কীটের বিষম দংশন! একে পতি-শোকে উন্মাদিনী—বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, তাহাতে আবার পাষণ্ড-গণের পাপ অত্যাচার—তাঁহার স্বেচ্ছায় বাধা প্রদান! বেহুলা-হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইয়া আসিল। বেহুলা আবার বিপদে পড়িলেন। আর একটি ঘাটে আসিয়া তাঁহার ভেলক আবার বাধা পাইল। এ ঘাটটিতে লোক পার হইয়া থাকে। ভেলকোপরি ভাসমানা বেহুলাকে দেখিয়া, পারের নাবিক নৌকাযোগে বেহুলার ভেলক ধরিল। এবার বেহুলা বড় বিপদে পড়িলেন, এবার আর সতীর অমূল্য সতীত্ব রক্ষা হওয়া

দুষ্কর দেখিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি নাবিক প্রতি পিতৃসম্বোধনে, সকরুণ ক্রন্দনে তাহাকে বলিলেন, "নাবিক! আপনি আমার পিতা, আমি আপনার কন্যা। পিতা হইয়া কন্যাকে রক্ষা করুন! অনন্ত নরকে কন্যাকে ডুবাইবেন না। কন্যার প্রতি দুষ্টাভিলাষ করিলে মহাপাপ হইবে; —সে পাপে বংশ থাকিবে না, আপনি ধ্বংস হইবেন, আপনার চিরজীবন জ্বলন্ত অনলে দগ্ধীভূত হইবে।" কিন্তু দুরন্ত নাবিক বেহুলার কথা বুঝিল না, পিতৃসম্বোধনে, সকরুণ ক্রন্দনে তাহার পাপ-হৃদয় বিগলিত হইল না। সে দম্ভসহকারে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমায় ছাড়িব না; কোন্ নির্ব্বোধ মণি হস্তে পাইয়া জলে ফেলিয়া দেয়? তোমায় আমি বেস্ সুখে রাখিব, আমার অর্থের অনাটন নাই, আমার গৃহে অন্নের কষ্ট নাই। আমি তোমায় অতি যত্নে পালন করিব; গৃহকর্ম্মে কষ্ট পাইতে দিব না; দাস দাসী রাখিয়া সতত তোমার সেবা করাইব। কেন তুমি এরূপ কষ্ট পাইয়া জলে জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছ? গলিত মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া আমার সহিত আইস।" নাবিক-বাক্যে বেহুলা-হৃদয় স্তম্ভিত হইল; সিদ্ধি-সাধনা দুষ্কর বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল; কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না; মনে মনে ভাবিলেন, "নাবিক-হস্ত হইতে পরিত্রাণ জন্য আরও চেষ্টা করিয়া দেখি; নাবিককে আরও স্তুতি মিনতি করিলে উহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে। অনুনয় বিনয়ের পরেও নাবিক যদি আমায় নিতান্তই পরিত্যাগ না করে, তবে আমার অদৃষ্ট এই খানেই শেষ হইবে, পতি ক্রোড়ে করিয়াই জলমধ্যে ঝাঁপ দিব।"

পরে বেহুলা নাবিককে আবার বলিলেন, "আমার অনর্থক কষ্ট দিবেন না! আমার প্রতি আপনার দুরাশা কখনই মিটিবে না, আমি অর্থের কাঙ্গালিনী—সেবার ভিখারিণী নহি; আমি যাঁহার ভিখারিণী, তাঁহাকে না পাইলে কোন মতেই জীবন রাখিব না, আপনি বহু চেষ্টা করিলেও আমার দ্বারা আপনার কোন অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না। যদিও জলে ভাসিয়া আমি আরও দুই দিন বাঁচিতে পারিতাম, কিন্তু আপনি অত্যাচার করিলে আমার জীবন আজই শেষ হইবে—আমি কোন মতে পাপ জীবন রাখিব না। আজ আমার মরিতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; কিন্তু এই মাত্র মনে দুঃখ রহিল যে, আমার আশা মিটিল না, আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারিলাম না—যাঁহার মায়ায় সকল মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তাঁহারই অনুসরণে জীবন দান করিতে না পারিয়া শেষে অত্যাচারীর হস্তে নিহত হইলাম। কিন্তু আপনার নিকট আমার শেষ আবেদন এই যে, অবলার জীবন বিনষ্ট করিবেন না। আপনার আশা সিদ্ধ হইবে না, অথচ অন্যায়াচরণে এক জনের জীবন নষ্ট করিতে সাহসী হইবেন না।"

বেহুলার নয়ন-জলে কঠিন নাবিক হৃদয় ভিজিল, পাষাণ তুল্য দৃঢ় হৃদয় অক্ষিজলে কোমলত্ব পাইল। দুরন্ত নাবিক বেহুলার ভেলক ছাড়িয়া দিল, আর বলিল, "এত সুখ তোর কপালে ঘটিবে কেন?—যা, তুই! চণ্ডালিনীর মত ডুবে মরগে যা!" বেহুলার ক্রন্দন থামিল; তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল; অত্যাচারীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন দেখিয়া, তাঁহার মনে উদয় হইল যে, "দুরন্ত যমের হস্ত হইতেও তবে

পতিজীবনের নিষ্কৃতি পাওয়াইতে পারিব।" ক্রমে ভেলক সে স্থান অতিক্রম করিল, আপন মনে কার্য্যের করণে ধাবিত হইল।

দিবা অবসান প্রায়। পশ্চিমাকাশে জলদপাশে হাস্যমুখে দিবাকর জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতেছেন; সঙ্গিনীপাশে শান্তি-সুখে শ্রান্তিদূর করিবেন বুঝিয়া যেন তাঁহার হাসি আর থামিতেছে না। তাঁহার পদতলে পতিক্রোড়ে বেহুলা কাঁদিতেছে, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না, তিনি আপন মনে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। তিনি কাঁদিলেন না, কিন্তু বেহুলা-দুঃখে জগৎ কাঁদিল; জগতের অশ্রু বেহুলা-দুঃখে অনিবার্য্য হইল—জগতের হাস্যময় মুখে ক্রন্দনের কালিমা পড়িল। কিন্তু বেহুলার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ! তাঁহার প্রতি জগতের সহানুভূতি কার্য্যকরী হইল না, বরং তাহা বেহুলার অনিষ্টকারী হইয়া উঠিল। ধর্ম্মবীর প্রহ্লাদ, পিতা হিরণ্যকশিপুর পাপ-হৃদয়ে হরি-প্রেম-সুধা ঢালিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই—হরি-প্রেমামৃত-দান পরিবর্ত্তে তাঁহাকে পিতৃ-নিধন দেখিতে হইয়াছিল; দুর্য্যোধনের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া, পঞ্চ পাণ্ডবের পরিবর্ত্তে তাঁহার বংশের অবলম্বন-যষ্টি অশ্বত্থামা-হস্তে ভগ্ন হইয়াছিল—সুখের পরিবর্ত্তে দুর্য্যোধন-হৃদয়ে তাহা গভীর দুঃখের আবির্ভাব করিয়াছিল। জগতের সহানুভূতি বেহুলার প্রতিও তাহাই হইল। সন্ধ্যা সমাগমে জগৎ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল, বেহুলাকে সহানুভূতি দেখাইতে যাইয়া সে মূর্ত্তি বেহুলার ভীতি-প্রদায়িনী হইল। আকাশ-কোলে মেঘের উদয়, নৈশান্ধকারের গাঢ় হইতে গাঢ়তর

প্রাপ্তি, জলদের কর্ণভেদী গম্ভীর গর্জ্জন, ভীষণাকারে ধারাসারে বারিবর্ষণ, তরঙ্গরঙ্গে ভাসমানা বেহুলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বেহুলা একে অন্ধকারে জলের উপরে, তাহাতে আবার বিষম বিভ্রাট! দেহোপরি প্রলয়ঙ্কর জলস্রাব, পার্শ্বস্থিত অরণ্যে বন্যজন্তুর বীভৎস আরাব, কণ্ঠাগতপ্রাণা, আসন্নাবস্থা-প্রাপ্তা বেহুলাকে বিষম সঙ্কুচিতা করিয়া তুলিল—তাঁহার সিদ্ধি-সাধনার পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বেহুলা-হৃদয় তাহাতেও বিচলিত হইল না। তিনি ভাবিলেন যে, "মৃত্যুই মানবজীবনের অন্ত। যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, হয় তাহার অন্ত কিম্বা আমার অন্ত হউক। আমি জাগতিক কার্য্যের অন্ত দেখিব; আর অন্ত দেখিতে গিয়া কখনই মধ্য-স্থল হইতে ফিরিব না। একবার যে প্রতিজ্ঞায় গৃহের বাহির হইয়াছি, নিশ্চয় সে প্রতিজ্ঞার পূরণ করিব; পূরণে হয় আমার বিনাশ হইবে, নয় "জীবন" জীবন পাইবে।" ক্রমে বাত্যা-সহকারে বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল; ক্ষণে ক্ষণে নেত্রবিমোহনকারী বিদ্যুতের জ্যোতি; মধ্যে মধ্যে তুহিনোদ্গত শিলা-সম্পাতে বেহুলাকে ভীষণ যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। তথাপি বেহুলা লক্ষ্যভ্রষ্টা হইলেন না, "পতিকে না বাঁচাইয়া কখনই গৃহে প্রত্যাগমন করিব না" এই ভাবিয়া তিনি নিস্তব্ধ রহিলেন।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইল; অবিশ্রান্তধারে বৃষ্টি বেহুলার মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহার শরীরকে নির্জ্জীব, নিস্পন্দ করিয়া ফেলিল। এই ভীষণ আবর্ত্তময়ী নিশিতে নদীতটে দুই একটি গ্রাম পরি-লক্ষিত হইয়াছিল, মনুষ্য-সমাগমশূন্য দুই একটি সামান্য পর্ণ-

কুটীরও বেহুলার নয়নগোচর হইয়াছিল; কিন্তু বেহুলা জীবনের মায়ায়, কষ্টের লাঘবতার জন্য, দারুণ শিলাবৃষ্টির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত, ভেলক হইতে অবতরিত হন নাই; সামান্য শান্তির আশায় তীরে অবতরিত হইলে মনের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিবে,—চিরশান্তি লাভের জন্য সামান্য পার্থিব কষ্ট অসহনীয় হইবে, এই চিন্তায় তিনি ভেলক হইতে অবতরণ করেন নাই। ক্রমে রাত্রিও প্রভাত হইল, বৃষ্টিও থামিল। কিন্তু বেহুলার ভেলক থামিল না।

এতত্তেও বেহুলার বিপদের হ্রাস হইল না; জগতে সকল দ্রব্যেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বেহুলা-জীবনের কিছুতেই পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তাঁহার বিপদের উপর বিপদ আসিয়া জুটিতে লাগিল; রাত্রির দুরন্ত নৈসর্গিক অত্যাচারের পরও তাঁহাকে আবার বিপদের হস্তে পড়িতে হইল। বেহুলা নদীতীরবর্ত্তী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইতেছিলেন যে, "আপনারা সর্পদষ্ট মৃতের জীবনদানোপযোগী কোন ঔষধ আমায় বলিয়া দিতে পারেন কি? আমি তাহা হইলে চিরকালের জন্য আপনাদের ক্রীতদাসী হইয়া থাকি।" মুমূর্ষুর ক্ষীণ-কণ্ঠোচ্চারিত এই অস্ফুট বাণী নদীকূলে কণ্ঠজলে দণ্ডায়মান, দেবপূজায় নিযুক্ত এক বৈদ্যের কর্ণে প্রবেশ করিল—মধুর বাণী বৈদ্য-কর্ণে সুধাধারার ন্যায় বর্ষিত হইল। বৈদ্যের জপজপ দূরে যাইল,—মুদিত নেত্র বিকসিত হইল। বৈদ্য বেহুলাকে বলিয়া উঠিল, "তুমি যদি ঐ মৃত দেহ ঘাটে রাখিয়া আমাদের গৃহে যাইয়া কয়েক দিবস অবস্থিতি করিতে পার, তবে আমি ঐ সর্পদষ্ট মৃতকে বাঁচাইতে পারি।" ঘাটের অপর সকলে

ভাবিল যে, "বৈদ্যরাজ সত্য সত্যই বুঝি সর্পদষ্ট মৃতকে বাঁচাইতে পারিবেন।" কিন্তু বেহুলার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল; বৈদ্যের আকার ইঙ্গিত এবং কথাবার্ত্তায় তিনি তাহাকে চিনিয়া লইলেন; তিনি বৈদ্যের বাটী যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন; বৈদ্য-রাজকে বলিলেন, "মহাশয়! ক্রোড়ের পুত্তলি ক্রোড়েই রাখিব, জীবন থাকিতে তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিব না। আপনার যদি আমার ক্রন্দনে দয়া হইয়া থাকে, তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় ভেলক হইতে অবতরিত হইতে না বলিয়া "আমার জীবন দানের উপায় করুন।" দুরন্ত বৈদ্যের বাসনা ভিন্ন—কল্পনা স্বতন্ত্র। সে বেহুলার কথার প্রত্যুত্তর দিল; বলিল, "তুমি জলে ভাসিয়া যাইতে পাইবে না। তুমি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ, সুতরাং তোমাকে আমি ছাড়িব না; আত্মহত্যাকাঙ্ক্ষী দুষ্টগণের রাজদ্বারে দণ্ডিত হওয়া উচিত। অতএব তুমি যদি আমার সহিত আমার বাটীতে না যাও, তবে তোমাকে ধরিয়া এখনই রাজদ্বারে প্রদান করিব।"

বেহুলা দুরন্তের দুষ্টাচরণে ভীতা হইলেন না। তাহাকে গর্ব্বসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "বৈদ্যরাজ! সামান্য রাজ-ভয়ে কিম্বা দস্যুভয়ে আমার হৃদয় ভীত নহে; প্রাণে, মানে, কিম্বা গৌরবে আমার স্পৃহা নাই যে, আমি প্রাণনাশ ভয়ে, মান্যের উচ্ছেদ-আশঙ্কায়, গৌরবের হীনতায় ভীতা হইব?" এ কথায় বৈদ্যরাজের ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল; সে ত্বরায় বেহুলাকে বন্দিনী করিয়া পাপবৃত্তি-সাধনে উৎসুক হইয়া পড়িল—সত্বরণে বেহুলার ভেলক ধরিতে যাইল। বেহুলা কাঁদিয়া উঠিলেন, স্নানার্থাগত ঘাটের অপর সকলকে বলিলেন,

"আপনারা আমার পিতা মাতা! দুরন্তের হস্ত হইতে আমার নিষ্কৃতি প্রদান করুন—এ অভাগিনীর জীবন দানে চেষ্টিত হউন।" ঘাটের অপর সকলে বেহুলার ক্রন্দন শুনিল, বেহুলার অনুসরণকারী দুরন্ত বৈদ্যের বাসনায় বাধা দিল। বেহুলার ভেলক, জীবনের শেষ বাধা অতিক্রম করিয়া আবার তরঙ্গ-মুখে আপন মনে চলিতে লাগিল।

শেষ বাধা অতিক্রম করিয়া বেহুলার ভেলক দুই একটি গ্রামের পর, পুণ্যময়ী গঙ্গার পবিত্র সলিল প্রাপ্ত হইল *।

* কথিত আছে, বেহুলার ভেলক গাঙ্গুর নদীর জলে প্রথমে ভাসমান হয়। এই নদীর তীরস্থ চাঁপাতলা গ্রামে বেহুলার ভেলক তাঁহার পিতা মাতা কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে কুড়রবন্দ, রাজপুর এবং নবখণ্ড প্রভৃতি স্থান সমূহ অতিক্রম করিয়া ভেলক দামোদর নদে পতিত হয়। দামোদরের তীরবর্তী ওঝাটি, গোবিন্দপুর, বর্দ্ধমান, গঙ্গাপুর, দেপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহ অতিক্রমের পর বেহুলা আনন্দপুর নামক স্থানে উপনীত হন। এই আনন্দপুরের দুরন্ত মৎস্যজীবী বেহুলাকে উৎপীড়িত করিয়াছিল। (১৬৭, ১৬৮, এবং ১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহার পর নর্ম্মদানদী-(অধুনা এই নদীর তীরস্থ গ্রাম সমূহ "কাণা" নদীর তীরে বর্ত্তমান আছে। বোধ হয়, "কাণা" নদীকে পূর্ব্বে নর্ম্মদানদী বলিত। বেগ-হ্রাসতা হেতু কালে তাহা এই নাম ধারণ করিয়াছে।) তীরস্থ হাবনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, পিরতলী এবং গহরপুর প্রভৃতি অতিক্রমের পর বেহুলার ভেলক গঙ্গানদীতে পতিত হয়। এই নর্ম্মদা-(কাণানদী) তটস্থ কোন পারঘাটার নাবিক (১৬৯, ১৭০ এবং ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং বৈদ্যপুরের কোন বৈদ্য (১৭৪ ১৭৫ এবং ১৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বেহুলার ভেলক আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, এই সকল নদী এবং গ্রাম অধুনা এই বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান বিভাগে বিদ্যমান আছে। তাহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, বেহুলা এই বর্দ্ধমান বিভাগেরই কোন অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং নিছনী এবং চম্পকনগরের অবস্থান এই বর্দ্ধমান বিভাগেই

ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে বেহুলার পবিত্র জীবনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল—তাঁহার তমসাচ্ছন্ন অদৃষ্টাকাশে রবির বিকাশ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যাঁহার জন্য তাঁহার পার্থিব ভবন নদীর সলিল, পিতামাতা পথের পথিক, সখাসখী জলের জন্তু, ক্রীড়ার সামগ্রী নদীর তরঙ্গ, বসন ভূষণ পতির অঙ্গ, অনশনে, অনিদ্রায়, কখনও অধোমুখে, কখনও উর্দ্ধবাহু হইয়া পরম পিতা সমীপে সতত যাঁহার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহার সেই প্রাণের প্রাণ, পতির জীবন প্রাপ্তির কণ্টকিত পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। বেহুলা দেখিতে পাইলেন, জগতে চেষ্টার ফল; আর জগৎ দেখিতে পাইল, বেহুলা-জীবনের স্বর্গীয় জ্যোতি। বেহুলার লাভ হইল, অমূল্য মণি; আর জগৎ পাইলেন, সতীত্বের দৃষ্টান্ত—পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা। ক্রমে বেহুলার ভেলক ত্রিবেণী-সঙ্গমে আসিল; পবিত্র স্থান পবিত্রাত্মার পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে সহায়তা করিল। তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল।

ত্রিবেণী-তীরে কোন রজকী বস্ত্র ধৌত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। বেহুলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় সেই রজকীকে আপনার মর্ম্ম-ব্যথা জ্ঞাপন করিলেন। মুমূর্ষুর আসন্ন-কালোচিত অস্ফুটবাক্যে রজকীকে ব্যথিত করিল—তাহার ব্যথিত মনে একটি স্মৃতির চিহ্নপাত হইল। সে বেহুলাকে বলিল, "জননি! আপনি ভীতা হইবেন না। দয়াল ঈশ্বর ব্যাধির সৃজন সঙ্গ

সম্ভবে। যাহা হউক, এ সকলের বিশেষ তত্ত্ব নির্ণীত হওয়া বড়ই কঠিন; প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে, পরিবর্ত্তনশীল জগতের কঠোর পরিবর্ত্তনে প্রকৃত তত্ত্ব বিকৃত আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

ঔষধেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন; আমরা অজ্ঞ বলিয়া তাহা চিনিয়া লইতে পারি না। কিন্তু সর্পদষ্টের জীবন-দানোপযোগী ঔষধ এ জগতে আছে; আমার প্রভু সে ঔষধ বিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থিতি করুন, আমি সত্বর ঔষধ লইয়া আসিতেছি।” এবার বেহুলা কিছু আশ্বস্ত হইলেন, ক্রমে তাঁহার নৈরাশ্যান্ধকারাবৃত মণিময় বদনের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া তাহাতে আলোকের দীপ্তি দেখা দিল। বেহুলা রজকীকে বলিলেন যে, “আপনি যদি দয়া করিয়া “আমার প্রাণ” দান করেন, তবে আমি গুরুর ন্যায়—জননীর ন্যায় আপনার সেবা করিব।”

সত্বর রজকী তাহার প্রভুর নিকট হইতে ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিল। পরে ঔষধ প্রয়োগে যাহা হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। ক্ষুদ্র মানব সামান্য বিকারে রোগীর জীবনে হতাশ্বাস হইয়া পড়ে; কত শত মুমূর্ষুর দেহ নিরাশজনিত অচিকিৎসায় কালকবলে পতিত হইয়া থাকে: জীবন থাকিতেও ভ্রমান্ধ মানব ভ্রমে পড়িয়া কত জীবন্ত-জীবন জলে বিসর্জ্জন দেয়; এ ঔষধের প্রয়োগ জগৎকে তাহাই দেখাইল। জগৎকে এ দৃশ্য অনন্ত কালের জন্য শিক্ষা দিতে লাগিল যে, “জগৎ! কোন কার্য্যেই নিরাশ হইও না। পার্থিব বিষয় তো সামান্য! এক মনে আরাধনা করিলে স্বর্গের স্বর্গীয় জীবনও প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে।” কিন্তু দুঃখের বিষয় জগতের ভোলা-মন অধিক দিন এ কথা স্মরণ রাখিতে পারিল না, সে স্বর্গীয় দৃশ্যের অন্তর্ধানে জগৎ-হৃদয়ের এ স্বর্গীয় উপদেশ অন্তর্হিত হইয়া গেল; বেহুলা-জীবনের সহিত জগৎ

সকলই বিস্মিত হইল। তাই আজ জগতে সকলেই আশাশূন্য—উদ্যমবিহীন; জগতের কোটি কোটি জীবন চিরভ্রম-নিদ্রায় অভিভূত—তাহাদের আর কোন সময়েই সাড়া সংজ্ঞা নাই—তাহারা সতত নিস্তব্ধ।

বেহুলার প্রাণের নখিন্দর জীবন পাইলেন; তাঁহার নিদারুণ মর্ম্মবেদনার অবসান হইল; তিনি যে জন্য আশ্রিত আশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন, পিতা মাতা ভাই বন্ধুর মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারিয়াছিলেন; অনাহারে অনিদ্রায় যাঁহার কারণ দিবানিশি তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা মিটিল—বেহুলার প্রাণের নখিন্দর প্রাণ পাইলেন*। চেষ্টার গুণে গলিত শব জীবিত হইল—অবলার শৌর্য্যে অসাধ্য-সাধন সাধিত হইয়া গেল। বেহুলা-নখিন্দরে রজকীর চরণে অবনত হইলেন; গুরু বলিয়া,—জন্মদাত্রী জননী বলিয়া বেহুলা-নখিন্দর তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দয়াবতী রজকী তাঁহাদের কষ্ট আর দেখিতে পারিল না; বেহুলা-নখিন্দরকে ফিরিতে অনুরোধ করিল। বেহুলা-নখিন্দর সহসা তাহার কথা শুনিলেন না, "প্রাণদাত্রী জননীর সেবায় জীবন অতিবাহিত করিব" বলিয়া রজকীর নিকট হইতে যাইতে তাঁহারা অস্বীকৃত হইলেন। রজকী কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিল না, অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহাদের বাটী যাইতে বলিল।

* কোন কোন প্রদেশে অধুনাপি সর্পদষ্ট শবের দাহ হয় না—ঐ সকল দেশীয় লোক ভেলকোপরি কিম্বা অন্য কোন ভাসমান বস্তুর উপর সর্পদষ্ট দেহ স্থাপিত করিয়া তাহা নদীস্রোতে ভাসাইয়া দেয়। অনুমিত হয় যে, বেহুলার এই অমানুষিক দৃষ্টান্তই সাধারণকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছে।

অগত্যা বেহুলা-নখিন্দর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, প্রাণদাত্রী জননীর চরণে নত হইয়া, নৌকা'পরি আরোহণ করতঃ গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মৃতের জীবন প্রাপ্তি!—অসম্ভব সংঘটন! ইহা কখনও নীরবে বিলীন হয় না; আবর্ত্তনে আবর্ত্তনে এ কাহিনী জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, লোকমুখে গল্পাকারে, কবির অমৃতময়ী লেখনীতে কাব্যাকারে এ কাহিনী জগতে প্রচারিত হইতে লাগিল। এ সম্বন্ধে কবিকল্পনা নানা কল্পনার অবতারণা করিলেন; অলঙ্কারে অলঙ্কারে সে জীবনী বিভূষিত করিয়া তুলিলেন। আমরা নখিন্দরের জীবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে যাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম, কবিকল্পনায় তাহা কত অলঙ্কারে সুসজ্জিত আছে, কবি তাহাকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ত্রিবেণীতীরের ঐ রজকী দেবরজকী; সে ত্রিবেণীতটে দেবতাগণের মলিন বস্ত্র বিধৌত করিতে আসিয়া তাহার দুষ্ট পুত্রকে নিহত করিয়া রাখিত। পরে বস্ত্র-ধৌত-কার্য্য সমাধা হইলে সে ঐ পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া আপন সঙ্গে সুরপুরে লইয়া যাইত। বেহুলা রজকীর এই লোক-কল্পনা-বহির্ভূত কার্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রজকীর চরণে অবনত হইলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনাকে "আমার প্রাণ" দান করিতে হইবে।" রজকী সহজে আত্মপরিচয় দিতে অস্বীকৃতা হইল। কিন্তু বেহুলার একান্ত অনুরোধে সে অমর্য্যাদা করিতে পারিল না। পরে সে বেহুলাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিল। তাঁহার সর্পদষ্ট পতির জীবন-প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহাকে আশ্বাস দিল। বেহুলাও এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া রজকীর সহিত বস্ত্র-ধৌত-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে বস্ত্র-

ধৌত-কার্য্য শেষ হইল—রজকীও বেহুলা প্রতি সম্প্রীত হইল। সে মৃত-পতি-ক্রোড়ে বেহুলাকে সঙ্গে করিয়া সুরপুরে দেবগণের নিকট গমন করিল। পরে দেবগণ বেহুলার পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে, তাঁহার আত্মত্যাগিতার অনুশোচনায়, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিলেন—মৃত নখিন্দর জীবন প্রাপ্ত হইলেন। মহজ্জীবনী এইরূপ কাহিনীতেই পূর্ণ হয়,—মহৎ হইতে পারিলে জগৎ তাঁহাকে এইরূপেই পূজা করিয়া থাকে।

ক্রমে বেহুলা-নখিন্দর গৃহে ফিরিলেন। নিছনীনগরে আবার ক্রন্দনের রোল উঠিল; পিতা সায় বণিক, মাতা অমলাসুন্দরী আবার কাঁদিয়া উঠিলেন; কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহারা যে ক্রন্দন কাঁদিয়াছিলেন, এ ক্রন্দন সে ক্রন্দন হইতে বিভিন্ন। সে ক্রন্দনের অত্যুষ্ণ জলের বিষম দহনে তাঁহাদের হৃদয় দহন করিয়াছিল, আর এ ক্রন্দনের শীতল সলিলে সে হৃদ্দাহ নির্ব্বাণ হইল, অশান্তিপূর্ণ হৃদয় শান্তির নিকেতন হইয়া আসিল। সে ক্রন্দন নৈরাশ্যব্যঞ্জক কালিমায় প্রাণ মন আবৃত রাখিয়াছিল, আর এ ক্রন্দন সে কালিমার উচ্ছেদ-সাধন করিয়া প্রাণ মনকে আশাপূর্ণ স্বর্গীয় জ্যোতি দান করিতে লাগিল। সে ক্রন্দনের সহিত ধ্বনিত হইয়াছিল, "বেহুলা আমাদের ফেলিয়া কোথায় যাইলে।" আর এ ক্রন্দনের ধ্বনি নীরব—ইহা বিস্ময়ব্যঞ্জক! বেহুলা পিতামাতার চরণে অবনত হইলেন; আপনার মানবকল্পনাতীত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জনকজননীসমীপে প্রদান করিলেন।

সে কাহিনী শুনিয়া জগৎ বিস্মিত হইল; মৃত নখিন্দরকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিল। মানবমুখে সে কাহিনী কীর্ত্তিত হইতে লাগিল; শাখোপরি বিহঙ্গমকণ্ঠে মৃদু মন্দ তানে

বেহুলা-সঙ্গীত আরম্ভ হইল; গোঠে গাভীকুল হাম্বারবে, অরণ্যে শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ শব্দভেদীস্বরে, ঝিঁঝিঁ ঝিল্লিরবে, তরুলতা শন্ শন্ শব্দে বেহুলা-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিল। শত শতাব্দীর পরিবর্ত্তনেও তাই আজ সে কাহিনী লুপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বে তাহা কবিমুখে গীত হইত, লোকে সংসার ভুলিয়া—আহার নিদ্রায় অনিচ্ছা দেখাইয়া, সে কাহিনী শুনিত; কিন্তু সভ্য জগতে যদিও সে কাহিনীর আজ আর সে ভাব নাই, তথাপি সাহস করিয়া বলিতে পারি, যদি যুগ যুগান্তের পরিবর্ত্তনে এই পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়, মানব-সমাজ চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া যায়, প্রাণি-জগতের চিহ্নমাত্রের যদি বিলোপ পায়, তবেই বেহুলার জীবনী বিলুপ্ত হইবে—পরিবর্ত্তনশীল প্রাণি-জগৎসহ সে কাহিনী উৎসাদিত হইবে,—নতুবা না।

রাণী রাসমণি।

ত্রিবেণী-সঙ্গমের সন্নিকটে, হালিসহরের পার্শ্বদেশে কোনা নাম্নী একটি ক্ষুদ্র পল্লীর অবস্থান আছে। কোনা সমৃদ্ধি-শালিনী নহে; তাহাতে সুবিস্তৃত রাজপথ, সুধাধবলিত, অভ্রভেদী অট্টালিকাশ্রেণী কিম্বা সুখসেব্য সুবিমল জল-পরিপূর্ণ দীর্ঘিকা পরিলক্ষিত হয় না—তাহা অন্নের ভিখারী, শ্রমজীবী, দরিদ্র, কৃষককুলের আবাসভূমি; ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটীর সমূহই তাহার অলঙ্কার—আর ঈশ্বরপ্রেমে ঊর্দ্ধশির বিটপি-রাজিই তাহার শোভা। কিন্তু এ সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরও কোনা আর একটি সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী—সে সৌন্দর্য্য মনস্নিগ্ধকারী ও হৃদয়ানন্দদায়ী। সেই সৌন্দর্য্যেই কোনা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্যা—সেই সৌন্দর্য্যেই সে সম্পূজিতা। চৈতন্যের আবির্ভাবে নবদ্বীপ, বুদ্ধের আবির্ভাবে কপিলবস্তু, রামচন্দ্রের আবির্ভাবে অযোধ্যা যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কোনা তদ্রূপ না হইলেও, সম্ভবতঃ পবিত্রা। কোনা রাণী রাসমণির জন্মস্থান—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে (১২০০ সালে) কোনা পল্লীতে রাসমণির জন্ম হয়। তিনি সামান্য কৃষিজীবী কৈবর্ত্ত-কুলোদ্ভবা। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস।

পল্লীগ্রামের সহিত যাঁহাদের সামান্য সংস্রব আছে, তাঁহারাই জানেন যে, পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র কৃষককুলের জীবিকা কিরূপ ভয়ঙ্করী। তাহারা জীবিকার জন্য চৈত্র-বৈশাখীর অগ্নিময় আতপের দারুণ সন্তাপ-দহন সহ্য করিয়া মাঠে হলা-

কর্ষণ করিয়া থাকে; বিনাবস্ত্রে—অনাচ্ছাদিত দেহে, হিমানীর বিষম দংশন অবনত মুখে স্বীকার করে; বর্ষার বিষম বর্ষণ তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যায়; প্রস্তরবৎ দৃঢ় মৃত্তিকার খনন, দুর্গম নিবিড় জঙ্গল কর্ত্তন প্রভৃতির অসহনীয় ক্লেশে তাহাদিগকে অবসন্ন করিয়া ফেলে; কিন্তু তথাপি তাহা-দের দুই বেলার আহার যুটে না—অত্যাচারী জমীদারকে কর প্রদানের পর তাহারা উদর পূরিয়া খাইতে পায় না। এই হরেকৃষ্ণ দাস সেই দরিদ্র কৃষকবংশজ; সুতরাং রাসমণি দরিদ্র কৃষক-নন্দিনী। রাসমণির শৈশব জীবন কুলোচিত দারিদ্র্য-দুঃখে অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতা অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল—কৃষক; সুতরাং রাসমণিকেও অন্নবস্ত্রের কাঙ্গালিনী হইতে হই-য়াছিল। পল্লীগ্রামের কৃষককুল সাধারণতঃ বনে বন্য শাক তুলিয়া, শুষ্কপ্রায় জলাশয়ে মৎস্য ধরিয়া অতিকষ্টে জীবন-যাপন করিয়া থাকে। রাসমণিও এ সকলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই;—সঙ্গিনী কৃষক-নন্দিনীগণের সহিত তাঁহা-কেও বন হইতে শাক তুলিয়া আনিতে হইত; বিল, খাল হইতে মৎস্যাদি ধরিতে হইত। পিতা হরেকৃষ্ণ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, রাসমণি মস্তকে করিয়া পিতার আহারার্থ অন্নাদি দিয়া আসিতেন; সময়ে সময়ে শস্যক্ষেত্রের শস্যাদিও তাঁহাকে মস্তকে করিয়া বাটীতে আনিতে হইত। এতদ্ভিন্ন হাট-বাজারের হস্ত হইতেও রাসমণি অব্যাহতি পান নাই,—পৌষের শীতে কিম্বা বৈশাখের গ্রীষ্মেও পিতা মাতার সহিত তাঁহাকে হাটবাজারে যাইতে হইত।

তৃ-বিয়োগান্তে দারিদ্র্য-দুঃখের অসহনীয় ক্লেশ তাঁহার মস্ত-কর উপর দিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল। এত দিন তিনি দুঃখাগ্নি-দহনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, মাতৃস্নেহ সে অনলে তাঁহার কোমল অঙ্গ দগ্ধীভূত হইতে দেয় নাই—তাঁহার জননী স্বয়ং সকল উত্তাপ সহ্য করিয়া তনয়াকে আপন ক্রোড়ে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখন রাসমণির সে আবরণ ছিন্ন হইয়া গেল—দুঃসহ অভাব-দুঃখ তাঁহার বড়ই কষ্টপ্রদ হইয়া উঠিল। একমাত্র পিতৃ-শ্রম-লব্ধ দ্রব্যে তাঁহাদের স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যাঘাত ঘটিল। সময়ে অন্নের অভাব—বস্ত্রের অনা-টন তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। রাস-মণি ক্ষুধার অন্ন ক্ষুধার সময় পাইতেন না—বস্ত্র ছিন্ন হইলে তাঁহার বস্ত্র যুটিত না।

এইরূপে দুঃসহ দুঃখের পর রাসমণির জীবন একাদশ বর্ষে উপনীত হইল। হরেকৃষ্ণ দাস কন্যার পরিণয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে পাত্রের অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। কিন্তু রাসমণির অদৃষ্ট ফিরিল। কলিকাতানিবাসী প্রীতরাম মাড়* নামক কৈবর্ত্তবংশজ কোন ধনবান্ ব্যক্তি আপন পুত্রের বিবাহার্থ পাত্রীর অন্বেষণে এই সময়ে হালিসহরে গমন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে রাসমণি ঐ পাত্রী-অন্বেষণকারি-গণের দর্শনে পতিত হইলেন। রাসমণি সাধারণ কৃষক-নন্দিনী-গণের ন্যায় কুৎসিতা ছিলেন না—তিনি সমধিক সৌন্দর্য্য-

*প্রীতরাম বাঁশের ব্যবসায় করিতেন। পল্লীগ্রাম হইতে তিনি বিস্তর বাঁশ জলে ভাসাইয়া কলিকাতায় আনিতেন। সাধারণতঃ ঐ ভাসমান বাঁশরাশিকে "মাড়" বলে। এবং ইহা হইতেই প্রীতরাম "মাড়" উপাধি প্রাপ্ত হন।

শালিনী রমনী ছিলেন। তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য-জ্যোতি পাত্রী-অন্বেষণকারিগণের মন হরণ করিল। দরিদ্র-নন্দিনী ধনবান-গৃহিণী হইলেন—প্রীতরামের দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র মাড়ের সহিত রাসমণির পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইল। দরিদ্র-নন্দিনী রাসমণি রাজচন্দ্রের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাঁহার অপর দুই পত্নীর পরলোকান্তে তিনি রূপগুণসম্পন্না রাসমণিকে বিবাহ করিলেন। রাসমণি, পিত্রালয়ের দুঃসহ ক্লেশের পর পার্থিব সুখের অধিকারিণী হইলেন; ক্রমে তাঁহার শৈশবের নিদারুণ কষ্টের শমতা পাইয়া আসিল; বনের শাক তুলিয়া কিম্বা জলে মৎস্য ধরিয়া তাঁহাকে আর আহারের সংস্থান করিতে হইল না; শ্বশুর শাশুড়ীর সমূহ স্নেহ পাইয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শৈশব সময় হইতেই রাসমণি মহত্ত্বের প্রিয় ছিলেন; বালিকা বয়সেই তিনি মহজ্জীবনীর অনুকরণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন; তিনি অজ্ঞ কৃষকের নন্দিনী হইয়াও, মূর্খ কৃষক-কন্যাগণের সহচারিণী থাকিয়াও, মহত্ত্বের আরাধনায় দিন অতিবাহিত করিতেন। হরেকৃষ্ণ দাস বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পাঠ করিয়া 'বর্ণজ্ঞান' লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারতাদি পড়িতে পারিতেন। তজ্জন্য মূর্খগ্রামে তিনি বিদ্বান্ বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অবসর-ক্রমে গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করিত। হরেকৃষ্ণ সকলের অনুরোধ ক্রমে মধ্যে মধ্যে রামায়ণাদি বেস্ সুর করিয়া পাঠ করি-

সই সকল মধুর গ্রন্থের পাঠ একমনে শ্রবণ করিতেন। কিন্তু অন্যের রামায়ণ শ্রবণ হইতে তাঁহার শ্রবণ বিভিন্ন ছিল। অন্যে শ্রবণ করিত ভৌতিক কাহিনী—রাক্ষস-বানরের বিষম সংগ্রাম;—ভুলিয়া যাইত উপকথার ন্যায়। আর রাসমণি তাহাতে দেখিতেন, সত্য-সরলতার চিত্র, ধর্ম্মের জয়—পাপীর পরিণাম;—তিনি হৃদয়ে অাঁকিতেন, অমুচ্য আকারে সাধুতার দৃষ্টান্ত, আত্মত্যাগিতার চিত্র, দয়া ও সত্যের প্রতিমূর্ত্তি। ধর্ম্ম-বীর বৌদ্ধ, বনের বিটপীর নিকট শিখিয়াছিলেন দয়া—আপনার অভাব রাখিয়াও অন্যের তৃপ্তিসাধন; গম্ভীর হিমাদ্রির নিকট শিখিয়াছিলেন, আত্মসংযম—ঈশ্বরধ্যানে পার্থিব ভোগ-তৃষ্ণার বিতৃষ্ণা; জড় পদার্থের নিকট শিখিয়াছিলেন, অহিংসা—স্বয়ং বিচূর্ণিত হইলেও অন্যের সামান্য ক্ষতি না করণ। শৈশব সময় হইতেই রাসমণিও পবিত্র চরিত্রের অনুকরণে প্রবৃত্ত হন। আর ঐ চরিত্রানুকরণেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সৎপথে থাকিলে অন্নের কাঙ্গালে দরিদ্রও মহত্ব লাভ করিতে পারে, আর কুপথে যাইলে সার্ব্বভৌম ভূপতিকে দুর্দ্দশার চরম সীমায় পতিত হইতে হয়। তিনি স্মরণ রাখিয়াছিলেন, অত্যাচারী রাবণের পরিণাম, আর ধর্ম্মনিষ্ঠ রামচন্দ্রের কীর্ত্তি।

যাহা হউক, বিবাহের পর হইতে বয়োবৃদ্ধি সহকারে রাসমণির মনোবৃত্তি সমূহের পূর্ণতা পাইতে লাগিল; রাসমণি আপনার উন্নতি অবনতির পথ সমূহ চিনিয়া লইতে লাগিলেন। এত দিন রাসমণি লেখাপড়া শিক্ষার কোন সুবিধা পান নাই, মূর্খ কৃষক-নন্দিনীপরিবৃত থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যার জ্যোতি প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুযোগ পাইয়া রাসমণি এখন

পতির নিকট লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। বঙ্গগৃহে এ সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইত—বিদ্যা-শিক্ষা বিশেষ হানিজনক বলিয়া এ সময়ে বঙ্গাঙ্গনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সুতরাং রাসমণির লেখাপড়াতেও বড়ই বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল; শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজনবর্গ তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষার প্রতিবন্ধক হইলেন। "স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিখিতে নাই" বলিয়া পরিবারবর্গ রাসমণির শিক্ষায় বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু রাসমণি শিক্ষা ত্যাগ করিতে পারিলেন না; গুরুজনের ভয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পাঠাভ্যাস ত্যাগ করিলেও, তিনি সকলের অজ্ঞাতে পতির নিকট রাত্রিতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। অভিভাবকগণের বারণ না শুনিয়া, কর্ত্তব্যবোধে লেখা পড়ায় রত হইলেন। এই রূপে রাসমণি যে সামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, পরে তাহা সমূহ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে (১২২৪ সালে) রাসমণির শ্বশুর প্রীতরাম মাড় লোকান্তরিত হন। লোকান্তর গমনের পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজচন্দ্রের হস্তে পতিত হইল। রাজচন্দ্র যদিও বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তিনি পত্নীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। পতিপত্নীর সুবিবেচনায় যে সকল স্থির হইত, তিনি সম্ভবতঃ সেই সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন। পাঠক! পাঠিকে! রাজচন্দ্রের এরূপ চরিত্রে আপনারা বিস্মিত হইতে পারেন, তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া গালি দিতে পারেন। কিন্তু

াক।—যুবকের হস্তে অতুল সম্পত্তি অপব্যয়িত হইবার আশ-ায়, গৃহে অন্য কোন সুপরামর্শের পাত্র না থাকায়, তিনি াহার বুদ্ধিমতী পত্নীর নিকট সুপরামর্শ গ্রহণ করিতেন—া দোষের নহে।

রাসমণির পরামর্শ মূল্যবান; সে পরামর্শের অন্তর্নিহিত াত্য, দরিদ্রের দুঃখ নিবারণের জন্য—সাধারণের উপকারার্থে তত চেষ্টিত থাকিত। তিনি দরিদ্র-নন্দিনী হইতে ধনবান-হিণী হইয়াছিলেন; অন্নের ভিখারী হইতে অন্নের অধিকারী ইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনোভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত য় নাই। তাঁহার শৈশব-কাহিনী সতত তাঁহার স্মৃতিপথে দরি-দ্রের দুঃখ-কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিত, আর তাঁহার অন্তর াতত সে স্মৃতিতে কাঁদিত; তাই তাঁহার পরামর্শও সেই স্মৃতির অনুসারী ছিল। রাজচন্দ্রের ব্যবসায়-বিস্তৃতি ছিল। কলি-কাতার অন্যতম পল্লী বেলেঘাটায় তাঁহাদের দুইটি "আড়ত"* ছিল। তথায় বাণিজ্য-দ্রব্যাদি আনয়নের বিশেষ অসুবিধা থাকায়, একটি খাল-খননের প্রস্তাব হয়। ঐ খাল-খননের প্রস্তাবে রাসমণি বলেন যে, "যদি নিতান্তই খাল-খননের প্রস্তাব স্থির হইয়া থাকে, তবে দীন দুঃখীর পারাপারের জন্য ঐ খাল-মধ্যে নৌকা রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য—এবং দরিদ্রগণকে বিনা-ব্যয়ে ঐ নৌকায় পার-করণের ব্যবস্থাকরণ সম্যক্ বিধেয়।" এতদ্ভিন্ন রাসমণি শবদাহের জন্য নিমতলার ঘাট এবং সাধারণের স্নানের জন্য আহিরীটোলা এবং বাবুর ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেন।

রাসমণি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও আপনায়

* ব্যবসায়ীদিগের বিস্তৃত দোকানকে আড়ত বলে।

দরিদ্র পিতা এবং আত্মীয় স্বজনকে ভুলিতে পারেন নাই। বিপুল অর্থের অধিকারিণী হইয়াও তাঁহার দারুণ হৃদ্‌ভাবনার উপশম হয় নাই; তাঁহার শৈশব-চিন্তা বয়োবৃদ্ধিসহকারে বর্দ্ধিতায়তন ধারণ করিয়াছিল। তিনি শৈশবে ভাবিয়াছিলেন, আপনার ভাবনা—পিতা মাতার কষ্ট; কিন্তু তিনি এখন ভাবিতে লাগিলেন, অন্যের ভাবনা—সমগ্র দরিদ্রের দারিদ্র্য-পীড়ন। পূর্ব্বে মৎস্য ধরিতে যাইয়া,—শাক তুলিতে তুলিতে তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল, "আমার এ কষ্ট কি ঘুচিবে না?" কিন্তু এখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "আমার দরিদ্র ভাই ভগ্নীগণের কি হইতেছে?—তাহারা যে অনাহারে মৃত-প্রায়!—কেমন করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইব? আর আমার জন্মদাতা পিতা—যিনি দারুণ অভাবের সময় জীবনের অবশ্যম্ভাবী পতনকালে আপনি অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকিয়াও আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহার কষ্ট ভুলিয়া থাকিব কেমন করিয়া?" রাসমণি কেবলমাত্র এইরূপ ভাবনা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন না—তাঁহাদের দুঃখ দূর করা তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল। তিনি দরিদ্র পিতার ভরণ পোষণের জন্য একটি মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন; এবং অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয় স্বজনেরও দারিদ্র্য-দুঃখ দূরীকরণার্থ বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। অনেককে আপনার বাটীতে আনয়ন করিয়া আহারাদি দানেরও ব্যবস্থা করিয়া-দিলেন।

৪১ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে (১২৪৩ সালে) রাজচন্দ্র

চনটি কন্যা বর্ত্তমান ছিল। রাজচন্দ্র মহৎলোক বলিয়া রিচিত ছিলেন। দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানের জন্য গবর্ণমেণ্ট ইতে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। াহা হউক, রাজচন্দ্রের পরলোকান্তে সমস্ত সম্পত্তি রাসমণির স্তে পড়িল—অবলা বঙ্গাঙ্গনা বিপুল ঐশ্বর্য্যের একাধিপত্য পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল—এখন পতির বিয়োগান্তে তাঁহার হৃদয়ে আরও দৈব-ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এত দিন সংসার-মায়ায় তাঁহার মন যে সামান্য পরিমাণেও আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে তাহার সে বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল। কেবল দরিদ্রের উপকার করিব—সাধারণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীবন-যাপন করিব, এখন তাঁহার মনের ভাব এইরূপ হইল।

রাসমণি সমূহ তেজস্বিনী ছিলেন। তিনি সকল প্রকার ন্যায়দণ্ড অবনত মস্তকে সহ্য করিতে পারিতেন; কিন্তু কাহারও অন্যায় আচরণ তাঁহার কোমল হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিত। সার্ব্বভৌম নৃপতির অন্যায় আচরণও তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। হিন্দুদিগের প্রধান উৎসব দুর্গোৎসবে রাসমণি বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন, বিস্তর দরিদ্রকে অন্নাদি দান করিতেন। দুর্গোৎসব উপলক্ষে সন্নিকটস্থ রাজপথ সমূহ বাদ্য-ধ্বনিতে সর্ব্বদা ধ্বনিত হইত; সে ধ্বনিতে হিন্দুর প্রাণ নাচিয়া উঠিত, আর বিজাতীয়ের বিজাতীয় কর্ণ বধির হইয়া আসিত। তাঁহার বাটী হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রাজপথ এই আনন্দ-ধ্বনিতে সতত পূর্ণ থাকিত। হিন্দুর এই আনন্দোৎসব বিজাতীয়ের অসহ্য হইল। কোন ইংরাজ পুলিষের সহকারিতায় রাসমণির

আনন্দোৎসবের আনন্দধ্বনি বন্ধ করিতে প্রয়াসী হইল; পুলিশের চক্ষের উপর ইংরাজ-অত্যাচারে হিন্দুর ধর্ম্মে বাধা পড়িল। ত্বরায় রাসমণিসমীপে এ সংবাদ উপনীত হইল। রাসমণি তাহাতে ব্যথিত হইলেন, অপমান-বিষে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। একে হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মে প্রতিবন্ধকতাচরণ, তাহাতে আবার তাঁহার অবমাননা! এ অবমাননা রাসমণির সহ্য হইল না। তাঁহার অধিকারে তাঁহার বিনির্ম্মিত পথে, তাঁহারই প্রতি বিজাতীয়ের অপমান! শুদ্ধ অবমাননা নহে, তাঁহার ধর্ম্মে বাধা প্রদান—শাণিত শরে মর্ম্ম-বিদ্ধ করণ! রাসমণি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "দেখিব কেমন ইংরাজ! আমারই রাস্তায় আমারই অপমান! নিশ্চয় এ অপমানের প্রতিশোধ দিব।" ত্বরায় রাসমণির আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, "আমার রাস্তায় শীঘ্র ইংরাজের গতিরোধ হউক—বিজাতীয়ের অশুদ্ধ পদধূলি দ্বারা আমার পথ কলুষিত করিতে চাহি না।—শীঘ্রই পথ বন্ধ করা হউক।" রাজপথ বন্ধ হইল—সে পথে ইংরাজের গতিরোধ হইল। পুলিষে সংবাদ যাইল—ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে রাসমণির নিকট অনুরোধপত্র আসিল; পথ মুক্ত করিবার জন্য ইংরাজ রাসমণির নিকট অবনতমস্তক হইলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে মন্তব্য প্রচারিত হইল যে, রাসমণি আপন পথের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন—তাহাতে আর কাহারও কোন আপত্তি উঠিবে না। মন্তব্য প্রচারিত হইলে রাসমণি পথ মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপ সাহসে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়ে রাসমণির জয় হইল।

দখাইয়াছিল; তাঁহার শৌর্য্য আরও অনেক বার ইংরাজ-রাজকে চমকিত করিয়াছিল। প্রজা-শোষক ইংরাজ এই সময়ে একটি জলকর-প্রথা প্রচলিত করিলেন। জলকর-প্রথা দরিদ্র মৎস্যজীবিগণের জীবিকার প্রতিবন্ধক হইল। গঙ্গার মৎস্য ধরিয়া মৎস্যজীবিগণ দুঃখে জীবন অতিবাহিত করিত, ইংরাজ তাহাদের সেই জীবনোপায় কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হইলেন। দরিদ্র ধীবর-সমাজ স্তম্ভিত হইল—"অন্নাভাবে মরিতে হইবে" ভাবিয়া তাহারা মর্ম্মভেদী স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ত্বরায় সে ক্রন্দন দরিদ্র-জননী রাসমণির কর্ণে প্রবেশ করিল; দরিদ্রের ক্রন্দনে রাসমণির হৃদয়ও কাঁদিল! দরিদ্রে অন্নদান যে জীবনের ব্রত, সে জীবন কেমন করিয়া অকারণে ইংরাজ-অত্যাচারে সহস্র দরিদ্রের অন্ন-সংস্থান হরণ করিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? দরিদ্র দর্শনে যে প্রাণের অশ্রু অনিবার্য্য হয়, সে প্রাণ দরিদ্রের দুঃখে সহানুভূতি না দেখাইয়া কেমন করিয়া আর সুস্থির থাকিতে পারিবে? রাসমণি ধীবর-সমাজকে আশ্বাসিত করিলেন; বলিলেন, "তোমাদের ভয় নাই—তোমাদের এ কষ্ট দূরীকরণার্থ আমি চেষ্টা পাইব।"

রাসমণির মুখ-নিঃসৃত প্রতিজ্ঞা কখনও বিফল হইতে দেখা যায় নাই। মৎস্যজীবিগণ সমক্ষে তাঁহার মুখ হইতে যে বাক্য একবার উচ্চরিত হইয়াছে, তাহাও আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না; দরিদ্রের ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় হইতে যে ক্রন্দন-ধারা বিনির্গত হইয়াছে, সে ধারা বাষ্পে পরিণত হইয়া শূন্যে বিলীন হইল না—তাহার পরমাণু সমষ্টি একত্র সম্মিলিত হইয়া বেগবতী স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিল; সে পরিবর্দ্ধনশীল বেগমুখে

পড়িয়া ইংরাজের দরিদ্র প্রতি অত্যাচার-জল্পনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পরমাণু আকারে বিলীন হইয়া গেল। পাণ্ডবোচ্ছেদ-ঈপ্সিত দুর্য্যোধন-প্রেরিত সশিষ্য দুর্ব্বাসা, দীন দশায় অরণ্যে নির্ব্বাসিত পঞ্চপাণ্ডবের উৎসাদনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু চক্রধারীর চক্র সে সঙ্কল্প বিচ্ছিন্ন রাখিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। দরিদ্র ধীবরসমাজের শোণিত-শোষক করও রাসমণির বুদ্ধি-চক্রে সেইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। প্রথমতঃ রাসমণি অনুনয় বিনয়ে ইংরাজ-মতির ভিন্ন-গতি করিতে সচেষ্টিতা হইলেন; কিন্তু দাম্ভিক ইংরাজের কঠিন কর্ণ রমণীর আবেদনে বধির রহিল; দরিদ্র-শোণিত-শোষক জলকর-প্রথা উঠিয়া যাইল না। রাসমণির আবেদন অগ্রাহ্য হইল; তাঁহার ব্যথিত হৃদয় দারুণ দণ্ডে আঘাতিত হইল; তাঁহার বাক্যের সফলতার পক্ষে প্রতি-বন্ধকতা ঘটিল।

কিন্তু তাই বলিয়া রাসমণির অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে বাক্য বহির্গত হইয়াছে, তাহা কি মিথ্যা হইবে? মৃতের বিচ্ছেদে মানবহৃদয় মর্ম্মভেদী স্বরে কাঁদিয়া উঠিলে, লোকে সে ক্রন্দনের উপশমার্থে "মৃত ফিরিয়া আসিবে" বলিয়া কত মধুর সম্ভাষণ প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু সে সম্ভাষণ কার্য্যকরী হয় না, মৃত জীবিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না; তাই বলিয়া দরিদ্র ধীবর-সমাজের প্রতি রাসমণির মধুর সম্ভাষণ কি অকার্য্যকরী হইবে?—না, কখনই না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হইবার নহে। অগত্যা তিনি স্বয়ং ইংরাজ-রাজকে ধীবরসমাজের প্রতি আরোপিত সমগ্র জলকর প্রদান করিতে স্বীকৃতা হইলেন—বার্ষিক দশ সহস্র

তাহাদের অন্নদাত্রী জননী তাহাদের জন্য অন্নের সংস্থান করিতেছেন দেখিয়া, তাহারা পরিতুষ্ট হইল।

রাসমণির অন্তরে দরিদ্রের অভাবমোচনজনিত কথঞ্চিৎ আনন্দের বিকাশ হইলেও, সে আনন্দে তাঁহার হৃদয় সম্যক্ পরিপ্লুত হইল না। এরূপ মহৎকার্য্যে হৃদয় যেরূপ আনন্দে আপ্লুত হওয়া কর্ত্তব্য, তাঁহার হৃদয়ে সে আনন্দের কিছুই প্রকাশ পাইল না। তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই, তিনি জলকর-প্রথা একেবারে তিরোহিত করিতে পারেন নাই, এই জন্য তাঁহার চিত্ত সুস্থির হইতে পারিল না। মৎস্যজীবিগণের দুঃখ দূরীকরণের পরও তাঁহার হৃদয় জলকর-প্রথার উৎসাদনে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "আমার অর্থের অনাটন হইলে কে আর ধীবর-সমাজকে বাঁচাইবে ?" এই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত চিন্তিত হইল"। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, "এখন যেন আমি ধীবর-সমাজকে রক্ষা করিলাম, কিন্তু আর দুই দিন পরে, আমার পরলোকান্তে, কঠিন করভারে আবার যে তাহাদিগকে অবসন্ন হইতে হইবে! তাহা হইলে আমা হইতে ধীবর-সমাজের আর কি উপকার হইল ? তাহাদের যে ক্রন্দন, তাহা হইলে সেই ক্রন্দনই যে রহিয়া গেল!" সময়ের আবর্ত্তনে তাঁহার ভাবনার নিবৃত্তি হইল না; চিন্তা চিন্তামাত্রেই শেষ হইয়া গেল না। তাহা দিন দিন ভিন্নাকারে বিস্তৃতায়তন ধারণ করিতে লাগিল। তিনি এত দিন কেবলমাত্র ভাবিয়াছিলেন, দরিদ্র ধীবরসমাজের ভাবনা—তাহাদের দারিদ্র্য-দুঃখ দূরীকরণের জল্পনা; কিন্তু বিস্তৃত আয়তনে এখন সে চিন্তার গতি হইল ভিন্ন রূপ—তাঁহার লক্ষ্য হইল সমগ্র জাতির জাতীয়তার সংরক্ষণে। এখন

তাঁহার ভাবনা হইল, "দরিদ্রের জন্য করভার বহন করিলাম সত্য; কিন্তু ইহাতে যে ইংরাজের অত্যাচার-দণ্ড প্রশ্রয় পাইল! তাহার প্রতাপ বৃদ্ধি পাইলে, দিনে দিনে সমগ্র ভারতবাসীকে যে, সে প্রতাপের বিষম শাসনে জর্জ্জরিত হইতে হইবে! অন্যায় ইংরাজ-শাসনের প্রতিকার না করিয়া, তাহার প্রশ্রয় প্রদান করিলে আর কার্য্য হইল কি? এখন কার্য্য হওয়া আবশ্যক—জলকর-প্রথার একেবারে উচ্ছেদসাধন।"

ভারতে অত্যাচারীর সংখ্যা বিস্তর, কিন্তু অত্যাচার-নিবারকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। জমীদারের প্রজাপীড়ন অভ্যস্ত আছে, কিন্তু দরিদ্র প্রজার অনাহারমরণে কাহারও লক্ষ্য নাই। এ সময়ে ভারতে প্রজাপালক নামধারী প্রজাপীড়ক জমীদার-দলের অপ্রতুল না থাকিলেও, সামান্যা রমণী রাসমণি ভিন্ন জলকর-প্রথার বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হইল না। রাসমণি আবার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন। কিন্তু এবারও তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইল না—ঘৃণ্য অপমান এবারও তাঁহাকে অবমানিত করিল। কিন্তু এবার আর সে অবমাননা তাঁহার সহ্য হইল না। দারুণ ইংরাজ-অত্যাচার-দণ্ডের প্রশ্রয় এবার আর তিনি দিতে পারিলেন না। ত্বরায় তিনি এক সুবুদ্ধিসম্পন্ন কৌশলের উদ্ভাবনা করিলেন। সে কৌশলের অচিন্তনীয় প্রভাবে ধীরভাবে, গাম্ভীর্য্যের মধ্যে তাঁহার বাসনার সফলতা হইল। তাঁহার আদেশক্রমে ভৃত্যবর্গ লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ বয়ায়*

* সমুদ্র ও নদীগর্ভে নৌকা ও জাহাজ প্রভৃতি বাঁধিবার জন্য লৌহময় শূন্যগর্ভ, গুম্বজাকৃতি একপ্রকার পদার্থ ব্যবহৃত হয়। ঐ গুম্বজাকৃতি ভাস-

নদীমুখ বন্ধ করিল ; নদীপৃষ্ঠে অর্ণবযান, বাষ্পীয় পোত কিম্বা নৌকার গতি রোধিত হইল। ইংরাজ বিপদে পড়িলেন। বাণিজ্য-পোতাদি কলিকাতায় আসিতে পারিতেছে না বলিয়া, গবর্ণমেণ্টে বিস্তর আবেদন পড়িতে লাগিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাসমণি সমীপে ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। তদুত্তরে রাসমণি যাহা বলিলেন, তাহা বিস্ময়ব্যঞ্জক—মানবকল্পনা-বহির্ভূত।

সে উত্তরের রমণী-কণ্ঠ-নিনাদিত বীর্য্যপূর্ণ বাক্য ইংরাজ-কর্ণে ধ্বনিত করিল যে, "পোতের ঘর্ষণে নদীর মৎস্য পলাইয়া যায়—মৎস্য ধরণের ব্যাঘাত ঘটে। আমি দশ সহস্র টাকায় নদী জমা লইয়াছি ; সুতরাং মৎস্যের সংরক্ষণে নদী-পৃষ্ঠে পোতের গতি বন্ধ রাখিব—ইহাতে কাহারও কথা শুনিব না।" বঙ্গাঙ্গনার কোমলকণ্ঠে এরূপ কঠিন বাণীর বহির্গমন আশ্চর্য্যজনক। এরূপ বাণী বীরের মুখে শোভা পায়। দৃষদ্বতীতটে পৃথ্বীরায়ের, হলদিঘাটে প্রতাপসিংহের কিম্বা রামনগরে শিখ-সৈন্যের মুখে এরূপ বাক্য উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু অতুলনীয় ইংরাজ-ক্ষমতার সম্মুখে পতিত বাঙ্গালীর কুলনারীর মুখে এরূপ বাক্য অভিনব ভাবোদ্দীপক। এ বাক্যে ইংরাজ বিস্মিত হইল, জগৎ চমকিয়া উঠিল। এ বুদ্ধির মর্ম্মভেদকরণ ইংরাজ কল্পনার বহির্ভূত বলিয়া ইংরাজের প্রতীতি জন্মিল। কিন্তু তথাপি ইংরাজ ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে ছাড়িল না, ধর্ম্মের মর্ম্মোচ্ছেদে অন্যমুখ হইল না। পুলিষ-সৈন্যের সহায়তায়, ন্যায়-ধর্ম্মের বিচার না করিয়া, আপনার ক্ষমতার বলে ইংরাজ নদীমুখের সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। অবলা কুলনারীর

ক্ষমতা দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ বল প্রদর্শনে বিধ্বস্ত করিল। কিন্তু রাসমণি তাহাতেও ভীতা হইলেন না—এ অত্যাচারেও তাঁহার অধ্যবসায় ক্ষীণাকার ধারণ করিল না। তিনি বলিলেন, "আমি সহজে ছাড়িব না—এ জলকর-প্রথার উচ্ছেদসাধন আমার জীবনের ব্রত। ব্রতের উদযাপনে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার। তবু দেখিব, কেমন করিয়া ইংরাজ-অত্যাচার প্রশ্রয় পায়।"

অধ্যবসায় অটুট রহিল; রাসমণি সর্ব্বস্বান্ত হইতেও উদ্যত হইলেন। এ দেখিয়া ইংরাজ ভীত হইল। তুষাগ্নি-উদ্ভূত অনল-শিখা, কালে প্রচণ্ড আকারে সমগ্র রাজ্য ভস্মসাৎ করিতেও পারে, বলিয়া ইংরাজের প্রতীতি জন্মিল। ইংরাজের স্মরণ-পথে উদিত হইল, ভারত-রমণীর শৌর্য্যকাহিনী; কর্ম্মদেবী-কুতবের ভীষণ যুদ্ধ—রাজস্থানে অবলার আত্মত্যাগ। ইংরাজের জ্ঞান জন্মিল, জলকর-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট হইতে বিজ্ঞাপিত হইল যে, জলকর-প্রথা আর থাকিবে না—তাহার অত্যাচার আর কাহাকেও সহিতে হইবে না। দেশ ধ্বনিত হইল রাসমণির জয়-নিনাদে। নগরী নাচিয়া উঠিল—আনন্দ-ধ্বনিতে। ধীবর-কণ্ঠে মাঠে ঘাটে গীত হইতে লাগিল—রাসমণির মাহাত্ম্যসম্বলিত গীতিকা।

নীলকরদিগের অত্যাচার ভারতে নূতন নহে। রাসমণির সময়েও এ অত্যাচারের সমধিক প্রাবল্য ছিল। যে অত্যাচারে কত লোক গৃহত্যাগী হইয়া ভিখারী হইয়াছে; যে অত্যাচার কত কুলনারীর পবিত্র কুল-মাহাত্ম্য নষ্ট করিয়াছে; যে অত্যাচার অকারণে কত শত জীবনের বিনাশ-সাধন করিতে পারি-

রাছে; রাসমণির বক্ষের উপর, তাঁহারই জমীদারীতে সেই অত্যাচার প্রাধান্য লাভ করিল। যশোহরের অন্তর্গত মকীম-পুরে রাসমণির একটি জমীদারী ছিল; দুরন্ত নীলকরগণ মকীমপুরে তাঁহার প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহাদিগের জমীতে বলপূর্ব্বক নীলের বীজ বপন করিতে লাগিল। ত্বরায় এ সংবাদ রাসমণির হৃদয়ে ব্যথা দিল। যে হৃদয় চির দিনই দরিদ্রের দুঃখে কাঁদিয়া থাকে; যে জীবনের নিত্য ব্রত দরিদ্রের দুঃখ দূরী-করণ,সে হৃদয়—সে জীবন আর কেমন করিয়া প্রজাপুত্রের প্রতি দুর্দ্ধর্ষ নীলকরগণের নিপীড়ন-ক্লেশ সহ্য করিবে? তিনি অত্যা-চারীর হস্ত হইতে আপনার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে সচেষ্টিত হইলেন। অচিরে তাঁহার আদেশক্রমে কলিকাতা হইতে প্রজা-বর্গের সহায়তার জন্য কতকগুলি বলবান লাঠিয়াল মকীম-পুরাভিমুখে প্রেরিত হইল। রাসমণি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, "তোমরা কিছুতেই ভীত হইও না,প্রাণপণে কার্য্যো-দ্ধার করিও। ইহাতে যত কিছু ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, আমি তাহা করিব। তজ্জন্য তোমরা চিন্তা করিও না।"

রাসমণির এরূপ আশ্বাস-বাক্যে প্রজাবর্গ আশ্বাসিত হইল; তাঁহার সাহসিকতায় প্রজাবর্গ উত্তেজিত হইল। সকলে মিলিয়া অত্যাচারী নীলকর সাহেবদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সাহেবেরাও সহজে ছাড়িল না। দুই দলে বিদ্রোহ বাঁধিল। প্রজাবর্গের অভিলাষ, আপনাদের অধিকার সংরক্ষণ। আর নীলকরগণের বাসনা, তাহাদের সে অধিকারে অযথা বাধা প্রদান। কিন্তু দুরন্ত অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের

বাসনা পূর্ণ হইল না; বিদ্রোহে তাহারা পরাজিত হইল—সকলেই মৃতপ্রায় মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়া আইনের সাহায্য লইল। কিন্তু রাসমণি তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইবার নহেন। তিনি সদম্ভে তাহাদের প্রতিযোগিতা অবলম্বন করিলেন। দৃঢ় অধ্যবসায়ে, ও বিস্তর অর্থব্যয়ের পর বিচারে রাসমণির জয় হইল। দুরন্ত নীলকরদলের দর্প চূর্ণ হইল; বিষম প্রহারে তাহাদের বিষ-দন্ত ভাঙ্গিয়া গেল। এই অবধি এ প্রদেশে নীলকর সাহেবদিগের কর্তৃক আর কোন অত্যাচার সংঘটিত হইতে শুনা যায় নাই। রাসমণির বীরত্বে ভীষণ দৌরাত্ম্য-অনল একেবারেই নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। ভবিষ্যতে সে অনল জ্বলিতে আর কেহ দেখে নাই।

এতদ্ভিন্ন রাসমণির জীবনে আরও বিস্তর বীর্য্যের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে সকল বৃত্তান্তের বিশদ ব্যাখ্যা অসম্ভব। তাঁহার আরও একটি বীরত্ব-কাহিনীর উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব। যখন সিপাহি-বিদ্রোহের জ্বলন্ত অনল দিগ্ব্যাপ্ত হইয়াছে; বিষম হিন্দু-শৌর্য্যে যখন ইংরাজ-সৈন্য বিক্ষিপ্ত প্রায়; রাসমণির জীবনের তাৎকালিক একটি ভয়াবহ দৃশ্য জগৎকে চমকিত করিয়াছিল। বাঙ্গালায় সে দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই; কেবলমাত্র সে দৃশ্য দেখিয়াছি, রাজস্থানে রাজপুত জাতির মধ্যে, আর পশ্চিম ভারতে আর্য্যহিন্দুদিগের হৃদয়ে। সিপাহি-বিদ্রোহে ইংরাজ-সৈন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, তাহারা উন্মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে। তাহাদের অত্যাচার-স্রোতে সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিত প্রায় হইয়া উঠে। তাহারা হিন্দু মুসলমানের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার আরম্ভ করে। এক দিন

ঐ উন্মত্ত ইংরাজ-সৈন্য জান-বাজারে রাসমণির বাটীর সন্নিকটস্থ দরিদ্রগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করে; দোকানদারের দোকান হইতে দ্রব্যাদি কাড়িয়া লয়, তাহাদের গৃহাদি ভাঙ্গিয়া দেয়। রাসমণি চিরকাল হইতেই দরিদ্রের জননী। জননী হইয়া তিনি পুত্রগণের প্রতি দুষ্টমতি ইংরাজ-সৈন্যের অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বভাবের গুণে পশু পক্ষী হইতে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই আপন সন্তানের দুঃখে কাতর হয়; আপন প্রাণ উপেক্ষা করিয়া সন্তানের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা পায়। দরিদ্র-জননী রাসমণিও আপনার সন্তানগণকে ভীষণ যাবনিক অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আপনার ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন "যেমন করিয়া পার, দুরন্ত ইংরাজ-সৈন্যদিগকে জানবাজার হইতে দূর করিয়া দাও।" আদিষ্ট ভৃত্যগণ তাহাই করিল। বংশ-যষ্টির দারুণ আঘাতে তাহাদিগকে বিঘাতিত করিয়া বিদূরিত করিল।

কিন্তু এ তাড়নার ফল ফলিল বিপরীত। দরিদ্রের উপকার করিতে গিয়া রাসমণির সমূহ অপকার হইল। বিতাড়িত ইংরাজসৈন্য তাহাদের অধিনায়কসহ দলবদ্ধ হইয়া রাসমণির ভবন আক্রমণ করিল। আক্রমণমাত্র ভৃত্যগণ পলাইল, কর্ম্মচারীরা লুকাইল। গৃহ ক্রন্দন-ধ্বনিতে ধ্বনিত হইল; কুল-মহিলাগণ মর্ম্মভেদী করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এ সময়ে এরূপ ক্রন্দন ভারতে নূতন নহে। এ ক্রন্দন কাঁদিতেছে, কানপুর, দিল্লী, বারাণসী, সেতারা, ঝাঁসি। কুলকামিনীগণের ক্রন্দনে এইরূপে বঙ্গগৃহও কলুষিত হইতে লাগিল। পৌরজন কাঁদিল বটে, কিন্তু ইহাতে রাসমণি কাঁদিলেন না। ক্রন্দনের পরি-

বর্ত্তে তাঁহার সেই কমনীয় কামিনী মূর্ত্তি অপূর্ব্ব তেজোময় আকার ধারণ করিল। পতির বিয়োগান্তে এত দিন যে করপ্রদেশ অনলঙ্কৃত ছিল, আজ সেই করে নূতন অলঙ্কারের শোভা পাইল—সে করের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইল—শাণিত তরবারিতে। সুহাসিনী সাম্যমূর্ত্তি সজ্জিত হইল, উন্মাদিনীর বেশে। সে মূর্ত্তি স্থাপিত হইল, অন্তঃপুরের দ্বারদেশে। তাহার বিস্ফারিত নেত্রযুগল হইতে যেন বহির্গত হইতে লাগিল—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। গম্ভীর ললাটদেশে যেন দৃশ্য হইল হীরক-খচিত, সুবর্ণ-অক্ষর-বিভাসিত স্বর্গীয় বাক্য;—"প্রাণ দিব, কিন্তু বিজাতীয়-পদ-বিক্ষেপে পবিত্র অন্তঃপুর কলুষিত হইতে দিব না।" দুরন্ত ইংরাজ-সৈন্য বাহির-গৃহ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। কিন্তু সে উন্মাদিনী মূর্ত্তির প্রতিবন্ধকতায় তাহারা সহজে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে এই লোমহর্ষণ সংবাদ পুলিষে উপনীত হইল। একে বিদ্রোহাগ্নি-দহনে সমগ্র ইংরাজ জর্জ্জরিত, তাহাতে আবার এক জন প্রসিদ্ধ ধনীর প্রতি অনর্থক অত্যাচার করিয়া বিপদের আহ্বান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সমগ্র মহানগরী, যে রাসমণির নামে সতত কম্পিত, তাঁহারই প্রতি মত্ত ইংরাজসৈন্যের অযথা অত্যাচার দেখিযা তন্নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ বাহির হইল। গবর্ণমেণ্টের আদেশে অচিরে মত্ত ইংরাজসৈন্যের অত্যাচারে বাধা পড়িল। তখন রাসমণি ক্রোধ-কম্পান্বিত স্বরে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষতি পূরণের দাবি করিলেন। ইংরাজ তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইলেন—গবর্ণমেণ্ট হইতে রাসমণির সমগ্র ক্ষতি পরিপূরিত হইল। আর তদবধি বিদ্রোহ শান্তি পর্য্যন্ত ১২ জন

ইংরাজসৈন্য শান্তিরক্ষার্থ রাসমণির দ্বারে দ্বারীর কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইল।

অন্য পক্ষে রাসমণির দয়ার দৃষ্টান্ত অতুলনীয়, তাঁহাকে দয়ার অন্য মূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে ইংরাজ-অত্যাচারে সিপাহি-বিদ্রোহের সূচনা, যাহা সময়ে সময়ে তাঁহার অন্তরে মর্ম্মব্যথা প্রদান করিয়াছে; তাঁহার গৃহলুণ্ঠন, জমীদারীর উৎসাদন পক্ষে যে অত্যাচার সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়াছে; সেই ইংরাজ যখন সিপাহি-বিদ্রোহের বিষম বিপদ-সলিলে মগ্নপ্রায়, তখন রাসমণি দানশীলতার একশেষ দেখাইয়া, তাহাদিগকে অর্থ, অন্ন এবং যুদ্ধার্থ হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতির সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে আহার ও পরিধেয় পরিধান দিয়াছিলেন, ও সামরিক ব্যয়ের পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। অত্যাচারীর প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কোথায় আছে?

রাসমণি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিমতী ছিলেন। হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে তিনি মধ্যে মধ্যে তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করিতেন। এক বার তিনি বারাণসীগমনে সঙ্কল্প করেন। তখন ভারতে রেলপথের সৃষ্টি হয় নাই—বাষ্পীয় পোতও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তজ্জন্য বারাণসী-দর্শন বহুদিন-সাপেক্ষ বলিয়া রাসমণি সঙ্গে বিস্তর খাদ্য দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্র লইলেন। তাঁহার গমন জন্য প্রায় ২৫।৩০ খানি নৌকা প্রস্তুত হইল। এই সময়ে বঙ্গদেশ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর দারুণ গ্রাসে আপতিত। দিনে দিনে অসংখ্য প্রাণী সেই করাল গ্রাসে পড়িয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইতেছে। অনাহারে মৃতপ্রায় জননীর ক্রোড়ে কত শিশু স্তন্যাভাবে, জীর্ণ-

দেহ যুবা-পুত্র-সমক্ষে কত বৃদ্ধ পিতা অনশনে, কুলনারী বদ্ধগৃহে, দরিদ্র কৃষক তাপিত ক্ষেত্রে, এক বার শান্তি আশায় শয়ন করিয়া মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইতেছে। অচিরে মোক্ষলাভার্থ তীর্থস্থানে গমনোদ্যতা রাসমণি সমক্ষে এই ভীষণ সংবাদ উপনীত হইল। বুদ্ধদেব অনশনে অকালমরণদর্শনে ব্যথিত হৃদয়ে গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন—পাগলের ন্যায় বনবাসে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, এ কথা তখন রাসমণির স্মরণ হইল। তিনি ভৃত্যবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার বারাণসী গমনে আর কাজ নাই। তোমরা আমার দরিদ্র ভাই ভগিনীগণের অকালমরণ নিবারণ কর। তাহাতে তোমাদেরও মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে, আমিও মুক্তি পাইব।" ত্বরায় রাসমণির আদেশ পালিত হইল। বহুসংখ্যক জীবের জীবন অকালমরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

পিতৃবিয়োগান্তে রাসমণি একবার জন্মভূমি দর্শনে গমন করেন। তিনি অন্নের অধিকারী, কিন্তু পিতৃগৃহে গিয়া দেখিলেন সকলেই অন্নের ভিখারী! তাঁহার পরিধেয় বসন মূল্যবান, কিন্তু তাঁহার ভাইভগিনীগণের পরিধেয় ছিন্ন বস্ত্র, তৈলাভাবে রুক্ষ কেশ, অন্নাভাবে শীর্ণ দেহ। এ দৃশ্য দর্শনে রাসমণির বিলাস-বাসনা দূরে যাইল, তিনিও কাঙ্গালের বেশ পরিধান করিলেন। দরিদ্রগণকে ভাই ভগিনী সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিয়া, ছিন্ন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে নূতন বস্ত্র পরাইলেন, রুক্ষ কেশ তৈল-সিক্ত করিলেন, ও অর্থ দানে তাহাদিগের মনস্তুষ্টি জন্মাইলেন। দরিদ্র জনের প্রতি ধনীর এরূপ ব্যবহার দাতৃত্বের আদর্শ স্থল।

রাসমণি কেবলমাত্র অর্থ ব্যয় করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তাঁহা হইতে বিস্তর অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল। তাঁহার অর্থ-সঞ্চয়ের অবলম্বিত উপায় সাধারণের অবগত হওয়া আবশ্যক-বোধে নিম্নে বর্ণিত হইল। সিপাহি-বিদ্রোহের সময়, সকলের যখন প্রতীতি জন্মিল, ইংরাজ-রাজ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তখন রাসমণির বিশ্বাস তাহার বিপরীত ছিল। সকলে ইংরাজ-রাজত্ব লোপ পাইবার আশঙ্কায় স্বল্পমূল্যে আপনাদের "কোম্পানির কাগজ" বিক্রয় করিতে লাগিল, আর রাসমণি অসম সাহসে সেই সকল "কোম্পানির কাগজ" ক্রয় করিতে লাগিলেন। অন্য লোকে যুদ্ধের বিশেষ সংবাদ লইত না বলিয়া বিষম ভীত হইয়াছিল, কিন্তু রাসমণি সংবাদপত্রের দ্বারা কিম্বা অনুচর প্রেরণে সতত সে সংবাদ লইতেন। তাই তিনি ঐ সকল "কোম্পানির কাগজ" ক্রয় করিতে সাহস করিলেন। বিদ্রোহ-শান্তির পর ঐ সকল কাগজের মূল্য বাড়িল, আর রাসমণিরও তাহাতে বিস্তর অর্থ লাভ হইল। বিচক্ষণ লোকে অর্থের এইরূপ ব্যবহার করিয়াই ধনবান্ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সুলভ মূল্যে কোন দ্রব্যাদি পাইলে রাসমণি তখনই তাহা ক্রয় করিয়া লইতেন, পরে তাহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে (১২৬৮ সালে) রাসমণি লোকান্তর গমন করেন। ৬৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া, সাধারণের উপকার এবং দরিদ্রের পালনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সামান্য দরিদ্র কৃষক-নন্দিনী হইয়া আপন মহত্ত্বের কারণ 'রাণী' উপাধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, জগতে পূজা-প্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংসার আজ আর সে সংসার নাই—তাহা আজ মানব-

শূন্য শুষ্ক মরু-ভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। হে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবন্! পিত! তোমার সংসারে মহতের পরিণাম এরূপ কেন? এ পরিণামে তোমারই যে কলঙ্ক রহিয়া যাইতেছে! সাধক-মুখে শুনিতে পাই, যে ব্যক্তি ন্যায়-পথে, ধর্ম্ম-দণ্ড আশ্রয়ে তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করে, পরিণামে তাহার জীবনী সংসারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া যায়। সে কথা সত্য বটে; কিন্তু পিত! তাহার সংসার সময়-স্রোতে ভাসিয়া যায় কেন?—তাহার নাম কীর্ত্তন করিতে সে সংসারে কেহ থাকে না কেন? মৃত-জীবন সে সংসারের এ শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু দীনবন্ধু! জগজ্জন এ দৃশ্য দেখিয়া অন্তরে দুঃখ পাইতেছে যে! দয়াময়! জগজ্জনে এ দুঃখ দাও কেন? দুঃখহারী! তুমি বিনা তাহাদের এ দুঃখ কে নিবারণ করিবে?



মহারাণী

ঝিন্দন বা চন্দ্রাবতী।

মহারাণী

ঝিন্দন বা চন্দ্রাবতী।

ভারত-মানচিত্রের উত্তর-পশ্চিম কোণে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত, ব্রিটিশ-পতাকা-বিশোভিত, শতদ্রু বিপাশা প্রভৃতি পঞ্চ সিন্ধু-শাখা-বিধৌত একটি ঐতিহাসিক-সম্পূজিত রাজ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ রাজ্যের নাম পঞ্চনদ বা পঞ্জাব। পূত সিন্ধু-সলিল-প্রবাহ সহকারিণী পঞ্চ-শাখা সহ রাজ্যের পাপ বিধৌত করিয়া, পুণ্যস্রোতে রাজ্য পবিত্র করিতেছেন বলিয়া, এ রাজ্য পঞ্চনদ বা পঞ্জাব নামে অভিহিত হইয়াছে। এ রাজ্যের উত্তরে অভ্রভেদী হিমগিরি উর্দ্ধশিরে বিরাটমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান —তাহার পাদদেশ সতত বীর্য্যস্রোতে, পুণ্যস্রোতে বিধৌত, তাই সে সাহঙ্কারে উর্দ্ধমুখ। দ্বাপরযুগে যাহার কূলে, কদম্বমূলে, বংশী-ধারী শ্রীমুরারির মনোহারিণী বংশীধ্বনি মানব-হৃদয় ধ্বনিত করিয়াছিল, সেই পুণ্যময়ী যমুনা উপনদী পঞ্জাবের পূর্ব্ব-সীমা-বিধায়িনী। পঞ্জাবের দক্ষিণে মথুরা জেলা, রাজপুতনা, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ; এবং পশ্চিমে সলেমান পর্ব্বত-শ্রেণী ও কাবুল রাজ্য। লাহোর এ রাজ্যের রাজধানী। লাহোর, চন্দ্রভাগা (রাভি) নদীর তীরে অবস্থিত। লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং লর্ড ডালহৌসী যখন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা (গবর্ণর জেনেরল), তখন কিছু দিনের জন্য, কালের অচিন্ত্যপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের গুণে, অবলা ঝিন্দন এই বিস্তৃত পঞ্জাব-রাজ্যের শাসন-কর্ত্রী ছিলেন— মুসলমান সাম্রাজ্যের গৌরবস্পর্দ্ধিনী ক্ষমতায় লক্ষ লক্ষ বার

ভারত বিধ্বস্ত হইবার পরও—ইংরাজ ক্ষমতার পূর্ণতা-প্রাপ্তি সময়েও, প্রসিদ্ধ পঞ্চনদপ্রদেশ ঝিন্দনের কর্ত্তৃত্বাধীনে ক্ষণকালের জন্যও স্বাধীনভাবে দিন অতিবাহিত করিতেছিল।

ঝিন্দন কে?—বদ্ধমূল ব্রিটিশ-শাসনের সম্মুখে তিনি কিরূপে আপনাদের গৌরব-গরিমা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন? শান্তিপরায়ণ নানক যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তি শান্তি-নিকেতনে সংগঠিত করিয়াছিলেন; যে নিরীহ সম্প্রদায় কঠোর যাবনিক অত্যাচারে, পরে আচার্য্য-প্রদত্ত সাম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া—শান্তমূর্ত্তি হইতে বিভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; বন্দিত্বে গুরু বন্ধুর মৃত্যু, জাহাঁগীর কর্ত্তৃক অকারণে রাজকারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া ঘাতুকগণের প্রাণান্তক কুঠারাঘাতে গুরু অর্জ্জুন মল্লের অকাল মরণ, দিল্লীর দরবারে আওরঙ্গজেব-আদেশে বিনাদোষে তেজস্বী তেগবাহাদুরের মস্তকচ্ছেদন, যে শান্ত স্বভাবাপন্ন জাতিকে গুরু গোবিন্দ সিংহের অধীনে কঠোর ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল; মহারাণী ঝিন্দন সেই তেজস্বী শিখ-সম্প্রদায়ের কুলবধূ—শিখ-স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক মহারাজ রণজিৎ সিংহের বনিতা। উন্নতমুখী ব্রিটিশ ক্ষমতা, যে ক্ষমতার নিকট মস্তকোত্তোলন করিতে পারে নাই; যে শৌর্য্যের অনির্ব্বচনীয় ক্রমোন্নতিতে, তেজস্বিনী ব্রিটিশ-স্পর্দ্ধা নতমুখী হইয়া, তাহার নিকট অবনতি স্বীকার করিয়া, শেষে ভিক্ষার্থী হইয়াছিল; মহারাণী ঝিন্দন সেই শৌর্য্যের সঞ্জীবনী-শক্তি-দাতা পঞ্জাব-কেশরী মহাত্মা রণজিৎ সিংহের তৃতীয় পত্নী।

উনষষ্ঠি বর্ষ কাল জাতীয় শিখ-সমাজের সেবায় ব্যাপৃত থাকিয়া, এবং জাতীয় মহিমায় উন্নতির উচ্চতম সোপানে

সমারূঢ় রাখিয়া, মহারাজ রণজিৎ সিংহ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ সালে) পার্থিব দেহ ত্যাগে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া দিব্যধামে গমন করেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর সুশৃঙ্খল-সংবদ্ধ শিখ-সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কত শত মহাত্মার মহাপ্রাণ ক'ঠোর রাজ-অত্যাচারে বিসর্জ্জিত হওনের পর, নিরীহ-জীবন দারুণ প্রতিহিংসা-বৃত্তির তৃপ্তিসাধনায় উৎক্ষিপ্ত হইলে, কত শতাব্দীক বাত্যায় ধূমান্বিত তুষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল—পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন যাইয়া জাতির জাতীয় জীবন একতা-সূত্রে সংবদ্ধ হইয়াছিল। মহাত্মা রণজিৎ সিংহের পরলোকান্তে সে অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, সে সুসম্বদ্ধ জাতীয়-বন্ধন শিথিল-বন্ধন হইয়া আসিল। পরিচালকের অভাবে, গৃহবিচ্ছেদে নরশোণিতস্রাব শিখ-সিংহাসন কলুষিত করিতে লাগিল। চারি বর্ষের মধ্যে পবিত্র লাহোর-রাজ-সিংহাসন ক্রমান্বয়ে রণজিৎ সিংহের চারি পাঁচটি পুত্র প্রপৌত্রের মুণ্ডে বিশোভিত হইল। এই সময়ে, শিখ ইতিহাসের এই শোচনীয় পরিচ্ছেদে, কিছু দিনের জন্য পবিত্র শিখ-সাম্রাজ্য মহারাণী ঝিন্দনের মহীয়সী শক্তির অধীনে পর্য্যবসিত ছিল। জগতের ইতিহাস হইতে পবিত্র শিখ-সমাজের নাম লুপ্ত হইবার প্রাক্কালে, শিখ সমাজের পার্থিব পূজা-প্রাপ্তির কাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, মহারাণী ঝিন্দনই প্রনষ্ট শিখ-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন; জগতের নিকট শিখ-সম্প্রদায়ের শেষ পূজা তাঁহারই ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের তিন বনিতা। তন্মধ্যে ঝিন্দন কনিষ্ঠা। ঝিন্দনের অপর নাম চন্দ্রাবতী। রণজিৎসিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার তিনটি পুত্র বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম খড়্গ সিংহ,

মধ্যম পুত্রের নাম সের সিংহ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দলীপ সিংহ। কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিংহ তাঁহার এই কনিষ্ঠা পত্নী ঝিন্দনের গর্ভসম্ভূত। মহাত্মার মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়্গ সিংহ শিখ-সাম্রাজ্যের আধিপত্য পাইয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্য-প্রাপ্তির কয়েক মাস পরেই, অকাল-মরণ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিল। রণজিতের মধ্যম পুত্র সের সিংহ লাহোর-সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। কিন্তু পঞ্জাবের আর সে দিন নাই—শিখ-সম্প্রদায় আজ ভ্রাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্নপ্রায়! মহাত্মা গুরু গোবিন্দের প্রক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত-সলিলে, ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনাতে যে বিযোজ্য-সম্প্রদায়কে সংযোজিত রাখিয়া ছিল, আজ নেতৃত্বাভাবে সে জাতির জাতীয় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। সের সিংহের একটি প্রিয় মন্ত্রী ছিল। সের সিংহ তাহাকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন;—কিন্তু সে তাঁহার ছদ্মবেশী শত্রু। দেখিতে দেখিতে শত্রু শত্রুর কার্য্য করিল। অচিরে রাজ্য-লোলুপ ক্রূরাচারীর হস্তে সের সিংহ ও তাঁহার এক পুত্র নিহত হইলেন। কিন্তু তাহারও অভিসন্ধি মিটিল না। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—সেও রাজ্যভোগ করিতে পাইল না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে (১২৫০ সালে) পঞ্জাবে এই দুর্দ্দৈবের সংঘটন হয়; পঞ্জাব রাজ্য এইরূপে রাজশূন্য হইয়া পড়ে।

পঞ্জাবের এই ভীষণ বিপ্লবকালীন দলীপ সিংহের বয়ঃক্রম অন্যূন পাঁচ বৎসর ছিল *। পঞ্জাব রাজ্য এইরূপে পতনোন্মুখ

---

*গ্রেগর সাহেব-প্রণীত শিখজাতির ইতিহাস (Gregor's 'History of the Shiks.') নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, রাজ্যপ্রাপ্তিকালে দলীপ সিংহের বয়ঃক্রম চারি বৎসর মাত্র। কিন্তু অন্যান্য ইতিহাসে এ সময় দলীপ সিংহের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর বলিয়া উল্লিখিত আছে।

হইলে, সংসারজ্ঞান-অনভিজ্ঞ আপন দেহভার বহনে অপটু পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক দলীপ সিংহের হস্তে বিস্তৃত পঞ্জাব রাজ্যের শাসনভার পতিত হইল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক দলীপের নামে জননী মহারাণী ঝিন্দনের পরিচর্য্যায় এইরূপে পঞ্জাব রাজ্য শাসিত হইতে লাগিল। দৃপ্ত ব্রিটিশ-শাসনোৎকর্ষের চরম সীমায় অবলা নারী রণজিৎ-রাজ্যের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন—ক্ষণস্থায়ী তাড়িতালোকে গাঢ় অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন পঞ্জাব ক্ষণকালের জন্য আলোক পাইল। আলোকে পঞ্জাব কিয়ৎপরিমাণে আপন কর্তব্যের প্রতি এক বার দৃষ্টি করিয়া লইল।

ভারতে ব্রিটিশ-সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! ভারতে গবর্ণর জেনেরলের পর গবর্ণর জেনেরল আসিতেছেন, আর ইংরাজ-শাসন অধিকার সম্প্রসারণ করিয়া লইতেছে। ক্লাইব ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন, হেষ্টিংস্ হইতে অপরাপর সকলে তাহাতে প্রস্তর গাঁথিয়া তদুপরি সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, এ সময়ে সে অট্টালিকা সম্পূর্ণপ্রায়, তাহার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে; আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট—শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় নারীর হস্তে পঞ্জাব-শাসন-ভার ন্যস্ত! ইহা দেখিয়া কে আর রাজ্যলোভ সম্বরণ করিতে পারে? ইংরাজ একেই তো রাজ্য-সীমা বৃদ্ধি করিতে সমূহ প্রযত্নপর, তাহাতে আবার সম্মুখে নারী বিস্তৃত পঞ্জাবের শাসনকর্ত্রী! কিন্তু অকারণে পঞ্জাব রাজ্য কিরূপে ব্রিটিশ-পতাকায় বিশোভিত হইতে পারে? তাহা হইলে ব্রিটিশ-প্রতিনিধিকে জগৎ কি বলিবে? সুতরাং রাজ্যলোলুপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের ছিদ্রানুসরণে অনুপ্রাণিত হইলেন। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের প্রতাপে

যে ব্রিটিশ কাঁপিয়াছিল, সুযোগ পাইয়া সে আজ তুণজ্ঞানে পঞ্জাবকে দলিত রাখিতে সমুৎসুক হইল।

শাসনকর্ত্রী ঝিন্দনের হস্তে পঞ্জাবকে আবার উন্নতমুখ দেখিয়া ব্রিটিশ-প্রতিনিধি হার্ডিঞ্জের হৃদয় আশঙ্কায় পূর্ণ হইল। পঞ্জাব শীঘ্রই ব্রিটিশ-শাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে, এই ভাবনায় লর্ড হার্ডিঞ্জ অবসন্ন হইলেন, মনে মনে স্থির করিলেন যে, "অঙ্কুরকে সম্যক্ উদ্গত হইতে না দিয়া আপাততঃ প্রস্তর চাপনে তাহার বর্দ্ধন রোধ করিয়া রাখিব; তাহা হইলে আমার উত্তরাধিকারিগণকে বৃক্ষের মূলোৎপাটনে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।" চতুর হার্ডিঞ্জ জগতের সম্মুখে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পঞ্জাবের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আভ্যন্তরিক প্রযোজ্য বিষ দিন দিন পঞ্জাবের বলক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইল। ছিদ্রান্বেষী ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ক্রমে পঞ্জাবের ছিদ্র পাইলেন। এই সময় মহারাণী ঝিন্দন আপনার ক্ষমতা স্বাধীন ভাবে পরিচালনা করিতে প্রযত্নবতী হইলেন; তাঁহার অধীনস্থ খালসা-সৈন্য দিন দিন প্রবল পরাক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল; তাহারা তাহাদের ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ইহা সহ্য হইল না। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে অন্য জাতির সম্যক্ প্রাধান্য দেখিতে ইংরাজ পারিলেন না। ইংরাজ ভীত হইয়া শিখরাজ্য এবং আপন রাজ্যের মধ্য-সীমায় সৈন্যদল সংস্করণ করিলেন। মিরাট এবং শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইংরাজ সৈন্য অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ক্রমে খালসা-সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

কালে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে, অনবধানতাবশতঃ বহ্নিকণা একটি গৃহে লাগিয়া পরে দেশ-ব্যাপ্ত হইয়াছে—পঞ্জাবের প্রান্ত-ভাগে আসিয়া তাহার দহন-সাধন করিতে সমুৎসুক, ইহা দেখিয়া পঞ্জাব ব্যথিত হইল। দুই দিন পূর্ব্বে যে ইংরাজ পঞ্জাবের নিকট অবনত-মস্তকে নম্রতা স্বীকার করিয়াছিলেন, শিখ-শৌর্য্যে ভীত হইয়া ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধি মিণ্টো যে রণজিৎ সিংহের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য, পঞ্জাবে মেট-কাফ্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আজ সেই ইংরাজ, সেই পঞ্জাবের উন্নতির গতি রোধ করিতে অগ্রসর! ইহাতে সমগ্র শিখ-রাজ্য ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল, আপনাদের গৌরব-সংরক্ষণে—অবনত অবস্থার সংস্করণে প্রবৃত্ত হইল।

ক্রমে শিখ-ইংরাজে যুদ্ধ বাঁধিল। ইংরাজ শিখোন্নতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। শিখ-সৈন্য তদ্দর্শনে ইংরাজ-প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া আপনাদের গৌরব রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইল না। যে কারণে ভারত-গৌরব দৃষদ্বতীর অনন্ত-সলিল-প্রবাহে মিশিয়া গিয়াছে; যে গৃহবিচ্ছেদ যবন-হস্তে বন্দীকৃত ভ্রাতৃহনন দর্শন করিয়াছে; যাহার কারণ সিরাজের বঙ্গ সিংহাসন অনায়াসে ইংরাজের অধিকৃত হইয়াছে; যাহা উন্নত অবস্থাকে অবনতকরণের একমাত্র কারণ, শিখ-রাজ্যকে তাহাতেই ইংরাজের নিকট অবনতি স্বীকার করাইল। বলিতে কি!—শিখসমাজে কলঙ্কের অঙ্কনকারী লাল সিংহ ও তেজ সিংহ গুপ্তভাবে ইংরাজসহ ষড়যন্ত্র করিয়া এই যুদ্ধে শিখ-দিগকে পরাজিত করিল। মুদকি, ফিরোজপুর, আলিবালা ও সোব্রায়ণ প্রভৃতির কঠোর সংগ্রামে গুপ্ত-গৃহ-বিভীষণের

দৌরাত্ম্যে ক্রমে শিখসৈন্য বলশূন্য হইয়া পড়িল। প্রায় বর্ষকালব্যাপী যুদ্ধে—লাল সিংহ ও তেজ সিংহের সহযোগিতায়, সুশিক্ষিত ইংরাজসৈন্যের রণে শিখগণ অবনত-মস্তক হইল। তাহারা বলভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের স্বাধীনতা সম্যক্ রক্ষা করিতে পারিল না। সোব্রায়ণের শেষ যুদ্ধে শিখগণ পরাজিত হইল। গোলাব সিংহ-প্রমুখ শিখ-সর্দারেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমীপে অবনত-মস্তকে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মনে হইলে হৃদয় বিষাদ-সাগরে ভাসিতে থাকে—এক দিন যে পঞ্জাবে শিখ-শৌর্য্যের নিকট অবনত-মস্তকে রাজপ্রতিনিধি মিণ্টো, মেট্‌কাফ্ সাহেবকে পাঠাইয়া পঞ্জাবসহ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, আজ কালের বিচিত্র গতিতে সেই পঞ্জাব কি না সেই ব্রিটিশের পদানত! কি ক্ষোভের বিষয়!

সন্ধি হইল। সন্ধিপত্রে লেখা রহিল যে, রণজিৎ-তনয় দলীপ সিংহ কেবল নামমাত্র পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা থাকিবেন; ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট লরেন্সের পরামর্শ ব্যতীত তাঁহার কোন রাজকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত এই সন্ধিতে জলন্দর, দোয়াব (শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ) ইংরাজের অধিকৃত বলিয়া স্বীকৃত হইল; পঞ্জাবকে যুদ্ধের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতে হইল। আর লাহোরে বহুসংখ্যক ব্রিটিশ-সৈন্য শিখোন্নতির গতি রোধ করিবার জন্য অবস্থিতি করিতে লাগিল। এক কথায় হার্ডিঞ্জ-শাসনে পঞ্জাবের বাহ্য-গৌরব কতক পরিমাণে থাকিলেও তাহার অন্তর্গৌরব সম্যক্‌রূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে "প্রথম শিখ-যুদ্ধ" নামে অভিহিত। আর এই সন্ধি ইহার

পরিণাম ও শিখাধঃপতনের ভিত্তি। এই সন্ধিতে পঞ্জাবে ব্রিটিশ প্রতাপের প্রাধান্য হয়, পঞ্জাবে ব্রিটিশ-শাসনের আধিপত্য বিস্তারের সূত্রপাত হয়।

ইহাতে মহারাণী ঝিন্দনের কোমল প্রাণ ব্যথিত হইল। তিনি প্রথম শিখযুদ্ধে আপনাদের গৌরব সংরক্ষণে সমূহ প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু দৈববিড়ম্বনা বশতঃ কতিপয় গৃহ-সন্ধানকারী কপটের কাপট্যে, তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই; শিখগণ ইংরাজরণে পরাজিত হইয়াছিল। আজ ইংরাজ তাঁহার রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, গৌরব-গরিমার লীলাস্থল পঞ্চনদ আজ ইংরাজের পদদলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহা মহারাণী ঝিন্দনের প্রাণে সহ্য হইল না। শিখ-শৌর্য্যের আবাসভূমি—রণবীর রণজিতের রাজ্য তাঁহার প্রাণ থাকিতে যে বিজাতীয়ের বিজাতীয় পদসেবা করিবে, তাঁহার প্রাণ তাহা দেখিতে পারিল না। তিনি ইংরাজদিগকে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া দিতে সচেষ্টিত হইলেন। ইংরাজ, শিশু দলীপের হস্তে বিস্তৃত পঞ্জাবের শাসন-ভার অর্পিত দেখিয়া, অবলা রমণী তাহার পালনকর্ত্রী, পরিচালয়িত্রী বলিয়া পঞ্জাবকে তৃণের ন্যায় দলিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার সকল সুখ অপহরণ করিয়া তাহাকে কঠোর অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছেন, রমণী-হৃদয়ে তাহা বিষম আঘাত করিল। আঘাতে সে হৃদয় ভাঙ্গিল, ভাঙ্গিয়া বিচূর্ণিত হইল, কিন্তু বিলুপ্ত হইল না।—তাহা তটিনীতরঙ্গ-ভঙ্গ নদীতটের ন্যায় স্থানভ্রষ্ট হইয়া নদীস্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াইল; বালুকা-সমন্বিত চরের ন্যায় নদী-প্রবাহের অন্য স্থলে বাধা দিল।

ক্রমে হার্ডিঞ্জ ভারত ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে ভারতে ডালহৌসী-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সে মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী; সতত রাক্ষস-মূর্ত্তির ন্যায় বদন ব্যাদান করিয়া দেশ-গ্রাসে সমুৎসুক। তাহার আবির্ভাবেই মূলতান রাজ্য উৎসন্ন যাইল; পঞ্জাব চরম সীমায় উপনীত হইল। ডালহৌসীর একান্ত বাসনা ইংরাজ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করণ। ভারতে উপনীত হইয়াই তাঁহার বাসনা কার্য্যের অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইল। ভারতীয় রাজন্যবর্গকে ইংরাজ-দণ্ডের অধীনে আনয়নের অনুসন্ধিৎসায় তাঁহার প্রাণ মনের আসক্তি জন্মিল। সে আসক্তির আভ্যন্তরিক দর্শনে ডালহৌসীর দৃষ্টিগোচর হইল যে, মূলতানের ন্যায় পঞ্জাবও সামান্য আয়াসে ব্রিটিশ-রাজ্যভুক্ত হইতে পারে। তিনি দেখিলেন, কালের আবর্ত্তনে পঞ্জাবের গতি ফিরিয়াছে। সে আজ নতমুখী—অবলা নারী তাহার শাসনকর্ত্রী। পরক্ষণেই তাঁহার মনে কিন্তু উদয় হইল যে, "সে নারী তো সামান্যা নহে! তাহার প্রতিবন্ধকতায় পঞ্জাব-বিজয় বহু আয়াসসাপেক্ষ। সে যখন কোমল করের বিষম অস্ত্রে ব্রিটিশ-বর্গে বাধা দিবে, তখন তো সে বাধা অতিক্রম করা সহজ হইবে না; সুতরাং পঞ্জাব-বিজয়ের পূর্ব্বে কৌশলে তাহাকে পঞ্জাব হইতে অপসারিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে ব্যাপার তো বড় সহজ নহে! বিনা দোষে ছিদ্র না পাইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে রণজিৎ সিংহের বনিতার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে জগৎ কি বলিবে?"

ক্রমে চিন্তা কৌশল প্রসব করিল। কৌশলে স্থিরীকৃত হইল যে, "দলীপ সিংহের সহযোগিতায় ঝিন্দনকে পঞ্জাব হইতে স্থানান্তরিত করিব। জগতে প্রচারিত করিব যে, মূলতান-

যুদ্ধে ব্রিটিশের বিপক্ষতাচরণ জন্য মহারাণী তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। ক্রমে দলীপের কর্ণে মন্ত্র প্রদত্ত হইল। যে মন্ত্রের আকর্ষণী-শক্তি মিরজাফরকে সেই অন্নদাতা, নকর্ত্তা সিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাইতে পারিয়াছিল; াধ্যক্ষ জগৎশেঠ, মন্ত্রী রায়দুর্লভ যে মোহে মুগ্ধ হইয়া বের নিকট জাতীয় মস্তক অবনত করিয়াছিল; অধিক ত কি! যে মন্ত্রে প্রথম শিখ-যুদ্ধে লাল সিংহ ও তেজ সিংহ পবিত্র শিখ-সমাজ গভীর কলঙ্কের রেখা-পাতে কলুষিত ছিল; সে মোহমন্ত্রে আর বালক-প্রাণ কেমন করিয়া থাকিবে? ক্রূর ঘটনাচক্রের বিষম ফল ফলিল। সংসার-শূন্য দ্বাদশবর্ষীয় বালককে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের মোহ-মন্ত্র করিয়া তুলিল। মন্ত্রমুগ্ধ বালকের মাতৃভক্তি দূরে যাইল; মমতা হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাকে অব-স্বরূপ রাখিয়া ইংরাজ, মহারাণী ঝিন্দনের প্রতিপক্ষে জাল লেন। দেখিতে দেখিতে সে জালে ঝিন্দনকে বন্দিনী া।

ঝিন্দন এখন বন্দিনী! কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল বন্দিনীর ন্যায় নহে। বন্দিত্বে তাঁহার হৃদয় কলুষিত হয় নাই, স্বল্প পরিমাণেও মনের দৃঢ়ত্ব বিলোপ পায় নাই। প্রসিদ্ধ ওয়াটার্লু-যুদ্ধে বিশ্ব-বিজয়ী নেপোলিয়নের বন্দিত্ব-বদনে যে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতি-ভাত হইয়াছিল, পবিত্র ধর্ম্মাপলীক্ষেত্রে জগৎ-পূজিত লিওনিদস্ কিম্বা আওরঙ্গজেব-শাসনে বন্দী শিবজী-মূর্ত্তিতে যে শক্তির বিকাশ দেখিয়াছি, এ মূর্ত্তিতেও তদপেক্ষা স্বল্প দীপ্তি দেখিলাম না। আগ্নেয়-গহ্বর নহে বা কর্ম্মকারের বায়ুবিসেবিত অগ্নিকুণ্ড

নহে, কিন্তু সে বদন জ্বলন্ত অগ্নি নিঃসারণ করিল। মহারাণী ঝিন্দন শিখ-সমাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ আর শিখ নানকের বংশ নহে। এখন আর গুরু গোবিন্দ কিম্বা রণজিৎ সিংহের বংশজ বলিয়া শিখ-সমাজ পরিচয় দিলে তাহাকে সেই স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের অবমাননা করা হইবে। দুরন্ত দস্যুর হস্তে কুলের কামিনীকে নিপীড়িত হইতে দেখিয়াও যে জাতির অসারতা থাকিতে পারে, সে জাতি কখনই শিখ নামের বাচ্য নহে—তাহারা নরদেহধারী নিকৃষ্টতম জীবমাত্র। কিন্তু শিখ! মুমূর্ষু অবস্থায় এখনও বলিতেছি, তোমরা স্বর্গীয় কুলের কলঙ্ক হইও না, এ অত্যাচারের প্রতিশোধ না দিয়া তোমাদের জীবন আর যেন দেহ-ভার বহন না করে! আমি দস্যুহস্তে আমার মরণ সহিতে পারিব, কিন্তু 'শিখ নামের' মরণ আমার সহ্য হইবে না। আমাদের জীবন সহজে আসিয়াছে, তাহা সহজেই যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু পবিত্র 'শিখ নাম' সহজে আসে নাই, কত শত সাধক-জীবনের জীবনে 'শিখ নামের' সৃষ্টি। দেখিও শিখ-সমাজ! সে নাম যেন বালক-বিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রবৎ জলমগ্ন না হয়! আমাকে এখনই পবিত্র পঞ্জাব ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতেও আমি তত দুঃখিত নহি; পাছে 'শিখ নাম' পঞ্জাব ত্যাগ করে, কেবলমাত্র এই জন্যই আমি চিন্তিত ও দুঃখিত। জগদীশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমার চিন্তা যেন নৈশ-স্বপ্নে পরিণত হয়। নিশাশেষে, নিদ্রাভঙ্গে মনোদুঃখ যেন দূরে যায়।" বন্দিনীর মুখ-নিঃসৃত বীর্য্যপূর্ণ বাক্যে জড়-প্রকৃতি-প্রাপ্ত শিখ-সমাজের বধির কর্ণ-পটহ ধ্বনিত করিল; নিদ্রিত সমাজের মোহনিদ্রা সে ধ্বনিতে ভাঙ্গিয়া আসিল। আর অন্য দিকে সে

ধ্বনি ইংরাজ-কর্ণ বিদীর্ণ করিল, বিষম ব্যথায় ইংরাজ-হৃদয়ে ব্যথা দিল। হৃদয়-বিদীর্ণকারী সে বাণী আর ইংরাজ শুনিতে পারিলেন না। তাঁহারা বন্দিনী ঝিন্দনকে স্থানান্তরিত করিয়া অবরুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ সময় আবার এক বার রমণী-কণ্ঠে বীরোচিত কঠিন বাক্য নিনাদিত হইল, "শিখ-সমাজ! তোমাদের কুলকামিনী দস্যুকরে নিহত হইতে চলিল, কিন্তু সাবধান! পবিত্র 'শিখ নাম' যেন এইরূপে দস্যুকরে নিহত না হয়!" স্মরণ হয়, আওরঙ্গজেব-দণ্ডে বিনাদোষে মস্তক ছেদিত হইবার পূর্ব্বে তেজস্বী তেগবাহাদুরের কণ্ঠ এইরূপ বাক্যে ধ্বনিত হইয়াছিল; শুনিয়াছি, সেই মুমূর্ষু-কণ্ঠের শেষ বাণী:—"পুত্র! গোবিন্দসিংহ! এই অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ লইও।" পুত্র গোবিন্দসিংহ অর্দ্ধোচ্চারিত পিতৃবাক্যের প্রাণপণে পূর্ণতা-প্রাপ্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু পতিতপ্রায় শিখ-সমাজ দেবী-বাক্যে কর্ণপাত করিবে কি?

এইরূপে ঝিন্দন প্রথমে শেখপুরে, পরে বারাণসীক্ষেত্রে নির্ব্বাসিত হইলেন; ইংরাজের অধীনতায় বন্দিত্বের বিষম বেদনায়, বদ্ধ দুর্গমধ্যে তাঁহার কোমল প্রাণ ব্যথা পাইতে লাগিল। ঝিন্দনের এই বিষম নির্ব্বাসন—পঞ্জাবের এই শোচনীয় অধঃপতন, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে (১২৫৫ সালে) সঙ্ঘটিত হয়। ডালহৌসী-শাসনের এ দিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটি কালিমা-রেখায় চিরদিনের তরে পরিবেষ্টিত থাকিবে, আর কালিমা-রেখাবেষ্টিত সেই কয়েক ছত্র জগতের নেত্রে চিরদিন অশ্রু আনয়ন করিবে।

মুমূর্ষুর বাক্য শিখ-কর্ণে স্থান পাইল। সে অলস্ত উৎসাহ

বাক্যে অচিরে শিখের নিদ্রা ভাঙ্গিল—তাহারা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিল। জাগরণে ভ্রম-নিদ্রার ভ্রম ঘুচিল; তাহাদের জ্ঞান জন্মিল যে, তাহারা ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মোহিত; অচিরে ব্যাধ-হস্তে তাহাদিগকে নিষ্পেষিত হইতে হইবে। তাহারা আপনাদের মান্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, দেশের জন্য ব্রিটিশ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিল। রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত বাক্য বিচ্ছিন্ন জাতীয়-বন্ধন আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইল। তাহারা কুলরমণীর প্রতি বিজাতীয়ের অত্যাচারের প্রতিশোধ* প্রদানে উত্তেজিত হইল। এ উত্তেজনা সহজে নিবৃত্তি হইল না; ঝিন্দনের মুখবিনির্গত অগ্নি প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিল, আর এই অগ্নি-নিঃসরণই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের সূচনা।

ইংরাজ-দর্প চূর্ণপ্রায়!—চিলিয়ানবালা-যুদ্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ-সেনাপতি গফ পরাজিত হইলেন। শের সিংহ-পরিচালিত শিখ-সৈন্যের বীরত্বে সুশিক্ষিত ব্রিটিশ-সৈন্য নিষ্পেষিত হইল। তাহাদিগের ঊর্দ্ধ শির শিখ-চরণে অবনতি স্বীকার করিল; বলচ্যুত, সৈন্যভ্রষ্ট ও বিষম অবমাননায় অবমানিত হইয়া তাহারা রণস্থল হইতে পলাইল। চিলিয়ানবালার পবিত্র ক্ষেত্র এই যুদ্ধে জগৎ-পূজিত। যদি কোন সমদর্শী ঐতিহাসিকের পবিত্র লেখনী হইতে শিখদিগের জাতীয় ইতিহাস জগতে প্রচারিত হয়, তবেই বলিতে পারি, সে ইতিহাসে চিলিয়ানবালার পবিত্র নাম সুবর্ণ অক্ষরে রঞ্জিত হইবে; তবেই বলিতে পারি, শিখদিগের এই বিজয়-কাহিনী থর্ম্মাপলী কিম্বা মরাথন, ওয়াটার্লু

* এতদ্ভিন্ন জগৎপূজ্য শের সিংহের পিতার অযথা অপমান এবং দলীপ সিংহের বিবাহে বাধা প্রদান জন্যও শিখেরা ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিল।

কিম্বা পলাশীর ন্যায় জগতের কণ্ঠে গীত হইবে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের (১২৫৫ সালের) ১৩ই জানুয়ারি এই পবিত্র দিন। এই পবিত্র দিনে, পবিত্র ক্ষেত্রে, পবিত্র শিখ-সমাজের মাহাত্ম্য রক্ষিত হইয়াছিল। এ দিন চিরদিন হিন্দুর স্মরণ থাকিবে; এ ক্ষেত্র অনন্ত কাল তীর্থস্থান বলিয়া সম্পূজিত হইবে। এ যুদ্ধে শিখগণ বীরেন্দ্র বলিয়া চিরদিন বরণীয় থাকিবে।

এই পরাজয়ে ব্রিটিশ-হৃদয়ে কালিমার পাত হইল। সে কালিমার উচ্ছেদে ক্রমে রামনগর ও গুজরাটে যুদ্ধ বাঁধিল। রামনগরে শিখ-সৈন্য পরাজিত হইল না বটে, কিন্তু গুজরাটের যুদ্ধে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইল। দৃষদ্বতী-তটে হিন্দুদিগের এক দিন এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল; পলাশীক্ষেত্রে মোগলশাসন এক দিন এই সর্ব্বনাশে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এ সর্ব্বনাশে পঞ্জাব গৌরব হারাইল, স্বাধীনতার লীলাস্থল চিরতরে স্বাধীনতাভ্রষ্ট হইল। তাহার শিরোভূষণ অতুল্য কহিনুর * স্খলিত হইল, সতত বিজাতির পদাঘাতে তাহার দেহ সন্তাড়িত—মস্তক নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। মহাত্মা রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পাইল; গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রসারিত তেজোবীর্য্যকাল-সময়ে বিলীন হইয়া গেল। শিখ-পঞ্জাব ব্রিটিশ

---

* কহিনুর, মণিবিশেষ। এরূপ মূল্যবান মণি আর পৃথিবীতে নাই। ইহা ভারতের একটি অতুলনীয় সম্পত্তি। পৌরাণিক সময় হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ইহা ভারতীয় সার্ব্বভৌম নৃপতিগণের অধিকৃত হইয়া আসিতেছিল। এই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের পর ইহা ইংরাজের অধিকারে আইসে। ইংরাজ-অধিকারে আজ এ মণি সাগরপারে—ইংলণ্ডে গিয়া কর্ত্তিত ক্ষুদ্রাকারে মহারাণী ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়ার শিরোমুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

পতাকায়, শিখ-সিংহাসন ব্রিটিশ পদধূলিতে, শিখ-শৌর্য্য ব্রিটিশ পদাঘাতে বিশ্লেষিত হইতে লাগিল। সামান্য শ্রমজীবী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কালের আবর্ত্তনে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল; আবার অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে সে তাহার বিস্তৃতি হারাইল, শিখ আবার যে ক্ষুদ্র জাতি, সেই ক্ষুদ্র জাতিতেই পরিণত হইল। গুজরাটের এই বিষম সংগ্রাম, শিখ-ইতিহাসের এই গভীর অধঃ-পতন, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সঙ্ঘটিত হয়। এই দিন হইতেই ঐতিহাসিকের লেখনী শিখ-ইতিহাস লিখন-শ্রান্তি হইতে বিশ্রাম লাভ করে। এই দিন হইতে হিন্দুজাতির ইতিহাস সংক্ষেপতঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে।

পঞ্জাবের এই শোচনীয় অধঃপতনেও ইংরাজ নিশ্চিন্ত রহি-লেন না। ইহার পরও আবার তাঁহাদের মনে বিষম ভাবনার উদয় হইল। "এখনও ঝিন্দন জীবিত, দলীপ সিংহ পঞ্জাবে! সে যোগে আবার শিখ-সৈন্য ক্ষেপিতে পারে!" ইংরাজের মন এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইতে লাগিল। ইংরাজ ভাবিতে লাগিলেন, "ঝিন্দন সামান্যা নহে। অবরোধেও তাহার তেজের হ্রাস হয় নাই—সে সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করি-তেছে। সুতরাং অবরোধ-মুক্ত হইতে পারিলে তাহার প্রতাপে ব্রিটিশের রক্ষা পাওয়া সহজ হইবে না! সে সাত ঘাটের জল এক ঘাটে আনিবে; বিচ্ছিন্ন শিখ-সমাজকে আবার মাতাইবে; ব্রিটিশ অধিকৃত রাজ্য আবার দলীপের হস্তে শাসিত করাইবে। ঝিন্দন দলীপের অবলম্বন হইলে, নতমুখ বৃক্ষ আবার উন্নতমুখ হইবে; বিলুপ্তপ্রায় শিখ-বীর্য্য আবার শিখ-ধমনীতে প্রসারিত হইতে থাকিবে।" এইরূপ চিন্তার পর ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট স্থিরী-

ক্রুদ্ধ করিলেন, "বৃক্ষের মূলোৎপাটনই কর্ত্তব্য। দলীপ সিংহকে একেবারে পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত করিতে পারিলেই ইংরাজের শিখ-ভয় অপসারিত হইবে। পুত্র-স্নেহকাতরা ঝিন্দন পুত্রের বিচ্ছেদে জীবন ত্যাগ করিবে, ঝিন্দনের অভাবে, শক্তি-বিহীনে পঞ্জাব আর মস্তক তুলিতে পারিবে না।"

এইরূপ ভাবনার পরই ব্রিটিশ-মুখের মোহ-মন্ত্র আবার পঞ্জাবের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে মোহ-মন্ত্রে পঞ্জাব নিস্পন্দ হইল। সর্পজীবি-কণ্ঠোচ্চারিত অস্ফুট বাক্যে বিষমুখ অহি-কুলের ন্যায় কিম্বা সর্প-বৈদ্য-সম্মুখে পরীক্ষিৎ-হনন-অভিলাষী তক্ষক-দংশনে বিরাট বৃক্ষ ভস্ম হওনের ন্যায়, তেজস্বী শিখ-সমাজ অসারতা প্রাপ্ত হইল। সে মোহে দলীপ সিংহের মনু-ষ্যত্ব দূরে যাইল, হিন্দু সন্তান হিন্দুত্ব-ভ্রষ্ট হইলেন। তাঁহার কর্ণ শিখ-গুরুর কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর মন্ত্রের পরিবর্ত্তে, খৃষ্ট-যাজকগণের বিজাতীয় খৃষ্ট-মন্ত্রের অনুরক্ত হইল; সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া তিনি ঈশা-প্রচারিত ধর্ম্মের উপাসক হইলেন। যে ধর্ম্মের কারণ মোগল-সম্রাট-সকাশে মস্তক ছেদিত হইলে, মৃত মহাত্মা তেগবাহাদুরের কণ্ঠদেশ-সংবদ্ধ পত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল, "শির্ দিয়া আওর শের নেহি দিয়া" মস্তক দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের মর্ম্ম দিলাম না; দলীপ সিংহের নিকট আজ সেই ধর্ম্ম এইরূপে বিসর্জ্জিত হইল। জগৎ! শুনিলে স্তব্ধীভূত হইবেন যে, কেবল মাত্র ধর্ম্মচ্যুত হইয়াই দলীপ সিংহের নিষ্কৃতি হইল না। সে মন্ত্রমোহে তাঁহাকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হইল; মহাত্মা রণজিৎ সিংহের পুত্র পরান্নভোজী হইয়া পর-দেশাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কত কোটি কোটি মুদ্রা যে রাজ-

কোষ হইতে ভৃত্যগণের বৃত্তি প্রদানে ব্যয়িত হইত, সেই বিস্তৃত ধনের অধিকারী শেষে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি-ভোগী হইয়া, ভাই বন্ধুর অন্তরালে সাগর-পারে বন্দীর ন্যায় গমন করিলেন। বিষম রাজদণ্ডে দণ্ডিত দোষী দ্বীপান্তরবাসী হয়; সূক্ষ্মতম বিচারে পঞ্জাবকেশরীর পুত্র রাজদণ্ডে সেই দ্বীপান্তরবাসী হইলেন। কাল খৃষ্টীয় ১৮৪৯ অব্দের ২৯এ মার্চ্চ শিখ-পঞ্জাবের শেষ দিন—এই দিন হইতেই শিখ-শাসন পঞ্জাব ত্যাগ করিয়াছে, এই দিনের সন্ধিতেই দলীপ সিংহ বিজাতীয়ের হস্তে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পঞ্জাব ত্যাগে ইংলণ্ডে গমন করেন। এ সময়ে দলীপ সিংহের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র ছিল। ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া অধুনাপি তিনি সেই বারিধি-বেষ্টিত ইংলণ্ড নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। বাল্য-জীবনে মন্ত্রমোহে তিনি ভাবিয়াছিলেন, "ইংরাজ আমার মিত্র, আমি মিত্র-পাশে সুখে জীবন কাটাইব।" কিন্তু এখন তিনি ভাবিতেছেন, "আমি বন্দী, মুগ্ধ হইয়া ব্যাধের জালে জীবন দিয়াছি।" ভ্রমমুগ্ধ মানবকে শেষে এইরূপেই আক্ষেপ করিতে হয়।

দলীপ সাগরপারে ব্রিটিশ-রাজ্যে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার জননী সেইরূপ বন্দিনীই রহিলেন। ইংরাজ-কৌশলে তিনি ভারত হইতে নিষ্কাশিত হইলেন, কিন্তু তখনও ঝিন্দনের বন্দিত্ব উন্মোচিত হইল না। মন্ত্র-মোহে তাঁহাকে মাতৃভাবনা ভাবিতে দিল না, জন্মভূমি ত্যাগ-কালীন জননীসহ আর তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হইল না। ক্রমে বন্দিত্বের অসহনীয় ক্লেশে ঝিন্দনের দেহ জরাগ্রস্ত করিয়া তুলিল, চিন্তা-কীটে তাঁহার শরীর-বন্ধন কর্ত্তন করিয়া ফেলিল। কাষ্ঠমধ্যে ঘুণ প্রবেশ

করিয়া কাষ্ঠখণ্ডকে যেরূপ অপদার্থ করিয়া ফেলে, চিন্তা-ঘুণের প্রবেশে ঝিন্দনের দেহ-কাষ্ঠও সেইরূপে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। তাঁহার শরীর শীর্ণ, দেহ অবসন্ন, নয়ন অন্ধপ্রায়, কর্ণ বধির হইয়া আসিল। "শিখ-সমাজের শেষে এই ছিল!" কেবল এই বাক্য ভিন্ন তাঁহার মনে আর কিছুই স্থান পাইল না। তিনি কেবলমাত্র এই বাক্য বলিতে বলিতে, এই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে আপন জীবনের পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিলেন।

এ দিকে ব্রিটিশ-শাসনে পঞ্জাব হত-বল হইয়া পড়িল। জীবনশূন্য অসার দেহের ন্যায়, দারুণ কুঠারাঘাতে ভূপতিত বৃক্ষের প্রায় সে জড়-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল। ইংরাজ দেখিলেন, পতিত পঞ্জাবের আর উত্থানশক্তি নাই, বিষম প্রস্তরচাপনে সে আর মস্তকোত্তোলন করিতে পারিবে না। সে একে একে গুরু গোবিন্দ সিংহ, রণজিৎ সিংহ ও শের সিংহ সকলকেই হারাইয়াছে, শেষে তেজস্বিনী ঝিন্দনকেও হারাইল। ঝিন্দন জীবনের শেষ দশায় উপনীত, উত্থান-শক্তি-বিরহিত। তাঁহারাই পঞ্জাবের জীবন ছিলেন—পঞ্জাব আজ সেই জীবন হারাইয়াছে। সুতরাং জীবনশূন্য জরাজীর্ণ দেহ আর অবলম্বন ব্যতীত দাঁড়াইবে কি প্রকারে? চাপন চাপনে অবস্থিত জড়ত্ব-প্রাপ্ত দেহ কি আর উঠিতে পারে? পঞ্জাবের এইরূপ অবস্থা দর্শনের পর ইংরাজ-দৃষ্টি আবার ঝিন্দনের প্রতি পতিত হইল। ইংরাজ সে দৃশ্যে দেখিলেন, ঝিন্দনে আর কিছুই নাই—ঝিন্দন পাগলিনী!—শিখ-শোকে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা উন্মাদিনী!

ঝিন্দনের মুখে বাক্য নাই, তিনি নিস্তব্ধ—অসারতাপ্রাপ্ত!

কিন্তু বিশেষ দর্শনে অনুভূত হয় যে, তাঁহার এখনও শ্বাসরোধ হয় নাই, অতি মন্দগতিতে তাঁহার কণ্ঠশ্বাস বিনির্গত হইতেছে। বদন কালিমাময়! বিষম নৈরাশ্য-মেঘে আবৃত! কিন্তু সে মেঘ মধ্যে আর একটি গাঢ় কালিমার রেখা রহিয়াছে। অন্তর্নেত্রে দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে রেখাটিতে লিখিত রহিয়াছে, একটি গম্ভীর শোকোদ্দীপক-বাক্য :——"শিখ-পঞ্জাব! কেবলমাত্র এই দুঃখ রহিল যে, তোমায় রক্ষা করিতে পারিলাম না।" কর্ণ বধির! সে যেন আর পঞ্জাবের দুঃখ-কাহিনী সহ্য করিতে না পারিয়া আপনিই বিকল হইয়া আসিয়াছে। নয়ন মুদ্রিত! কেন মুদ্রিত কে বলিতে পারে? সতীর বিয়োগে মহাযোগী মহাদেবের নয়ন এক দিন এইরূপ মুদ্রিত ছিল—ভোলানাথের ভোলা মন সংসার ভুলিয়া এক ভাবনায় এইরূপ নয়ন মুদ্রিত রাখিয়াছিল। এ দৃশ্য দেখিলেও সেই স্বর্গীয় দৃশ্যের কথা স্মরণ হয়। বোধ হয়, যেন নয়ন পাছে পার্থিব-মোহে মুগ্ধ হইয়া মনের ভাবনা ভুলিয়া যায়; তাই ঝিন্দনের নয়ন মুদ্রিত, সাধক-জীবনের ন্যায় যোগ-নিদ্রায় নিদ্রিত। রসনা আস্বাদ-বিহীন! কিসের আস্বাদ? কেন?—বাক্যের আস্বাদ! যে রসনায় তৃপ্তি একবার বলিয়াছে, "শিখ! সাবধান! পঞ্চনদ যেন কোন ক্রমেই ইংরাজ-পদ-ধূলিতে-কলুষিত না হয়। তোমরা দস্যুগণকে পঞ্জাব হইতে দূর করিয়া দাও।" সে রসনা আর কেমন করিয়া বলিবে, "ইংরাজ! আইস, দেব! তোমার চরণ সেবা করি!" তাই আজ ঝিন্দনের রসনা আস্বাদ-বিহীন, জড়ত্বপ্রাপ্ত—বাক্যশূন্য।

মমূর্ষুর এ দৃশ্যে ইংরাজের কঠিন হৃদয় সম্ভবতঃ কাঠিন্য

ত্যাগ করিল। বন্দিনীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া ইংরাজ কথঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন; ঝিন্দনকে মুক্তিদান করিতে যুক্তি করিলেন। কিন্তু ঝিন্দন আর যাইবেন কোথায়? পঞ্জাব যে আর পঞ্জাব নাই—শিখ যে আজ শিখত্ব-ভ্রষ্ট, সুতরাং ঝিন্দন আর যাইবেন কোথায়? অবশেষে ইংরাজ-বুদ্ধিতে সুস্থির হইল যে, বারিধি-বেষ্টিত শ্বেতদ্বীপে পুত্রপাশে ঝিন্দনকে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য। এই যুক্তির পর ইংরাজ ঝিন্দনের মনোভাব জানিতে চাহিলেন। উত্তরে অস্ফুটস্বরে মুমূর্ষু-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "আমি বন্দিনী। আপনারা যেখানে রাখিবেন, আমাকে সেইখানেই থাকিতে হইবে। তবে পঞ্জাব! না—পঞ্জাবে আর যাইব না। 'শিখ নাম' যখন পঞ্জাব হইতে গিয়াছে, তখন আর পঞ্জাবে আছে কি? পঞ্জাব মরু! মরু মধ্যে কি পুড়িয়া মরিব?"

অগত্যা ঝিন্দনকে ইংলণ্ডে পুত্রপার্শ্বে প্রেরণই ইংরাজ যুক্তি-যুক্ত জ্ঞান করিলেন। সেই অতল-তরঙ্গায়িত বারিধি-বেষ্টিত শ্বেত মনুষ্য-পরিবৃত দ্বীপে অবশেষে ঝিন্দনকে উপনীত হইতে হইল। কিন্তু সে জীবন সে দ্বীপের উপযোগী নহে—দেবের সৃষ্টি নরক-শোভা বৃদ্ধি করিবার জন্য হয় নাই। স্বাধীনতা-পূর্ণ জীবন আর অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিল না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে (১২৭০ সালে) সমুদ্র মধ্যে অনন্ত তরঙ্গ-প্রবাহে সে জীবন মিশিয়া গেল। "পঞ্জাব গিয়াছে, আর আমি থাকিব কেন?" এই বাণী সেই কণ্ঠের শেষ বাণী। এই বাণী উচ্চারিত হইতে হইতে ঝিন্দনের জীবন পুত্রপার্শ্বে অনন্ত-শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। আজ আর এ স্বর্গীয় বাণী কোন্ মুখ হইতে

ভারতে দুর্গোৎসব।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

মূল্য এক আনা, ডাঃ মাঃ অর্দ্ধ আনা।

সম্পাদকীয় সমালোচনা।

"This tiny pamphlet describes the Durga Pujah in its social aspects. The sentiments embodied in it are free from the least taint of impurity; the production does credit to the young head from which, we understand, it proceeds."

INDIAN MIRROR, *30th. April*, 1884.

"ভগবতীর আগমনে লোকের মনের ভাব ও কার্য্যভাব কিরূপ হয়; গ্রন্থকার এই পুস্তকে কতকগুলি কবিতা দ্বারা তাহা চিত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। চিত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে। এরূপ ভাবশুদ্ধ, সুশ্রাব্য, অথচ স্বভাবসঙ্গত কাব্য বহির্গত হওয়া বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। প্রশংসার একটি নিদর্শন এই;—

"যেও না, জননি, ত্যজিয়ে সন্তানে;
আর যে যাতনা সহে না পরাণে;
আর যে থাকিতে পারি না এখানে
দাসত্ব-শৃঙ্খলে যাই যে মারা।
দেখি বক্ষঃস্থল তিতে অশ্রুনীরে,
আর কি কখন চাহিবে না ফিরে?
আজীবন মোরা কাঁদিয়াই কি রে,
মরম-বেদনে হইব সারা?"

সময়, ২৩এ ফাল্গুন, ১২৯১।

"এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার সরসহৃদয়ে মধুর ভাষায় এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।"

[illegible] ১২৯১।

"দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, এখানি সে ধরণের নহে। ইহার লেখা বেস্ সরল ও সুরুচিপূর্ণ। ইহা বটতলার কি মজার দুর্গোৎসব গ্রন্থের দলভুক্ত না হয়, তাহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।"

সমাচার-চন্দ্রিকা, ১২ই শ্রাবণ, ১২৯১।

'* * বরং স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে। দুর্গোৎসবের আনন্দ গ্রন্থকার বিশুদ্ধভাবে সরল কথায় বর্ণনা করিয়াছেন। আনন্দময়ীর আবির্ভাবে সকলেই আনন্দময় হইবার কথা বটে, কিন্তু নিরানন্দ দুঃখীর হৃদয়ে আনন্দ যে সহজে সম্ভবে না, গ্রন্থকার তাহাও আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা ভাষা ভাবের নমুনা দেখাইবার জন্য এই স্থানে একটু তুলিয়া দিলাম;—

"দুর্গতিনাশিনী দুর্গে! কর মা শ্রবণ,
সবাই তো সুখী আজি নয় মা এখন!
সুখী তারা, মা গো, যারা চিরসুখী হয়;
দুঃখী যারা, আজো তারা, দুঃখে মগ্ন রয়।
তাই তো জানাই আমি, জননী তোমায়,
'দুদীনের চিরদিন দুঃখেতেই যায়।'"

গ্রন্থকার ভবিষ্যতে এক জন উচ্চদরের ভাবুক সামাজিক কবি হইতে পারিবেন। গ্রন্থকার ভবিষ্যতে যে সমাজের কথ সহজ ভাষায় শাদা কথায় সুন্দররূপে লিখিয়া সাধারণের সম্মুখে ধরিতে পারিবেন, তাহার পরিচয় এ গ্রন্থে দিয়াছেন। দুর্গোৎসবে অনেক পূজার বাটীতে যে দর্শনীর তারতম্যে খাওয়া দাওয়ার তারতম্য হয়, তাহা এই পুস্তকখানিতে এক রকম বেস্ দেখান হইয়াছে ইত্যাদি।"

প্রভাতী, ২৮এ বৈশাখ, ১২৯১।

এতদ্ভিন্ন নববিভাকর, উদ্বোধন, দৈনিক বার্ত্তা, সঞ্জীবনী, সাধারণী এবং কল্পনা প্রভৃতি পত্রেও ইহা প্রশংসার সহিত সমালোচিত হইয়াছে।

নির্ব্বাণ-জীবন।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

মূল্য দুই আনা। ডাঃ মাঃ অর্দ্ধ আনা।

নির্ব্বাণ-জীবন সম্বন্ধে আমরা আড়ম্বর করিতে চাহি না। সাধারণে সম্পাদকীয় কথা পাঠ করুন।

সম্পাদকীয় সমালোচনা।

"The poem before us has been composed on the model of Grey's "Elegy written in a Country Church-yard." The writer has thoroughly clothed it in an oriental garb, and in doing so, has shewn great tact and ingenuity, The production is creditable, to the young poet."

Indian Mirror, 12 th. February 1885.

"It is a short Bengally poem containing some very beautiful lines."

Indian Nation, 27th. October, 1884.

"আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি গ্রে-রচিত "Elegy written in a Country Churchyard." নামক মনোহর কবিতাটিকে ভাবান্তরিত করিয়া তাহার মৌলিক ভাব ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করা অল্প প্রশংসার

বিষয় নহে। আশা করি, গ্রন্থকার বিজ্ঞ বয়সে অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দিবেন।"

সঞ্জীবনী, ৫ই মাঘ, ১২৯১।

"ইহা একখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। জীবনের নশ্বরতা ও পার্থিব বৈভবের অসারতা ইহার প্রতিপাদ্য। ইহার স্থানে স্থানে কল্পনার লীলা ও সদ্ভাবের সমাবেশ আছে। ইহার শেষ উপদেশ এই,—

"তাই বলি মন! বিষয় ব্যসন,
এ নিত্য জীবন, চির রবে না।
ত্যজিয়ে এ ভব, পার্থিব বিভব,
সঁপ তাঁরে সব, কষ্ট পাবে না।"

প্রবাহ, পৌষ, ১২৯১।

"নির্ব্বাণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিতে বড় বড় পণ্ডিতেরাও ভীত হন। কারণ, ইহাতে এত সূক্ষ্ম ও গূঢ় বিচার আছে যে, সচরাচর লোকে তাহার বিষয় লেখা দূরে থাকুক, তাহা ধারণা করিতেও অক্ষম। * * গ্রন্থকার তাঁহার কবিত্বের ও সরলতার অনেক পরিচয় দিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, তিনি ভবিষ্যতে সামাজিক বিষয় সকল সরল ভাষায় সুন্দররূপে লিখিয়া সাধারণের হস্তে অর্পণ করিয়া সামাজিক কবি বলিয়া পরিগণিত হইবেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে, গ্রন্থকার এরূপ কঠিন বিষয় লইয়া এতদূর চিন্তা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার ভাবের পরিচয় জন্য আমরা নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"নশ্বর পৃথিবী আর সকলি নশ্বর,
জানে যেই, চিনে সেই পরম ঈশ্বর।
অসার সংসার ডোর সাংসারিক মায়া
পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, সে প্রাণের জায়া,
ছিন্ন করি ভিন্ন ভাবে, এ পৃথিবী হতে
সেই সে যাইতে পায় সুরম্য স্বর্গেতে।

সেই সে সেবিতে পায় বিভুর চরণ,
দেব নামে ধরাধামে খ্যাত সেইজন।”

সময়, ১৯এ কার্ত্তিক, ১২৯১।

“কবি গ্রে যে “এলিজি” লিখিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, নির্ব্বাণ-জীবন তাহারই ছায়া লইয়া রচিত। আমরা এ ছায়া দেখিয়া সুখী হইয়াছি। পুস্তকখানি বঙ্গীয় পাঠকদিগের বেশ্ পাঠোপযোগী হইয়াছে। ভাষা ভাব মার্জ্জিত, কথাগুলি সুন্দর-রূপে সাজান। দুর্গাদাস বাবুর একটি বিশেষ গুণ দেখিলাম যে, এলিজির' মাঝে মাঝে যে স্থল অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর ও প্রকৃত হইয়াছে। এরূপ অনুবাদ প্রায় আশা করা যায় না। আমরা নিম্নে নমুনা দেখাইলাম :—

“Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear :
Full many a flower is born to blush unseen,
And lost its sweetness on the desert air.”

“অতল জলধি-গর্ভে গাঢ় নীল জলে,
দীপ্তিমান চুনী-পান্না মণি কত জলে।
দুরন্ত মরুভূ মাঝে সুরম-ফুল-কুল,
বিস্তারি সুগন্ধ হয় বিচ্যুত মুকুল।” ইত্যাদি।

প্রভাতী ৬০এ ফাল্গুন, ১২৯১।

“পুস্তকখানি একটি ক্ষুদ্র কবিতা—ইংরাজী কবি গ্রের বিখ্যাত ‘এলিজি’র ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। রচনা উত্তম হইয়াছে—পাঠ করিতে করিতে হৃদয় মধ্যে বাস্তবিকই কবির অভিপ্রেত ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। আমরা বিশ্বাস করি, যিনিই এই পদ্যটি পাঠ করিবেন, তিনিই সন্তুষ্ট হইবেন।”

পাক্ষিক সমালোচক, চৈত্র ১ম পক্ষ ১২৯১।

সূচী।



জননি গো !

তুলেছি কুসুম, তোমারই কাননে
তোমারই দয়ায় ;
নতি-স্তক্তিভরে তোমারই চরণে
অর্পিণু তাহায়।

সূচনা।

চরিত্র-গঠনের প্রধান উপায় মহজ্জীবনীর অধ্যয়ন। মহজ্জীবনীর অনুশীলনে মানব-হৃদয় মহত্ত্বপূর্ণ হয়, মহতের দেবভাব হৃদয়ে বিকাশ পায়। এই জন্যই সভ্যজগতে জীবনীর আদর। বঙ্গভাষায় পূর্ব্বে এই জীবনীর অভাব দৃষ্ট হইত; কিন্তু অধুনা ভাষার উৎকর্ষ-সহ সেই জীবনীর আদর হইতেছে; দুই চারি খানি জীবন-চরিত বঙ্গভাষার অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু দুই চারি জন মহাত্মার জীবন-চরিত প্রকাশিত হইলেও, বঙ্গভাষায় স্ত্রী-জীবনীর অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রী-জীবনী স্ত্রী-চরিত্র গঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। পূর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, কিন্তু তৎসহ এরূপ স্ত্রী-জীবনী বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই—অধুনা বঙ্গগৃহ স্ত্রী-পাঠ্য নামীয় কতিপয় অপাঠ্য, অশ্লীল পুস্তক * দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। সেরূপ পুস্তক পাঠে হৃদয় কলুষিত করণের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ জীবন-চরিত পাঠ বঙ্গাঙ্গনার সমূহ উপকারী ভিন্ন অপকারী নহে। বিশেষতঃ আর্য্য-মহিলার জীবন-চরিত-সম্বলিত পুস্তক আর্য্য-বঙ্গ-মহিলাগণের যে সমধিক উপকারী হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? দ্বাদশ নারীর প্রচারে সে অভাব সম্যক্ পরিপূরিত না হইলেও, যদি ইহা বঙ্গাঙ্গনার কথঞ্চিৎ উপকারে আইসে, যদি ইহা দেশীয় বিদ্যোৎসাহীগণের স্নেহনেত্রে পতিত হইয়া বঙ্গগৃহে স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তবেই আমাদের সকল-শ্রম জ্ঞান করিব—উৎসাহে মাতিয়া আরও এরূপ আর্য্য-মহিলা-চরিত লিখিতে প্রয়াস পাইব। এখন

---

* পাঠকগণ! এই স্থানটি পাঠ করিয়া ভাবিবেন না যে, বঙ্গভাষায় স্ত্রী-পাঠ্য বিশুদ্ধ পুস্তক একবারে নাই। কিন্তু এইরূপ অপাঠ্য পুস্তকের প্রাদুর্ভাবই বঙ্গভাষায় সমধিক প্রবল বলিয়াই এ কথা বলিলাম।

আমাদের উৎসাহ বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট, আর কল্পনা সেই স্বর্গীয় পিতার নিকট! পিতার দয়ায়, পাঠকগণের উৎসাহে আমাদের বাসনা পূর্ণ হউক, উৎসাহ বৃদ্ধি পাউক।

দ্বাদশ নারীতে প্রকাশিত এই জীবন-চরিতগুলি পূর্ব্বে প্রবাহ, সঞ্জীবনী, শক্তি এবং প্রভাতী প্রভৃতি দেশীয় সাময়িক পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। আপাততঃ সেই সকল সাময়িক পত্রিকা হইতে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহা পুস্তকাকারে পুনর্ম্মুদ্রিত হইল। ইতিহাস এ পুস্তকের অবলম্বন, আর স্ত্রী-হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য স্ত্রী-জীবনীর সহিত তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিবার বাসনা ছিল। কিন্তু অনুসন্ধানে তাঁহাদের যথার্থ চিত্র না পাওয়ায় সে আশা সম্যক্ সফল হইল না— মিথ্যা চিত্র না দিয়া যে কয়েকখানি সত্য পাইলাম তাহাই দিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য যে, কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় এই পুস্তকের মুদ্রণ-কল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন এবং প্রকাশের পক্ষে যত্ন লইয়াছেন। এই সকল কারণে তিনি যথার্থই ধন্যবাদই ও চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র।

২৫এ চৈত্র, সন ১২৯১ সাল।

শ্রীদুর্গাদাস শর্ম্মা।
৪০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।